Approved by the Director of Public Instruction, Bengal, as a prize and library, as well as juvenile reading book for High English, Middle English and Primary Schools — June 30, 1937.

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

সঙ্কলিত

সিটি বুক সোসাইটি,
৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

৮ম সংস্করণ]

জুন, ১৯৩৫]

Published by—K. Chatterjee
64, College St.
Calcutta-12.

Printer :—
Nibaranchandra Das
Prabasi Press (P) Ltd.
120-2, Acharya Prafulla Ch. Road
Calcutta-9.

—ঃ সূচী ঃ—

চিত্রসূচী

বনেজঙ্গলে

রাক্ষুসে বাঘ

সত্তর পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা,—আমার এক বন্ধুর বাবা অভ্রের খনির সন্ধানে রাঁচি-হাজারিবাগ অঞ্চলে সদলবলে ভ্রমণ করিতে করিতে একটা রাক্ষুসে বাঘের হাতে পড়িয়া কিরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত বলিতেছি।

তখন রেল-লাইন ও অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। লোকে গরু, উট বা মানুষ-টানা গাড়ীর সাহায্যে যাতায়াত করিত। রাঁচি হইতে হাজারিবাগ যাইবার পথে এখনও যেমন বাঘের উপদ্রব, তখনকার দিনে উহা কিরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, সেটা কল্পনা করিবার বিষয়।

যাঁহাকে লইয়া এই গল্প, সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি নিজে তাঁহার ডায়েরীতে তখনকার ছোট বড় সমস্ত ঘটনা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি বড় হইয়া সেগুলি পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাহা হইতে গল্পটি উদ্ধৃত করিতেছি। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এমন রোমাঞ্চকর কাহিনী তোমরা ইতিপূর্ব্বে কখনও শুন নাই।

সেই ডায়েরীতে আছে—১২৫৮ সালের চৈত্রের শেষে আমরা গোমো পেঁ ছিলাম। সেখান হইতে পদব্রজে চারি পাঁচ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া এক জায়গায় একটি ছোট পাহাড়ের নীচে তাঁব ফেলা হইল। এই কয়দিন অবিশ্রান্ত হাঁটিয়া সঙ্গের কুলীরা বিশেষ ক্লান্ত হইয়াছিল। সেখানে দুদিন বিশ্রাম করিবার পর আমরা কয়েক জনে খনির যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য বাহির হইলাম। ইতিপূর্ব্বে ঐ অঞ্চলের সকল স্থানই জরিপ করিয়া কতকগুলি স্থানের মানচিত্র পর্য্যন্ত আঁকা হইয়াছিল। সেই মানচিত্র লইয়া ঘোরাফেরা করিতে তেমন বিশেষ কষ্ট হয় নাই। সকলেরই সঙ্গে বন্দুক থাকিলেও আমরা সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব্বেই কাজ সারিয়া তাঁবুতে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম। তখন পর্য্যন্ত কোন হিংস্র জানোয়ারের সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও তাহাদের গর্জ্জন প্রায়ই শুনিতে পাইতাম। স্থানীয় সাঁওতালেরাও ভয় দেখাইতে কসুর করিত না।

কয়েকদিন অক্লান্তভাবে অনুসন্ধান করিয়াও বিশেষ কিছু ফল হইল না। দল

বাঁধিয়া হাজারিবাগের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমরা সংখ্যায় নিতান্ত কম ছিলাম না। প্রায় ছয়শতের উপর কুলী আমাদের সঙ্গে ছিল; তা' ছাড়া, তাঁবু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য, একখানা উটের গাড়ী এবং খানকতক গরুর গাড়ীও ছিল।

দুই দিন চলিবার পর একটি বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরের উপর আসিয়া পৌঁছিলাম। ম্যাপ্ দেখিয়া বুঝিলাম, কাছাকাছি কোথাও আমাদের কাম্যধন লুক্কায়িত আছে। দুই দিন পথ হাঁটিয়া আমরা সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এদিকে সন্ধ্যাও হইয়া আসিয়াছিল।

কোথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম, ম্যাপ্ দেখিয়া তাহা সঠিক বুঝা গেল না; কিন্তু সন্ধ্যার অর্দ্ধ অন্ধকারেও স্থানটিকে বেশ মনোরম বলিয়া বোধ হইল। বহুদূর ব্যাপিয়া বৃক্ষলেশহীন প্রান্তর, এখানে-সেখানে দুই একটা ছোট ছোট বুনো খেজুর বা আস্‌শেওড়া গাছ, আর দূরে চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, আকাশের গায়ে ক্ষুদ্র বৃহৎ পাহাড়শ্রেণী জমাট ধূম্রপুঞ্জের মত কালো হইয়া লাগিয়া আছে। আমাদের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সুবিখ্যাত পরেশনাথ পাহাড়, তাহার বিরাট দেহ লইয়া একটা ভয়ঙ্কর দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া! দক্ষিণে বহুদূরে দারকেশ্বর নদীর দুই পার জুড়িয়া ঘনসন্নিবিষ্ট শাল, আমলকী আর অর্জ্জুন গাছের জঙ্গল। আমরা যে প্রান্তরে আশ্রয় লইলাম, সেখানে বেশী গাছপালা ছিল না। মাটি, বালি সবই কঙ্করময়, মাঝে মাঝে দুই একটা বুনো ঝোপ, আব্ছা আলোতে ঠিক দৈত্যদানার মত মনে হইতেছিল।

প্রথমদিন স্থানটির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই বলিয়া, যেমন-তেমন করিয়া তাঁবু খাটাইয়া নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলাম। কুলীরা এদিকে-সেদিকে দল বাঁধিয়া জটলা করিয়া, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হৈ চৈ করিল এবং গুমোট গরমের জন্য অনেকে তাঁবু না খাটাইয়াই, অনন্ত নীলাকাশের নীচে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা দিতে লাগিল।

আমি আজও মনে করিয়া অবাক্ হই যে, কেমন করিয়া সেই অপরিচিত স্থানে অমন নির্ব্বিকারভাবে ঘুমাইতে পারিয়াছিলাম; ওই ভয়ঙ্কর স্থানের অল্পমাত্র পরিচয়ও যদি আমাদের জানা থাকিত, তাহা হইলে নিদ্রা দূরে থাকুক, আগুন জ্বালাইয়া বন্দুক কাঁধে সারারাত্রি যাপন করিতে হইত। যাহা হউক, সকলেই পথ হাঁটিয়া সবিশেষ ক্লান্ত ছিলাম বলিয়া চিন্তা করিবার অবসর পাই নাই—নক্ষত্র-লোকের মহারহস্য দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল, তখন হেমন্তের স্নিগ্ধ সূর্য্যরশ্মি আমার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁবুর বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, কুলীরা তখন জাগিয়া নিজ নিজ খেয়াল-

মত আড্ডায় মাতিয়াছে। এই ভাবে সকালটাকে নষ্ট হইতে দিবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না: আমি আমার সহকারী দুইজনকে সঙ্গে লইয়া স্থানটি পর্য্যবেক্ষণ করিতে বাহির হইলাম। চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, ওরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে, কোনও প্রকার সাবধানতা অবলম্বন না করিয়াই রাত্রি কাটানো, আমাদের উচিত হয় নাই। আমরা সমস্ত কুলীকে জড় করিয়া বলিলাম যে, আজকের দিনের মধ্যেই তাঁবুগুলি ঠিকমত খাটাইতে হইবে এবং আগুন জ্বালাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ওই অঞ্চলের সাঁও-তালেরা আমাদের কথায় সায় দিল। তাহারা বলিল, "এখানে অনেক দানো-পাওয়া বাঘ আছে। দেবতার কৃপা ছাড়া তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। পাঁচ সাতদিন আগে, দিনের বেলাতেই আমরা জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বাঘকে ঘুমুতে দেখেছি।" আমাদের সঙ্গে পশ্চিমা কুলীই ছিল অধিকাংশ; তাহারা সাঁওতালদের এই দানো-পাওয়া বাঘের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল।

যাহা হউক, কুলীদিগকে কাজে লাগাইয়া, আমরা তিনজনে ম্যাপ্ লইয়া ঠিক জায়গার সন্ধানে বাহির হইব, স্থির করিলাম। সঙ্গে খাবার ও বন্দুক ইত্যাদি লইয়া দুইজন কুলী চলিল। আমরা বলিয়া গেলাম যে, সন্ধ্যা নাগাইত তাঁবুতে ফিরিব, তার মধ্যেই যেন সমস্ত কাজ ঠিক করিয়া রাখা হয়।

উঁচু-নীচু প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সোজা পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে মাটি খুঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রথমটা এঁটেল মাটি ও বালি-মাটি ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলাম না। মাইল পাঁচেক যাওয়ার পর অভ্রের খবর পাওয়া গেল। মাটি খুঁড়িয়া দেখিতে হইল না। মাটির উপরে সর্ব্বত্র কে যেন রূপার পাত ছড়াইয়া রাখিয়াছে, রৌদ্রালোকে সেগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আমাদের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। মাটি খুঁড়িয়া পরীক্ষা করিলাম—যত নীচের মাটি, অভ্রের চাপ ততই বেশী; বুঝিলাম, আকাঙ্ক্ষিত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। ছোটনাগপুর অঞ্চলে সর্ব্বত্রই মাটির উপরে অভ্র ছড়ানো আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আসলে সব জায়গাতেই অভ্রের খনি নাই। পার্ব্বত্য নদীর জলের ধারার সঙ্গে সঙ্গে, মাটির

ভিতরকার অভ্রস্তর ধুইয়া অভ্রের কণা চারিদিকে এই ভাবে বিস্তীর্ণ হয়। কিন্তু এখানে মাটি যতই খুঁড়িতে লাগিলাম, অভ্রের পরিমাণ ততই বেশী হইতে লাগিল। বুঝিলাম, এখানেই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।

মনে প্রচুর আনন্দ লইয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু আমাদের উল্লাস বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। একদল কুলী আসিয়া বলিল যে, লখিয়া নামে একজন সর্দ্দারকে পাওয়া যাইতেছে না। সে দ্বিপ্রহরে একেলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু আর ফিরিয়া আসে নাই। সাঁওতালেরা বলিল যে, তাহাকে নিশ্চিয়ই দানো-বাঘে খাইয়াছে। আমার বিশ্বাস হইল না। আমি আমার এই জীবনে অনেক হিংস্র জন্তু লইয়া কারবার করিয়াছি। এতগুলি লোকের এত নিকটে যে দিনের বেলায় বাঘ বাহির হইয়া মানুষ ধরিয়া খাইবে, এ কথা অবিশ্বাস্য। কুলীদিগকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলাম, "সে নিশ্চয়ই পথ ভুলেছিল। দেখ গিয়ে, বোধ হয় এতক্ষণে এসে পড়েছে।" তাহারা চলিয়া গেল বটে, কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। লোকটাকে দিনের বেলায় বাঘে না খাইলেও রাত্রে যদি সে ফিরিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন। উদ্বিগ্ন চিত্ত লইয়া সে রাত্রে ভাল ঘুমাইতে পারিলাম না। সকালে উঠিয়াই তাহার খোঁজ করিলাম; হতভাগ্য আসে নাই। প্রথমটা মনে হইল, হয় তো সে এখানে কাজ করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া পলায়ন করিয়াছে ও গোমোর দিকে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু খোঁজ না করিলে নয়। অন্য কুলীদের মনে ভয় ধরিয়া যাওয়াটা মোটেই ভাল নয়। আমি আমার সহকারীকে লইয়া তাহার সন্ধানে যাওয়াই স্থির করিলাম। অন্য সহকারীকে সমস্ত তাঁবু উঠাইয়া কুলীদের সঙ্গে লইয়া, গত দিবসের নির্দ্ধারিত স্থানে যাইতে আদেশ করিলাম। তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলাম, যেন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁবুগুলি ঠিকমত খাটানো হয় এবং চারিদিকে আগুন জ্বালান হয়। বন্দুক যাহাদের আছে, তাহারা যেন বন্দুক হাতের কাছে লইয়া শয়ন করে।

এদিককার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকমত করিতে হুকুম দিয়া, আমরা দুই জনে লখিয়ার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। ধরিয়া লইলাম, তাহাকে বাঘ বা অন্য কোন হিংস্র জন্তুতে লইয়া গিয়াছে। সে ক্ষেত্রে তাহাকে নদীর কাছাকাছি কোন স্থানে লইয়া গিয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান করিয়া আমরা নদীর দিকেই অগ্রসর হইলাম। প্রান্তরে গাছ-পালার যেমন একান্ত অভাব, নদীর ধারে ঠিক তাহার বিপরীত; বন অত্যন্ত নিবিড়—বড় বড় গাছ বেড়িয়া বন্য লতা উঠিয়া, রৌদ্র ও আলোকের পথ প্রায় রুদ্ধ করিয়া আনিয়াছে। বহু কষ্টে নীচের কাঁটা-গুল্ম, শুষ্ক পত্র ও ভাঙ্গা ডাল-পালা ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলাম। এই ভাবে বহুক্ষণ বৃথা অনুসন্ধান করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি,

এমন সময় আমার সহকারীর অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিয়া, চকিত হইয়া উঠিলাম। সে আমার নিকট হইতে একটু দূরে ছিল। তাহার কাছে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার মুখ হইতেও একটা আর্ত্তনাদ বাহির হইল।

জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানে একটা ডোবার মত হইয়াছে। বর্ষার জল তাহাতে সঞ্চিত হইয়া আছে। তাহার ভিতরে শুক্‌নো পাতা পড়িয়া, পচিয়া একটা দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। ডোবার বাঁ-ধারে একটা ছোট ঝোপ জলের গা ঘেঁসিয়া আছে। দেখিলাম, একটা অর্দ্ধ-ভক্ষিত নর-দেহ সেই ঝোপের ভিতর হইতে প্রায় জলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার মাথাটি তখনও অবিকৃত ও অভক্ষিত। পেটের নাড়িভুঁড়ি ও বুকের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাথার চুলগুলি জলের ঢেউয়ের সঙ্গে উঠা-নামা করিতেছিল। তাহার কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত অবিকৃত আছে কি না, বুঝিতে পারিলাম না; গভীর ঝোপের মধ্যে তাহা লুক্কায়িত ছিল। অতি সন্তর্পণে, ব্যথিত চিত্তে, বন্দুক উঠাইয়া ধরিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম; নিকটে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম, সেই হতভাগ্য লখিয়াই বটে! তাহার কালো মিশ্‌মিশে ফতুয়াটি ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। খানিকটা তাহার পৃষ্ঠে সংলগ্ন হইয়া আছে। আশে পাশে চাপ চাপ রক্ত ঠিক জবাফুলের মত পড়িয়া রহিয়াছে। একটা হাত সম্পূর্ণ ভক্ষিত, শুধু হাড়খানি পড়িয়াছিল। বুঝিতে পারিলাম, বেচারীকে কাল দিনের বেলাতেই বাঘে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে, চারিদিকে বাঘের থাবার দাগ। থাবা দেখিয়া মনে হইল, বাঘটা প্রকাণ্ড। লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। সেই ভীষণ দৃশ্য আমি জীবনে কখনো বিস্মৃত হইতে পারিব না। চোখ দুটি নিষ্পলক, একটা ভয়ঙ্কর ভয়ের ভাব যেন তখনো চোখে জড়ানো।

সন্তর্পণে গুঁড়ি মারিয়া ঝোপের ভিতর চাহিয়া দেখিলাম, বাঘের কোন চিহ্ন নাই। লোকটার কোমরের দিকটা একেবারে নাই বলিলেই হয়; রক্তাক্ত হাড়ের উপরে এখানে-সেখানে থোলো থোলো মাংস তখনো লাগিয়াছিল। সেই বীভৎস দৃশ্য বেশীক্ষণ দেখিতে পারিলাম না। প্রথমে ভাবিলাম, দুই জনে ধরাধরি করিয়া লোকটার অবশিষ্ট দেহটা তাঁবুতে লইয়া গিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করি। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, তাহা সম্ভব নয়। তাঁবু সেস্থান হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে। ওই অর্দ্ধভুক্ত দুর্গন্ধপূর্ণ মৃতদেহ অতদূর টানিয়া লইবার মত সামর্থ্য আমাদের ছিল না। আমরা দুই জনে সেই হতভাগ্যকে সেই ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া এদিক্-ওদিক্ বাঘের অনুসন্ধান করিয়া নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে তাঁবুর দিকে ফিরিয়া চলিলাম।

আমাদের সৌভাগ্য যে, পথে কোন প্রকার বিপদ্ ঘটে নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নূতন

স্থানে তাঁবুতে আসিয়া পৌঁছিলাম। সহকারীকে সাবধান করিয়া দিলাম, যেন লখিয়ার মৃত্যুর কথা কাহারো নিকট প্রচারিত না হয়। কুলীদের ডাকিয়া মিথ্যা কথা বলিলাম। বলিলাম, "আমরা বিশেষ অনুসন্ধান ক'রে জেনেছি, লোকটা গোমোর দিকে গেছে; সেখান থেকে বাড়ী পালাবার মৎলব।" এই সংবাদে কুলীরা নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেলেও, আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। ছয় মাইল দূরে যখন বাঘের চিহ্ন স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তখন এটা স্থির যে, এখানেও বাঘের ডেরা না থাকিলেও যাতায়াত থাকিবে। আমাদের সঙ্গে গরু, উট, গাধা ও কয়েকটা ছাগল ছিল; তাহাদের প্রাণরক্ষা করাও তো একটা কর্ত্তব্য। এই সব সাত-পাঁচ ভাবিয়া, আমি সন্ধ্যার পরেও কুলীদের তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরিয়া, তাহাদিগকে সাবধানে রাত্রি কাটাইতে বলিলাম। সেই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রায় একশ' খানা তাঁবু এখানে-সেখানে খাটানো হইয়াছিল; গরু, ছাগল ইত্যাদি রাখিবার জন্য ব্যবস্থাও মন্দ করা হয় নাই। চারিদিকে গরুর গাড়ী ও উটের গাড়ী দিয়া একটা ঘেরার মত করা হইয়াছিল, আর তাহার চারিদিকে শালের খুঁটি পুতিয়া দেওয়াতে বেশ একটা খোঁয়াড়ের মত হইয়াছিল। প্রত্যেক তাঁবুতে আট দশ জন করিয়া লোক। আমি এক একটা তাঁবুতে এক একজন বন্দুকধারীর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। একটু গোলমাল হইলেই যেন আগুন জ্বালাইয়া ও ক্যানেস্তারা বাজাইয়া একটা হৈ চৈ করা হয়, তাহাও বলিয়া দিলাম। আমার তাঁবুটি অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় ছিল। আমি একজন সহকারীকে লইয়া, মাথার কাছে দু-নলা বন্দুক রাখিয়া শয়ন করিলাম। শয়ন করিবার পূর্ব্বে মনে মনে স্থির করিলাম যে, খনির কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সমস্ত তাঁবুগুলির চারিপাশে কাঠের বেড়া বাঁধিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কিন্তু মানুষ চায় এক, হয় আর। বাঘের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি কুলীদিগকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখিতে চাহিলেও সেই প্রথম রাত্রিতেই বাঘের ভয়ে সকলে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। সর্দ্দারের ভয়ানক মুখখানার কথা স্মরণ করিতে করিতে ক্লান্তদেহে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙিয়া গেল। বিছানায় উঠিয়া বসিলাম, আমার সহকারীও তখন জাগিয়া বসিয়াছে। তাহাকে একটা লণ্ঠন জ্বালাইতে বলিয়া, কান পাতিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। শুনিলাম, প্রত্যেক তাঁবু হইতেই কুলীরা চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"বাবু, শের আয়া।" শের যে আসিবে তাহা জানিতাম, কিন্তু কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই যে এ ভাবে কুলীদিগকে সন্ত্রস্ত করিবে, এতটা ভাবিতে পারি নাই। সহকারীকে লণ্ঠন লইয়া পিছনে পিছনে আসিতে বলিয়া, আমি বন্দুক লইয়া গোলমাল লক্ষ্য করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। কুলীরা ততক্ষণে আগুন জ্বালাইয়া তাঁবুর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেকের মুখে ভয়ের

চিহ্ন সুস্পষ্ট। শুনিলাম, যে ঘেরাটার মধ্যে গরু, উট প্রভৃতি ছিল, তাহার মধ্যেই উটের গাড়ীর ভিতরে একজন জমাদার বন্দুক পাশে লইয়া শয়ন করিয়াছিল। গরুগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ঘেরার মধ্যে থাকিতে আমিই একজনকে আদেশ দিয়াছিলাম। গরু ধরিতে আসিয়া বাঘে না কি সেই বেচারীকেই ধরিয়া লইয়া গিয়াছে! তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া সকলে এইরূপই আঁচ করিয়াছে। কাছে গিয়া অনুসন্ধান করিতে কাহারও সাহস হয় নাই। একজন কুলী বলিল যে, জমাদার হরি সিংকে কাঁধে লইয়া একটা প্রকাণ্ড বাঘকে সে পলাইতে দেখিয়াছে।

আগুন লণ্ঠন প্রভৃতি লইয়া সেই ঘেরার দিকে অগ্রসর হইলাম। গরু, ছাগল প্রভৃতি তখনও আর্ত্তনাদ করিতেছে, উটটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছে। চারিদিকের বেড়া ঠিক আছে। কেমন করিয়া কি হইল, বুঝিতে পারিলাম না, তবে দেখিতে পাইলাম, হরি সিংএর পাগ্‌ড়া ও বন্দুক বেড়ার বাহিরে পড়িয়া আছে। সেখানকার মাটি বিপর্য্যস্ত—বাঘের পায়ের দাগ সুস্পষ্ট। অনেকক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। যে গাড়ীতে হরি সিং শয়ন করিয়াছিল, তাহা খুব উঁচু, তাহার পিছন দিকটা বেড়ার উপরে জাগিয়াছিল! সম্ভবতঃ গরমের জন্য হরি সিং পিছনের ঝাঁপ খুলিয়াই রাখিয়াছিল। বাঘটা লাফাইয়া একেবারে গাড়ীর ভিতরে পড়িয়া নিদ্রিত হরি সিংকে অতর্কিতে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। হরি সিং বন্দুকটা ধরিয়াছিল বটে কিন্তু কাজে লাগাইতে পারে নাই। উটের গাড়ী হইতে হরি সিংকে লইয়া বাঘটা যেখানে লাফ দিয়া পড়িয়াছিল, সেখানকার মাটিই ওরূপ ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল।

ভোর হইতে তখনো দেরী ছিল। সেই রাত্রিতে কিছু করিবার উপায় ছিল না। আমরা জাগিয়া জাগিয়া সকালের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ভোরের আলো পূর্ব্বাকাশ ভেদ করিয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা চারি জন বন্দুকধারীও বাঘের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। বুঝিতে পারিলাম, জমাদারের মত ভারী লোককে লইয়া যাইতে তাহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে সে তাহার শিকারকে নামাইয়া বিশ্রাম করিয়াছে, সেই সকল স্থানে হতভাগ্য জমাদারের রক্ত তখনও টাট্‌কা। বেশীদূর যাইতে হইল না। মাঠের মধ্যে এক জায়গায় মাটি ফুঁড়িয়া একখণ্ড পাথর মাথা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই পিছনদিকে কতকগুলি বুনো গাছের ঝোপ খুব ঘন। হরি সিংকে সেখান পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া বাঘরা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার পেটের ও গালের মাংস খানিকটা খাইয়া, তাহাকে সেখানে ফেলিয়াই পলায়ন করিয়াছে। সেই বীভৎস মৃতদেহের বর্ণনা করা অসম্ভব। তা ছাড়া, আমার মনের অবস্থাও এরূপ ছিল না যে, ভাল করিয়া কিছু লক্ষ্য করি। আমাদের কাজের জন্য

দুটি নিরীহ প্রাণীকে এ ভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। এক একবার মনে করিতে লাগিলাম, অর্থলোভ ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া যাই ; আর কাহারও হত্যার পাপ আমাকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই এই দুরন্ত বাসনা ত্যাগ করি। কিন্তু মানুষের লোভ সহজে যাইবার নহে। জলের অনুসন্ধানে মরুভূমি অতিক্রম করিয়া, জলাশয়ের কাছে আসিয়া কোন্ মূর্খ জলপানে বিরত হয় ? সকল বিপদ্‌কে সে তখন তুচ্ছ করে। ইহা ছাড়াও তখন আমার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল। যে দুষ্ট জানোয়ারেরা এ ভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করিতে সুরু করিল, তাহাদিগকে ইহার শাস্তি দিবার জন্য আমি বদ্ধপরিকর হইলাম। অবশ্য তখন জানিতাম না যে, এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হইলে, কত বড় বিপদের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে।

সকলে মিলিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম ও কুলীদিগকে প্রত্যেক তাঁবুতে চারিপাশে খুব শক্ত শালের বেড়া দিতে আদেশ করিলাম। গরু প্রভৃতি জন্তুগুলি যেখানে ছিল, সেখানে ডবল বেড়া দিতে বলিলাম। আর সমস্ত রাত্রি আগুন জ্বালাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলাম। কাঠের অভাব ছিল না ; কাটিয়া আনিলেই হইল। এ সব সাবধানতা ছাড়াও খুব ভাল রকম পাহারার বন্দোবস্ত করিলাম। দুই দুই জন করিয়া লোক এখানে-সেখানে বন্দুক কাঁধে পাহারা দিবে ও বিপদ্ বুঝিলেই ক্যানেস্তারা ইত্যাদি বাজাইয়া সকলকে সাবধান করিবে। এই সব শেষ করিয়া খনির কাজ আরম্ভ করা স্থির হইল।

হরি সিংএর মৃতদেহ দেখিয়া আসা অবধি আমার মাথায় একটা মৎলব ঘুরিতে-ছিল। অত বড় দেহটাকে অভুক্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া বাঘটা যে ফেলিয়া রাখিবে না, ইহা নিশ্চয়। আজ রাত্রেই সে একলা হউক বা দুই একটা সঙ্গী লইয়াই হউক, সেখানে গিয়া উদরপূর্ত্তি করিবে। কাছাকাছি কোথাও লুকাইয়া থাকিলে বাঘ মারিতে হয় তো বেগ পাইতে হইবে না। আমার মনের কথা একজন সহকারীর নিকট ব্যক্ত করিলাম। সে-ও ইহাতে সায় দিল বটে, কিন্তু কাছাকাছি লুকান যাইবে কোথায় ? সেখানে বড় গাছ তো কোথাও দেখি নাই। শেষে অনেক বিচার-বিবেচনার পর সেই ছোট্ট পাহাড়ের উপরেই বসিয়া অপেক্ষা করা স্থির করিলাম।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা দুই জনে পাহাড়টার উপরে গিয়া উঠিয়া বসিলাম। বন্দুক ও পিস্তল দুই-ই আমাদের সঙ্গে ছিল। উন্মুক্ত আকাশের তলে সেই শীতের মধ্যে আমরা চুপ্‌চাপ্ বসিয়া রহিলাম। হু হু করিয়া হাওয়া দিতেছিল, বেশ কুয়াশাও পড়িতেছিল। কিন্তু আমাদের ভিতরে রক্ত গরম ছিল বলিয়া ততটা কষ্ট পাই নাই। স্থিরচিত্তে কান পাতিয়া রহিলাম। খস্‌খস্, খুট্‌খুট্ করিয়া শব্দ হয় আর প্রস্তুত হইয়া বসি। নীচে ঝোপের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু জ্বালা করিতে

লাগিল, দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিতে লাগিল। হাওয়ায় ঝোপের পাতা নড়ে আর মনে হয়, ওই বাঘ! বন্দুক তুলিয়া ধরি, পরক্ষণেই ভুল ভাঙিয়া যায়। রাত্রি যত গভীর হইতে লাগিল, এইরূপ ভুল ততই ঘন ঘন হইতে লাগিল। আমরা প্রথমে একটু দূরে দূরে বসিয়াছিলাম, কিন্তু কখন ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছাকাছি হইয়া গা-ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিলাম, জানিতে পারি নাই। অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কিছু প্রত্যক্ষ করা বড় সহজ নহে, চক্ষু টাটাইয়া জল বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু তবু বাঘের দেখা নাই। এতক্ষণ তাঁবু হইতে লোকজনের কোলাহল ও ক্যানেস্তারার আওয়াজ কানে আসিতেছিল, ধীরে ধীরে তাহাও কমিয়া আসিল।

এইভাবে বসিয়া বসিয়া সম্ভবতঃ ঝিমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা দূরে তাঁবুর দিক হইতে বহুলোকের আর্ত্তনাদ কানে আসিতেই চমকিয়া উঠিলাম। বুঝিলাম, বাঘ আমাদের ঠকাইয়াছে। আজ আর এদিকে না আসিয়া, আবার তাঁবুর ভিতরেই আহারের সন্ধানে গিয়াছে। নিষ্ফল ক্রোধে নিজেই নিজের হাত কামড়াইতে লাগিলাম। হতাশ হইয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলাম। রাত্রি প্রভাত না হইলে পাহাড় হইতে নামা বাতুলতা মাত্র।

হঠাৎ যেন একটা থপ্ থপ্ শব্দ কানে আসিল। চকিত হইয়া বসিলাম। শব্দ নিকটে আসিতেছিল। কোন একটা ভারী জন্তু খুব দ্রুত ছুটিয়া গেলে তাহার পায়ের যেরূপ আওয়াজ হয়, শব্দটা ঠিক সেইরূপ। বেশ একটু নজর করিয়া দেখিলাম। যেন একটা সাদা কাপড়ের মত কি দেখা গেল। পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলাম, একটা বাঘ তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া কোন হতভাগ্যকে মারিয়া তাহাকে কাঁধে লইয়া পলাইতেছে। এই ধারণা মাথায় আসিবামাত্র সেই দ্রুতগামী অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া দুই জনে একসঙ্গে গুলি ছুড়িলাম। গুলির গুরুগম্ভীর আওয়াজ প্রান্তর কাঁপাইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত হইল। গুলির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলাম, আমাদের ধারণা সত্য, বাঘই বটে। সে একটা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া যেন একবার দাঁড়াইল। পরক্ষণেই একটা ভারী জিনিস মাটিতে ফেলার মত শব্দ কানে আসিল। বুঝিলাম, মুখের গ্রাস সেখানে ফেলিয়াই বাঘ পলাইল।

আর অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া, আমরা দুইজনেই নামিয়া সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিলাম, হয় তো এখনও বেচারি জীবিত আছে। কাছে যাইতে না যাইতেই আমাদের অনুমানের সত্যতা বুঝিতে পারিলাম লোকটা 'জল জল' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। গলার আওয়াজে চমকিয়া উঠিলাম। সর্ব্বনাশ! এ যে আমার পাচক বেহারী! দুইজনে ধরাধরি করিয়া বেচারিকে লইয়া তাঁবুতে আসিলাম। তাঁবু তখন সরগরম! কাহাকে লইয়া গিয়াছে, কুলীরা তখনও পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই।

বেচারিকে লইয়া আমাদের ফিরিতে দেখিয়া কুলীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। আমি তাহাদের চীৎকারে বাধা দিয়া বেহারীর জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। সঙ্গে ডাক্তার ছিলেন, তিনি আসিয়া তাহার চিকিৎসা সুরু করিলেন। বেহারীর সৌভাগ্য যে, তাহার আঘাতটা তেমন গুরুতর হয় নাই। একরূপ অক্ষত দেহেই সে রক্ষা পাইয়াছে; প্রথম থাবার আঘাতেই বেচারী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষার পর বেহারী সুস্থ হইল। তাহার নিকট ঘটনার বিবরণ যাহা পাওয়া গেল, তাহা এই :—রাত্রে তাঁবুতে সে আমাকে না দেখিতে পাইয়া অন্য তাঁবুতে সন্ধান করিতে যাইতেছিল, এমন সময়, যমদূতের মত একটা বাঘ ঠিক তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে। সে চীৎকার করিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই, বাঘের এক থাবাতেই মূর্চ্ছিত হইয়া যায় তাহার পর আর কিছু তাহার স্মরণ নাই।

এই ঘটনার পর, দিন চার পাঁচ কোন উপদ্রব হয় নাই। খনির কাজ আরম্ভ হইল। বুঝিতে পারিলাম, গুলি বাঘকে জখম করিয়াছে; মরিয়া না থাকুক, সে নিশ্চয়ই কোথাও খোঁড়া হইয়া পড়িয়া আছে। আর একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বাঘেরা সংখ্যায় অনেক; কিন্তু এখন জানা গেল, একটার বেশী বাঘ আমাদের উপর অত্যাচার করে নাই। কারণ বাঘ বেশী থাকিলে, একটা আহত হইলেও অন্যগুলা আসিত। এই একটা জানোয়ারকেই নিপাত করিতে যে এত বেগ পাইতে হইবে, কে জানিত।

বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইল না; পূর্ব্ববৎ অত্যাচার আরম্ভ হইল। আহত হইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইতে বাঘটাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। কয়েকদিন সম্ভবতঃ তাহার আহার জুটে নাই, তাই সেই ক্ষুধার্ত্ত জীবটি নূতন উদ্যমে নিত্য নূতন শিকারের সন্ধানে ফিরিতেছিল। ক্রমশঃ তাহার অত্যাচার এমন বাড়িয়া গেল যে, বাধ্য হইয়া আমাদিগকে খনির কাজ স্থগিত রাখিতে হইল। আত্মরক্ষা করিবার সম্ভব ও অসম্ভব যত প্রকারের উপায় কল্পনা করিতে লাগিলাম, সেগুলিকে কাজে খাটাইয়া নিজেদের নিরাপদ করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, বাঘের সাহস ততই যেন বাড়িয়া চলিল। গরু, গাধা, ছাগল ইত্যাদির দিকে তাহাকে লোভ করিতে দেখি নাই; বাঘটার যত লোভ ছিল, নরমাংসের প্রতি। কুলী-লাইন হইতে খাদ্য সংগ্রহের জন্য, সকল প্রকার বিপদ্‌কে সে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিল। মানুষের কোলাহল, আগুন, বন্দুকের আওয়াজ, টিনের শব্দ, কোন কিছুতেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেছিল না। আমরা সকলেই যথেষ্ট ভয় পাইয়াছিলাম। প্রত্যেকেই ভাবিতাম, আজ বোধ হয় আমার পালা। দিনরাত এই ভাবে মৃত্যুচিন্তা

মনের মধ্যে লইয়া সময় কাটান কিরূপ দুরূহ, যে এই অবস্থার মধ্যে না পড়িয়াছে সে বুঝিতে পারিবে না। আমাদের মনে হইত, যেন আমাদের রাজ্যে একটা রাক্ষস আসিয়াছে, আর উপকথার রাক্ষসের মতই সে প্রত্যহ একটি করিয়া মানুষ দাবী করিতেছে। তাহার খেয়াল চরিতার্থ না করিয়া উপায় নাই। সকলেই যথেষ্ট সাবধানে চলে ও রাত্রে শয়ন করে, কিন্তু কোন্ দিক দিয়া কখন্ যে শয়তানের আবির্ভাব হইত, আমাদের চরমতম কল্পনার সাহায্যেও পূর্ব্বাহ্নে তাহা ঠাহর করিতে পারিতাম না।

এই সময় একদিন আবার এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহা মনে করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—ভয়ে হাত-পা আড়ষ্ট হইয়া আসে। সে দিন ছিল হাটবার। দুইজন কুলী হাট করিয়া বেলাবেলি তাঁবুতে ফিরিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছিল। তাহারা তাঁবুর প্রায় কাছাকাছি হইয়াছে, লোকজনের কোলাহল শুনা যাইতেছে, এমন সময়, ঠিক যেন যম আসিয়া একজনের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল আর দেখিতে দেখিতে তাহাকে লইয়া বিদ্যুদ্বেগে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

চক্ষের সম্মুখে এইরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া অপর কুলীর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! তাঁবুতে পৌঁছিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টায় সংজ্ঞালাভ করিল বটে, কিন্তু কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাহার মুখ দিয়া ভাল করিয়া কথা সরে নাই।

অশিক্ষিত কুলীরা এই ঘটনার সহিত কোন অপদেবতার যোগ আছে কল্পনা করিয়া, একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল। ইহার পর হইতে প্রত্যহ দলে দলে কুলী আসিয়া, দেশে ফিরিবার সংকল্প জানাইতে লাগিল। আমি কোন প্রকারে তাহাদিগকে আরো দুই চার দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলাম। মোটের উপর, সেই সময়টা কতকটা যেন অরাজক রাজ্যে বাস করার মত অবস্থা হইয়াছিল।

কুলীদের ও আমাদের তাঁবু পড়িয়াছিল, প্রায় আধ মাইল ব্যাপিয়া। এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে যথেষ্ট সময় লাগিত। এরূপ অবস্থায় একদিকে ভাল করিয়া পাহারা দিতে গেলে, অন্য দিকের উপর অত্যাচার হইত। প্রতিদিন এইভাবে উৎপাড়িত হইয়া আমি মরিয়া হইয়া উঠিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম, বাঘটাকে মারিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে আর রাত্রে নিদ্রা যাইব না। তাঁবুশ্রেণীর মাঝে মাঝে বিশ-বাইশ হাত দূরে দূরে, এক একটা মাচা তৈয়ার করাইলাম ও প্রত্যেকদিন সেই সকল মাচার কোন না কোনটিতে রাত্রি কাটাইতে লাগিলাম। কখনও একা থাকিতাম; কখনও বা আমার সহকারী সঙ্গে থাকিত। আমার হুকুম ছিল, সন্ধ্যার পরই তাঁবুর দরজা ইত্যাদি বন্ধ করিয়া থাকিতে হইবে, বাহির হইলেই মৃত্যু অনিবার্য্য।

কিন্তু এত করিয়াও কিছু সুবিধা করিতে পারিলাম না। বাঘটা আমাকে ফাঁকি দিয়া, যেন দৈববলে আপনার কাজ হাসিল করিতে লাগিল। তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়াও

"ঠিক যেন যম আসিয়া একজনের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল।"—১৯ পৃষ্ঠা

লোক ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এই ভাবে মাচায় মাচায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিতাম; দিনের বেলাতেও বিশ্রাম করিবার সুবিধা হইত না, নদীর ধারে ধারে, জঙ্গলে বাঘের বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অনুসন্ধান চলিত। সেখানকার জঙ্গল এত নিবিড়

এবং প্রান্তর-মধ্যস্থিত ঝোপগুলি এমন ঘনসন্নিবিষ্ট ও কাঁটা-গুল্ম-পরিবৃত যে, সেই সকল স্থানে দিনের বেলায় যাওয়াও বিপজ্জনক। কিন্তু তবু যাইতাম। বস্তুতঃ সে সময় আমার মাথায়ও যেন ভূত চাপিয়াছিল। এত পরিশ্রম করিয়া খনির সন্ধান পাইয়া, একটা বাঘের জন্য সকল শ্রম পণ্ড হইতে দেখিলে, কাহার না রাগ হয়!

সকল অসুবিধা সত্ত্বেও আমি অবসর পাইলেই ঝোপে ঝোপে, নদীর ধারে বাঘের খোঁজে ফিরিতে লাগিলাম। দুই একবার এখানে-সেখানে তাহার আহার্য্যের ভুক্তাবশিষ্ট দেখিয়াছি ও নদীর তীর-সন্নিকটে তাহার পায়ের দাগও লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু উপরের দিকে মাটি এরূপ শক্ত যে, সেখানে পায়ের দাগ লক্ষ্য হইত না।

প্রথম প্রথম বাঘটা যেন আমার মৎলব আঁচ করিয়াই একটু সাবধান হইয়া চলিতে ফিরিতে লাগিল। আমাদের সাবধানতার জন্য দুই একবার সে শিকার ধরিয়া পলাইবার সময় বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং শিকার ছাড়িয়াই পলাইয়াছে, কিন্তু শেষে সে ভয়ানক দুর্দান্ত ও সাহসী হইয়া উঠিল। কিছুতেই সে ভয় পাইত না, ভুল করিলেও আবার ফিরিয়া আসিত। মনুষ্য নামক প্রাণীকে সে যথেষ্ট অবজ্ঞা করিয়াই চলিত।

রাত্রির অন্ধকারে কখন্ যে সে কাজ সারিয়া পলাইত, ঠিক করিতে পারিতাম না। এ ভাবে অদৃশ্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব। তাহার অত্যাচারে প্রতিদিন আমাদের লোকবল হ্রাস হইতে লাগিল। তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া যে সেখান হইতে পলাইব, ইহা তেমন কাজও নহে। যেমন করিয়াই হউক এখানে বহুদিন থাকিতে হইবে। এদিকে কুলীরাও কাজ করিতেছে না। বাঘ মারাটাই তখন আমার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল।

মাচার উপর রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া ও প্রবল দুশ্চিন্তায় ক্রমেই আমার শরীর ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। প্রত্যহ বাঘ মারিবার জন্য নূতন নূতন কৌশল অবলম্বন করিতাম। মাচার নীচে গরু ও ছাগল বাঁধিয়া উপরে চুপটি করিয়া থাকিতাম। সমস্ত রাত্রি ভয়ার্ত্ত পশুদের আর্ত্তনাদ মাত্র শুনিতে পাইতাম, কিন্তু বাঘ আসিত না। ইত্যবসরে অন্যদিকে সে মানুষের ঘাড় ভাঙিবার জন্য সকল প্রকার কৌশল বিস্তার করিতে ছাড়িত না।

এক একদিন দিনের বেলায়, এমন নিঃসহায় অবস্থায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছি যে, আজ যে আমি সই কথা লিপিবদ্ধ করিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহাই আশ্চর্য্য। মৃত্যু যেন তখন আমার নিত্য সহচর ছিল। শুধু বাঘ মারিবার জন্যই নহে, কুলীদিগকে সাহস দিবার জন্যও আমাকে এই সকল কাজ করিতে হইত।

এদিকে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। রাত্রে মাচানে বসিয়া থাকা অসম্ভব। তবে সুবিধা এই, কুলীরা এত দিনে সমস্ত তাঁবু ঘেরিয়া কাঠ ও কাঁটা

গাছের এমন শক্ত বেড়া দিয়া ফেলিয়াছে যে, ভিতরে আসিতে বাঘকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। বেড়া খুব উঁচু করিয়া বাঁধা হইয়াছিল; উপর দিয়া টপ্‌কাইয়া সে যে সুবিধা করিতে পারিবে, তাহা মনে হয় না। আর সত্য সত্যই সে সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। এক একদিন গভীর রাত্রে শুনিতাম, নর-মাংস-লুব্ধ ক্ষুধার্ত্ত বাঘটা বেড়ার বাহিরে কাতর আর্ত্তনাদ করিতেছে। শব্দভেদী বাণের সন্ধান যদি আমার জানা থাকিত, তাহা হইলে এই সময়ে তাহাকে আমি নিপাত করিতে পারিতাম।

কিন্তু এই ভাবে, শুধু বেড়ার মধ্যে বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইবার জন্য, আমরা স্বদেশ, স্বজন পরিত্যাগ করিয়া ছোটনাগপুরের জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করি নাই। আমরা যে উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহার সাফল্য যেন সুদূর-পরাহত হইয়া পড়িতেছিল। বহুদিন দেশ ছাড়িয়াছি। দেশে যাইবার জন্য মনও কেমন করিতেছিল। কুলীদিগকে বসিয়া বসিয়া মাহিনা ও আহার্য্য জোগানও কষ্টকর হইয়া পড়িতেছিল। মোটের উপর সে সময়ে আমার মনে যে দারুণ হতাশা আসিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শীতের মাঝামাঝি হাজারিবাগ হইতে একদল বিখ্যাত শিকারী, শিকারের লোভে ওই অঞ্চলে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন খাঁটি সাহেব ছিলেন। প্রসিদ্ধ শিকারী হিসাবে তাঁহাদের নাম শুনিয়াছিলাম। তাঁহারা এইরূপ অযাচিতভাবে আসিয়া পড়াতে বুকে যথেষ্ট জোর পাইলাম। সাদা চামড়া দেখিয়া কুলীদের মধ্যেও বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তাহাদের সকলেরই বিশ্বাস হইল, রাক্ষুসে বাঘ এইবারে নিপাতলাভ করিবে।

শিকারীদলকে আমাদের আতিথ্য স্বীকার করিতে বলায়, তাঁহারা সকলেই স্বীকৃত হইলেন। তাঁহাদের পথশ্রান্তি দূর হইলে, আমি তাঁহাদিগকে সেই ভয়ঙ্কর বাঘের কাহিনী বলিলাম। তাঁহারা বেশ একটু অবহেলার সহিত শুনিয়া গেলেন। একজন সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "ভারি তো একটা বাঘ, তার জন্যে আবার এত ভয়! দেখুন, দুই দিনেই আপনাদের এই জায়গাটাকে বাঘশূন্য ক'রে ছাড়্‌ব!" আমি সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, "তবু একটু সাবধান হ'য়ে চল্‌বেন ফির্‌বেন, সন্ধ্যার পর যেন বেড়ার বাইরে না থাকেন।" সাহেব 'বেশ' বলিয়া অন্য কথা পাড়িলেন।

শিকারীদল সকাল হইলেই আহারাদি শেষ করিয়া সদলবলে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমি মাসাধিক কাল ধরিয়া রাত্রি জাগিয়া ও দিনে জঙ্গলে জঙ্গলে নিষ্ফল পর্য্যটন করিয়া, যথেষ্ট পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই সুযোগে একটুকু বিশ্রাম লাভ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

নূতন শিকারীদল আসিবার পর, প্রথম তিনদিন একরূপ শান্তভাবেই কাটিল।

আমি এই সময় প্রচুর বিশ্রাম ও নিদ্রাসুখ লাভ করিয়াছিলাম শিকারীরা সকালে তোড় জোড় করিয়া শিকার ধরিয়া আনিবার ছলে বন্দুক ইত্যাদি লইয়া রওয়ানা হইতেন এবং সন্ধ্যার সময় গোটা দুই খরগোসের ছানা বা শিয়াল মারিয়া লইয়া ফিরিতেন। বাঘ তো দূরের কথা, একটা নেক্‌ড়ে পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন দিন আনিতে পারেন নাই।

যে সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম দিন কথা হইয়াছিল, আমি ইহা লইয়া তাঁহাকে একদিন যথেষ্ট খোঁচা দিলাম। বলিলাম, "কই সাহেব, খরগোসের ছানা পর্য্যন্তই না কি!" সাহেব একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "রাক্ষুসে বাঘের কথা তোমাদের গল্প, নইলে তিন দিন সকলে মিলে এত খোঁজাখুঁজি ক'রলাম, তার খবর কিছুই তো মিল্‌ল না; বাঘ টাঘ কিছু নেই, তোমরা লোকদের ভয় দেখাবার জন্যে গল্প তৈরি করেছ।" আমি চুপ্ করিয়া গেলাম; বলিতে পারিতাম, 'সাহেব, রঙ্গ করবার জন্যে কেউ কি নিজের ক্ষতি করে?' সত্যই কিন্তু একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

হাজারিবাগের শিকারীদল আসিবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঘটা একবারও এদিক মাড়ায় নাই। বাঘেও সাদা ও কালো চামড়ার প্রভেদ বুঝিতে পারে না কি?

কিন্তু আমার খোঁচাটা সাহেবের মনে লাগিয়াছিল। তিনি ভিতরে ভিতরে বাঘ মারিয়া নাম কিনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছিলেন। পরদিন সকালে যখন তাঁহারা শিকার করিতে বাহির হইলেন, তখন আমিও কতকটা পথ তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে খনির কাজ আরম্ভ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিবার সময় সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবু, আজ একটা হেস্ত-নেস্ত ক'রে ছাড়্‌ব!"

সাহেব হেস্ত-নেস্ত করিয়া ছাড়িয়াছিলেন এটা ঠিক, কারণ সেদিন সকলের সঙ্গে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারেন নাই। হঠকারিতার ফলে সুদূর ইংলণ্ডের হতভাগ্য অধিবাসীটিকে সেদিন ছোটনাগপুরের এক জঙ্গলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। আমি কথার মারপ্যাঁচে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলাম বলিয়া আজিও অনুতপ্ত।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের মত সন্ধ্যার আগে শিকারীদল কিছুই সুবিধা করিতে পারেন নাই কিন্তু ফিরিবার পথে এক জায়গায় একটা ঝোপের মধ্যে পচা কিসের দুর্গন্ধ পাইয়া, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া, তাঁহারা দেখেন যে, সেখানটায় অনেক হাড়গোড়, কাঁচা মাথা ও মাংস ইত্যাদি স্তূপাকৃত রহিয়াছে এবং সেই সব পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। কাছাকাছি কোথাও বাঘ আছে ইহা নিশ্চয় জানিয়া, শিকারীরা অন্ধকারের ভয়ে তাঁবুর ঘেরায় ফিরিয়া আসিতে মনস্থ করেন, কিন্তু উপরি-উক্ত সাহেবের হেস্ত-নেস্ত করিবার প্রবৃত্তি তখন জাগ্রত হইয়াছে। তিনি সেই খানেই কোথাও লুকাইয়া থাকিয়া বাঘ মারিবেন, স্থির করিলেন। তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, আরো দুইজন তাঁহার সহিত

রহিয়া গেলেন। বাকি সকলে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। শিকারী তিন জন একটা বড় কুলগাছের উপর উঠিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বনভূমি এক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কোন দিকে কোন শব্দ নাই, শুধু দূরে পার্ব্বত্যনদী খরস্রোত দারকেশ্বরের জলে, একটা একটানা ঝির্ ঝির্ শব্দ। রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের গাঢ়তা ও অরণ্যভূমির নীরবতা যেন একটা ভারের মত শিকারীদের বুকে চাপিয়া বসে।

শিকারীদের আন্দাজ ভুল হয় নাই। তাঁহাদিগকে খুব বেশীক্ষণ এই ভাবে বসিয়া থাকিতে হয় নাই। পাতার একটা খস্ খস্—খড়্ খড়্ শব্দ পাওয়া গেল, কোন ভারী জানোয়ারের থপ্ থপ্ পায়ের আওয়াজ—শিকারীরা প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। নিম্নে অন্ধকারে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া, যেন এক জোড়া জ্বলন্ত চক্ষু একবার ঝল্সিয়া উঠিতে দেখিতে পাইলেন। এক সঙ্গে তিন জনে গুলি ছুড়িলেন। একটা করুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল। পাতার মর্ মর্ ও শুক্‌নো ডালের খড়্ খড়্ শব্দ শোনা গেল। তার পর সব চুপ্ চাপ্। শিকারীরা অনুমান করিলেন, বাঘটা আহত হইয়া পলাইয়া গেল। সাহেব তখন নামিবার উপক্রম করিলেন। দেশী শিকারী তুইজনে বাধা দিলেন। কিন্তু সাহেব তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া, ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। মাটিতে তাঁহার পায়ের শব্দ মিলাইতে না মিলাইতে, একটা গভীর হুঙ্কারধ্বনি শ্রুত হইল। তার পর সাহেবের করুণ আর্ত্তনাদ! একটা ঝুটোপুটির আওয়াজ, বাঘের দ্রুত পলায়নে পাতার শব্দ—তার পর সব স্থির! শিকারী দুইজন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেখানেই বসিয়া রহিলেন। বাস্তবিক, সেই নিবিড় অন্ধকারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে কিছু করিবার উপায় ছিল না। ডাকিয়া চীৎকার করিয়া যে লোক জড় করিবেন, আলো আনিবার ব্যবস্থা করিবেন, তাহারও উপায় নাই। তাঁবু সেখান হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে। তাঁহারা ব্যথিত মনে সেখানেই রাত্রি যাপন করিলেন; তাঁহাদের তৎকালীন মনোভাব কেবলমাত্র কল্পনা করিবার বিষয়।

সকালে তাঁহারা খানিকক্ষণ সাহেবের মৃতদেহের অনুসন্ধান করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া, তাঁবুর দিকে ফিরিতেছিলেন। আমরাও সকালের আহার সমাধা করিয়া কি ব্যাপার ঘটিল, তাহা দেখিবার জন্য দ্রুত আসিতেছিলাম। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। যেখানে বাঘটা সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেখানে রক্তের দাগ। যত দূর বুঝিতে পারিলাম, বন্দুকের গুলিতে বাঘটা আহত হইয়াছিল; তবে আঘাত নিশ্চয়ই গুরুতর হয় নাই, লেজে কিংবা পায়ে কোথাও লাগিয়া থাকিবে। আমরা তন্নতন্ন করিয়া সাহেবের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে তাহার সন্ধান মিলিল। নদীর ধারেই একটা ঝোপের মধ্যে সাহেবের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। শিকারীর সুসজ্জিত বেশ ছিন্ন-ভিন্ন। পিঠের অর্দ্ধেকটা ব্যাঘ্রের উদরে ইতিমধ্যেই গিয়াছে, শরীরের বাকী অংশ যেমনকার তেমনি আছে। সাহেবের বন্ধুরা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। অন্য সাহেবটি মৃতদেহ হাজারিবাগে লইয়া যাইবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। আমরা বলিলাম, তাহাতে কাজ নাই; হাজারিবাগে পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই মৃতদেহ বিকৃত ও দুর্গন্ধপূর্ণ হইয়া পড়িবে। আমি সাহেবের সেই মৃতদেহের সাহায্যেই বাঘটিকে মারিবার কথা বলিলাম। অসমাপ্ত আহারের লোভে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র আবার আসিবে, এ বিশ্বাস আমার ছিল। আমি আমার সহযোগীকে তাঁবুতে পাঠাইয়া দিয়া, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলাম। সাহেবের মৃতদেহটি একটা লোহার তারে বাঁধিয়া, একখানা ভারি পাথরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল, যেন উহা কাঁধে করিয়া বাঘ পলাইতে না পারে। তারপর নদীর ধারে মৃতদেহের কাছাকাছি, উচ্চ বাঁশের চারিটি মাচা তৈয়ার করা হইল। মাচা শেষ হইতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমরা সেদিনের মত আহারের আশা ত্যাগ করিয়া, চারিটি মাচায় ভাগাভাগী করিয়া বসিলাম; প্রত্যেক মাচায় দুই জন করিয়া লোক রহিল। কুলীদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, আমরা সেখানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

মাচাগুলির উচ্চতা প্রায় আট হাত হইবে। শক্ত শক্ত বাঁশের খুঁটির উপর একখানা করিয়া তক্তা দিয়া মাচা বাঁধা। আমি যে মাচাটায় ছিলাম, তাহারই হাত কয়েক দূরে পাথরের সহিত আবদ্ধ সাহেবের মৃত-দেহ। আমার সহকারীও আমার সঙ্গে একই মাচাতে ছিল। আমরা বন্দুক হাতে নিস্তব্ধ ও সজাগ হইয়া রহিলাম। পাহাড়ের উপর যে রাত্রে এই ভাবে বসিয়াছিলাম, সে দিনের কথা আমার মনে হইতে লাগিল। সে দিনের মত আজও কি বিফল-মনোরথ হইতে হইবে? সাহেবের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যু আমাদের মনে একটা বোঝার মত চাপিয়া ছিল। তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়াও আমাদের একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

কোন দিকে কোন শব্দ নাই, কেবল নদী-স্রোতের ঝির্ ঝির্ শব্দ। ওই ভাবে চুপ্ করিয়া বসিয়া বসিয়া আমার কেমন তন্দ্রা আসিল। হঠাৎ অদূরে একটা খস্ খস্ —মর্ মর্ শব্দ শুনিয়া তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া বন্দুকটা জোরে ধরিয়া বসিলাম। কান খাড়া করিয়া রহিলাম। বোধ হইল, যেন কোন বিপুলকায় জন্তু ঝোপের ভিতর দিয়া পথ করিয়া ধীরে ধীরে কাছে আসিতেছে। বন্দুকটি হাতে তুলিয়া লইলাম। আমি কিছুক্ষণ ঠিক প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়াছিলাম। চক্ষে পলক পর্য্যন্ত পড়িতেছিল না, শুধু বুকের ভিতর আশা ও আশঙ্কার একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল।

মুহূর্ত্ত কয়েক এই ভাবে অতিবাহিত হইল। আহার-লোভী ব্যাঘ্রের একটা দীর্ঘনিশ্বাস শোনা গেল। তার পরেই একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনিলাম, মনে হইল, সে আমাদের অস্তিত্ব জানিতে পারিয়াছে। ভয় হইল, বুঝি বা পলাইয়া যায়।

কিন্তু সে পলাইল না। অন্যান্য মাচা হইতে তখন ফিস্ ফিস্ শব্দ আসিতেছিল। অনুভবে বুঝিলাম, তাঁহারাও ব্যাঘ্রের আগমনবার্ত্তা পাইয়াছেন। আমার ভয় হইল, পাছে ঠিক সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কেহ গুলি ছুড়িয়া সব পণ্ড করিয়া দেন।

কিন্তু সকলেই পাকা শিকারী, গোলমাল না করিয়া কান পাতিয়া বসিয়া রহিলেন। বাঘটা অন্য কাহারও দিকে না গিয়া, আমারই মাচার নীচে ঘুর্ ঘুর্ করিতে লাগিল। তাহাকে যে দেখিতে পাইতেছিলাম, তাহা নহে, তবে আভাসে পাতার শব্দে বুঝিতে পারিতেছিলাম, সে নীচেই আছে। আন্দাজে গুলি ছোড়াটা যুক্তিযুক্ত মনে হইল না। গুলির আওয়াজে যদি সে লাফাইয়া মাচার উপরে পড়ে, তাহা হইলে মাচাশুদ্ধ ভূমিসাৎ হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়া অনিবার্য। আট হাত লাফ দিয়া একেবারে তক্তার উপর উঠা বিচিত্র নহে। ভয়ে আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। চুপ্ করিয়া নিষ্পলক নেত্রে বসিয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিল। নীচে চাহিয়া বাঘের দেহের একটু আভাস যদি পাই, তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। মনে হইল যেন দেখিতে পাইয়াছি; একটা ছায়ার মত অস্পষ্ট মূর্ত্তি যেন আমারই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বেশীক্ষণ লক্ষ্য করিয়া থাকিয়া মনে হইল, স্পষ্টতর হইল। আর অপেক্ষা করা সঙ্গত নহে ভাবিয়া বন্দুক তুলিলাম এবং ঘোড়া টিপিবার সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার করিয়া অন্যান্য মাচার সকলকে সাবধান করিয়া দিলাম। পরমুহূর্ত্তে আহত ব্যাঘ্রের উল্লম্ফনের দাপটে এবং আকাশ-পাতাল-ভেদী গর্জ্জনে দশদিক্ কাঁপিয়া উঠিল। বন্দুকের ঝলক ও আওয়াজ মিলাইতে না মিলাইতে এক করুণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। সেই বিশালকায় হিংস্র জন্তুও নিতান্ত অসহায় জীবের মত ক্রন্দন করিতে লাগিল দেখিয়া, কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিলাম। গুলির আঘাত নিশ্চয়ই মারাত্মক হইয়া থাকিবে, কারণ বাঘটা সেখানেই মাটিতে মুখ গুঁজিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া আবার গুলি ছুড়িলাম; সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মাচা হইতেও গুলির আওয়াজ হইতে লাগিল।

সেই কাতর আর্ত্তনাদ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। ধীরে ধীরে তাহা অনেকটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত শব্দে পরিণত হইল এবং শেষে তাহাও একেবারে থামিয়া গেল।

আমরা বাঘের মৃত্যু সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলেও, সে রাত্রে কেহ মাচা

হইতে নামিলাম না। সাহেবের দুর্দ্দশার কথা তখনও আমাদের মনে জাগিতেছিল। পরদিন সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে মাচা হইতে নামিয়াই যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা বর্ণনার ভাষা আমার নাই। অদূরে তারে বদ্ধ সাহেবের অৰ্দ্ধভুক্ত মৃতদেহ; তাহারই অনতিদূরে মূর্ত্তিমান রাক্ষসের মত বাঘের সেই বিরাট দেহ একেবারে চিৎ হইয়া পড়িয়া

'আকাশ-পাতাল-ভেদী গর্জ্জনে দশদিক কাঁপিয়া উঠিল।'—২৬ পৃষ্ঠা

রহিয়াছে। তাহার দাঁতগুলি বাহির হইয়া রহিয়াছে কিন্তু চোখ দুটি তখনও জ্বলজ্বল করিতেছে। প্রথমটা তাহার কাছে ঘেঁসিতে ভয় হইতেছিল। তার পর ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম, বাঘের ধড়ে আর প্রাণ নাই।

ইহার পর আমরা চারি জনে সাহেবের মৃতদেহ ধরাধরি করিয়া তাঁবুর দিকে লইয়া চলিলাম। অন্য চারি জন ততক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁবুতে ফিরিয়া লোক পাঠাইয়া বাঘের মৃতদেহটিও লইয়া আসা হইল। সাহেবের মৃত্যুতে দুঃখের

একটা ছায়া পড়িলেও, বাঘ মারার আনন্দে কুলারা কোলাহল করিতে লাগিল। কোনও প্রকারে তাহাদের থামাইয়া, তাড়াতাড়ি সাহেবের একটা গোর দিলাম।

বাঘটাকে মাপিয়া দেখা হইল পুরা ১১ফুট লম্বা। এত বড় বাঘ আমি ইতিপূর্ব্বে চোখে দেখিয়া থাকিব, কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর বাঘের সহিত জীবনে আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

আমাদের অভ্রের খনির কাজে যে একটিমাত্র ব্যাঘাত ছিল, তাহা দূর হইল। ইহার পর নির্বিঘ্নে কাজ চলিতে লাগিল।

বনের খবর

(১)

যাঁহারা জরীপের কাজ করেন, তাঁহাদের অনেককে অতি ভয়ঙ্কর বনেজঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। সে সব জায়গায় হাতী, মহিষ, বাঘ, ভালুক আর গণ্ডার চলা-ফেরা করে। যেখানে সে সব নাই, সেখানে তাহাদের চাইতেও ভয়ানক মানুষ থাকে। প্রায় চৌদ্দ বৎসর এই সকল জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; কত ভয়ই পাইয়াছি, কত তামাসাই দেখিয়াছি!

সরকারী জরীপের কাজে অনেক লোককে দলে দলে নানা জায়গায় যাইতে হয়। এক একজন কর্ম্মচারীর উপর এক এক দলের ভার পড়ে; তাঁহার সঙ্গে জিনিষ-পত্র, গরু, ঘোড়া, খচ্চর, খালাসী, সার্ভেয়ার, চাকর-বাকর বিস্তর থাকে। থাকিতে হয় তাঁবুতে। লোকজনের বাড়ীর কাছে থাকা প্রায়ই ঘটে না। এক এক সময় এমন হয় যে, কুড়ি-পঁচিশ মাইলের ভিতরে আর মানুষ নাই। বন এমনি ঘন আর অন্ধকার যে, তাহার ভিতর দিয়া চলিবার পথ গাছ কাটিয়া তৈরি করিয়া লইতে হয়।

এমনি ত জায়গা। প্রথম প্রথম সে সব জায়গায় গিয়া অল্পেই ভয় হইত। আমার মনে আছে, শাণদেশে একদিন রাত্রে আমার তাঁবুর সম্মুখে আসিয়া একটা বাঘ ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল, আমি তাহা শুনিয়া খুব ভয় পাইয়াছিলাম। তারপর ইহার চাইতে কত বড় বড় বিপদে পড়িয়াছি, তাহাতে কিন্তু তেমন ব্যস্ত হই নাই।

আমার সঙ্গের সার্ভেয়ারটির বয়স কিছু বেশী। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, বাড়ী অযোধ্যায়। চাকর দুইটি তাঁহারই দেশের লোক, সুচিৎ আর বেণী। তাহারা দুইজনেই

ব্রাহ্মণ। বেণী বুড়ো, বেঁটে, রোগা, কালো আর হিংসায় তাহার পেটটি ভরা। সুচিৎ লম্বা, মোটা, ফর্সা আর খুব সাদাসিধা। দুইজনে মিলিয়া সেই সার্ভেয়ারটির রান্না-বান্না কাজকর্ম্ম সব করে। সার্ভেয়ার তাহাদের দুইজনকেই খাইতে দেন, কিন্তু বেণীর তাহা সহ্য হয় না। সুচিৎ কেন বাবুর খাইবে? আর যদিই বা খায়, এত বেশী খাইবে কেন? সুচিতের শরীরটি যেমন, আহারটিও তেমনি—সে বেণীর ডবল খায়; কাজও করে, বেণীর চাইতে ঢের বেশী, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, বাবু যে সুচিংকে খাইতে দেন, বেণী তাহা সহিতে পারে না। সুচিৎও যতটা খায়, সব সময় তাহা হজম করিতে পারে না। সেইজন্য তাহাকে কাজ করিতে করিতে অনেক সময় ঘটি হাতে ছুটিতে হয়। আমি যে দিনের

"পালাও পালাও, বাঘ এসেছে, ধ'রলে।"

কথা বলিতেছি, সে দিনও সন্ধ্যা বেলা বাবুর চায়ের জল গরম করিতে গিয়া তাহাকে তেমনি ছুটিতে হইয়াছিল।

চারিদিকে ঘোর জঙ্গল; বাঘের ভয় খুবই আছে, কাজেই সুচিৎ বেশী দূরে যায় নাই। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, খচ্চরওয়ালারা খচ্চর সব বাঁধিয়া চারিদিকে ধুনি জ্বালাইবার জোগাড় করিতেছে। এমন সময় তাহাদের একজন দেখিল, সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড বাঘ। বাঘটা গুঁড়ি মারিয়া আসিতেছে। এ ঝোপ্ হইতে ও ঝোপের আড়ালে, সেখান হইতে আর এক ঝোপের পিছনে, এমনি করিয়া ঠিক সুচিংকে গিয়া ধরিবার চেষ্টা। দেখিয়া ত সে চেঁচাইয়া উঠিল—"পালাও পালাও, বাঘ এসেছে,

ধ'র্‌লে !" সে কথা শুনিবামাত্র সুচিৎ যে কি রকম প্রাণপণে ছুটিয়াছিল, বুঝিতেই পার। কোথায় বা রহিল তাহার লোটা, আর কোথায় বা রহিল তাহার জল! সে দুই লাফে একেবারে তাঁবুর ভিতরে আসিয়া হাজির। ভয়ে বেচারার প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছে; মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। তাহার দশা দেখিয়া বেণীর কি হাসি।

বেণীরও যে সকল দিন এমনি হাসিয়াই কাটিয়াছিল, তাহা নয়। এমনি আর এক জঙ্গলে সার্ভেয়ারের তাঁবু পড়িয়াছে। বেণী এখন রান্না করে। তাহাকে তাঁবুতে রাখিয়া সার্ভেয়ার অন্য লোকদের লইয়া কাজে গিয়াছিলেন। খাটিয়া-খুটিয়া কাহিল হইয়া সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসিতে আসিতে ভাবিতেছেন, তাঁবুতে আসিয়াই রান্না তৈরী পাইবেন আর হাত-পা ধুইয়া খাইয়া দিব্যি ঘুমটি দিবেন। তাঁবুতে ফিরিয়া কিন্তু দেখেন, বেণী নাই! এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ খুঁজিয়া তাঁহার বড় ভাবনা হইল, বুঝি বেণীকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। সঙ্গের শাণ কুলীরা কিন্তু সব দিক ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল যে, বাঘ সেদিক্ পানে আসে নাই।

তখন সকলে মিলিয়া খুব চেঁচাইয়া বেণীকে ডাকিতে লাগিল। অনেক ডাকা-ডাকির পর খানিক দূর হইতে ভাঙা গলায় উত্তর আসিল, "আমি এখানে!" সকলে আলো লইয়া সেইদিকে ছুটিল। সেখানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া আবার ডাকিতে লাগিল। তখন গাছের উপর হইতে বেণী বলিল, "আমি এই গাছে, নাম্‌তে পার্‌ছি না।" তাহা শুনিয়া, শাণেরা তাড়াতাড়ি গাছে উঠিয়া দেখে, বেণী তাহার পাগ্‌ড়ী খুলিয়া, তাহা দিয়া নিজেকে বেশ করিয়া গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া বসিয়া আছে। সেইখান হইতে বাঁধন খুলিয়া তাহাকে নামাইয়া আনা হইল।

বেচারা অনেক কষ্টে গাছে উঠিয়াছিল; গায়ের স্থানে স্থানে ছড়িয়া গিয়াছে; কাঁটার খোঁচাও নেহাৎ কম খায় নাই। সবাই জিজ্ঞাসা করিল "তোর এমন দশা কি ক'রে হ'ল রে?" বেণী বড় বড় চোখ করিয়া বলিল, "বা-া-া-ঘ এসেছিল! নালার ধারে এসে এমনি গড়্‌গড়িয়ে উঠ্‌ল যে, আমি তখনি ছুটে চলে এলাম; তাতেই গা ছড়ে গিয়েছে, আর কাঁটার খোঁচা লেগেছে। বাঘটা আবার ডাক্‌তে ডাক্‌তে উপরে উঠে আস্‌তে লাগ্‌ল, কাজেই আমি গাছে উঠে পড়্‌লাম। কি ক'রে যে উঠলাম জানি না, আর কখ্‌খনও গাছে উঠিনি। উঠেই পাগ্‌ড়ী খুলে ডালের সঙ্গে জড়িয়ে নিজেকে বেঁধে নিয়েছিলাম; তার পর শীতে হাত-পা অবশ হয়ে গেছে; নাম্‌তে গিয়ে আর নাম্‌তে পারি নি।" শীতে অবশ হওয়ার কথাই বটে, সেটা ছিল পৌষ মাস।

শাণেরা কিন্তু বলিল, "বাঘ এসেছিল, আর তার পায়ের দাগ নেই, তা কি হ'তে পারে?" বেণী তাহাতে ভারী চটিয়া বলিল, "ব্যাটাদের চোখ নেই, তাই বল্‌ছে, বাঘ

আসে নি। রাত্রে এসে যখন ধ'রবে তখন বুঝতে পারবে!" বলিতে বলিতেই নালার ধারে গম্ গম্ করিয়া একটা শব্দ হইল, আর বেণী অমনি একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"ঐ শোন, বাঘ এসেছে, কি না!" তাহা শুনিয়া সকলে ত হাসিয়া গড়াগড়ি। আসলে সেটা ছিল একটা হরিণ।

(২)

বনের ভিতর মাঝে মাঝে গ্রাম আছে। এইরূপ একটা গ্রামে আমরা কিছুদিন ছিলাম। থাকি গ্রামে, কাজ করিতে যাই পাহাড়ে। জরীপের কাজ, এক জায়গায় দাঁড়াইয়া অনেক দূর অবধি দেখিতে পাওয়া চাই, না হইলে কাজে সুবিধা হয় না। পাহাড়ের উপর উঠিয়া প্রথম কাজই হয়, বনজঙ্গল কাটা। একদিন একটা পাহাড়ে উঠিয়াই সঙ্গের লোক-জনকে বন কাটিতে বলিয়াছি; তাহারাও দা, কুড়াল লইয়া কাজে লাগিয়া গিয়াছে। দুই চার ঘা ভাল করিয়া দিতে না দিতেই এমনি ভীষণ গর্জ্জন করিয়া এক ভালুক বাহির হইয়া আসিল যে, কি বলিব। সে গর্ত্তের ভিতর আরামে ঘুমাইতেছিল; তাহাকে কেন জাগান হইল, এই তাহার রাগ। যাহারা তাহার ঘুম ভাঙাইয়াছিল, তাহারা তাহাকে দেখিয়াই বাপ-মায়ের নাম লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল! ভালুক আসিয়া তাহাদের কাহাকেও পাইল না। কাজেই রাগে গর্-গর্ করিতে করিতে আবার বনে ঢুকিয়া পড়িল।

ভালুক বড় বেখাপ্পা জানোয়ার। ওদেশের লোকেরা বাঘের চাইতেও ভালুককে বেশী ভয় করে। বাঘে ধরিলে হয় ত মারিয়াই ফেলিল, গেল আপদ চুকিয়া; ভালুক বড় কষ্ট দিয়া মারে। প্রাণে না মারিলেও জন্মের মত খোঁড়া করিয়া দেয়,—হয় ত চোখ্টাই কামড়াইয়া তুলিয়া লয়!

একটা গ্রামের কাছে তাঁবু ফেলিয়া ছয় সাত দিন ছিলাম। গ্রামের মোড়লটি বড় ভাল মানুষ, আমার উপর তাহার বড়ই স্নেহ ছিল। তাহার গ্রাম হইতে সাত আট মাইল দূরে তাঁবু ফেলিয়া আছি, তাহার এলাকাও নয়, সেইখানেই সে আমাকে দেখিতে আসিত। হাতে করিয়া আমার জন্য কত তরি-তরকারীও আনিত। তাহার গ্রামে যখন গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন ত তাহার আহ্লাদের সীমাই রহিল না। রোজ বিকালে সে আমার কাছে আসিয়া বসিত, আর কত কিছু গল্প করিত। তাহার ডান হাতখানি কি করিয়া ভালুকে কাম্ড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, সে কথা আমি তখন তাহার কাছে শুনিয়াছিলাম।

গ্রামের এই সর্দ্দারটি একবার আরও কয়েকজন লোকের সঙ্গে পাহাড়ে বাঁশ কাটিতে গিয়াছিল। তাহাদের দেশে এক রকম মোটা বাঁশ হয়, তাহাতে কলসীর কাজ

চলে। তাহার এক একটা চোঙ্গায় পাঁচ ছয় সের জল ধরে। পাহাড়ে গিয়া সকলে যে যাহার কাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে-ও এক জায়গায় খুব মোটা মোটা বাঁশ দেখিয়া

ভীষণ গর্জ্জন ক'রে এক ভালুক বেরিয়ে এল।

কাটিতে গিয়াছে। বাঁশের পিছনে যে একটা বড় ভালুক শুইয়াছিল, তাহা সে দেখিতে পায় নাই। যেই খ্যাঁচ করিয়া বাঁশে ঘা মারিয়াছে, অমনি আর যাইবে কোথায়?

গাঁক্ গাঁক্ চাৎকারে বন কাঁপাইয়া ভালুকটা আসিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। বেচারা ইহার কিছুই ভাবিয়া আসে নাই। ভাগ্যিস্ তাহার সঙ্গের লোকেরা ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহা না হইলে জানোয়ারটা সেদিন তাহাকে মারিয়াই ফেলিত। হঠাৎ অনেক লোকজন দেখিয়া ভালুকটা পলায়ন করিল, কিন্তু যাইবার সময় তাহার ডান হাতখানি কব্জীর উপর অবধি ছিঁড়িয়া লইয়া গেল।

সে গ্রাম ছাড়িয়া আমরা অন্য গ্রামে উঠিয়া গিয়াছি। সেখানে একদিন আমাদের কাজ সারিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ফিরিতেছি। সকলের আগে আগে দুইজন শাণ, তাহাদের পিছনে আমি, আমার পিছনে দোভাষী, তাহার পিছনে সহিস ঘোড়া লইয়া। খালাসারা বোঝা লইয়া পঞ্চাশ-ষাট হাত পিছনে পড়িয়াছে। শুক্‌নো নালার ধার দিয়া আঁকাবাঁকা পথ। তাহার একটা মোড় ঘুরিয়াই সম্মুখের শাণটি হঠাৎ চাৎকার করিয়া পিছনের দিকে এক লাফ মারিল! পথের ঠিক মাঝখানে, চার পাঁচ হাত দূরে, মস্ত এক বাঘ! বাঘটাও তখনি লাফ দিয়া গিয়া নালায় পড়িল, কিন্তু পলাইল না; সেইখানেই পায়চারি করিতে লাগিল। এদিকে শাণ দুটি সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়াই, আমি তাহাদের হাত ধরিয়া বলিলাম, "পালাচ্ছ কোথায়?" তাহারা বলিল, "বাবু, ওটা দুষ্টু বাঘ, দেখ না, আমরা এত কাছে রয়েছি, চ্যাঁচামেচি ক'রছি, তবুও যাচ্ছে না; ফিরে ফিরে আমাদের কাছেই আসছে!" আমি বলিলাম, "তা হচ্ছে না বাপু, পিছনে আমার লোক জন রয়েছে, তারা না এলে যাওয়া হচ্ছে না।"

এদিকে দোভাষী আগুন জ্বালাইতে কতই চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু হিমে ডালপালা সব ভিজিয়া গিয়াছে, কিছুতেই জ্বলিতেছে না। পিছনের লোকগুলিকে যতই ডাকিতেছি, "জল্‌দি আও, জল্‌দি আও," ততই বোকারা খালি বলিতেছে, "আতা হুঁ।" আর জিজ্ঞাসা করিতেছে, "ক্যা হুয়া?" আমি বলিলাম, "তুম্‌হারে নানা হিঁয়া বয়ঠা হ্যায়!"

লোকগুলি একটা খুব ঢালু—প্রায় খাড়া—জায়গা দিয়া আসিতেছিল। আমার কথা শুনিয়া আর ঐ জায়গাটুকু হাঁটিয়া নামিবার তাহাদের অবসর হইল না; তাহারা ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া, গড়াইয়া হিঁচ্‌ড়াইয়া নীচে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের কাপড় আর পিছনের চাম্‌ড়ার কি দশা হইল, বুঝিতেই পার।

তখন আমরা সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে খুব চাৎকার করিলাম! সে হতভাগা বাঘ কিন্তু কিছুতেই সেখান হইতে গেল না, শুক্‌নো পাতা মাড়াইয়া পায়চারি করিতে লাগিল। তখন আর সেখানে থাকা ঠিক নয় ভাবিয়া, আমরাও সকলে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া আসিলাম। হাত ধরাধরি করার কারণ, যাহাতে কেহ পিছনে না পড়ে। পিছনে পড়িলেই বাঘ আসিয়া তাহাকে ধরিবে।

বাঘ কিন্তু আমাদের ধমক-ধামকে ভয় পাইল না। রাত্রে আসিয়া তাঁবুর পিছনে দাঁড়াইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের শাসাইয়া গেল!

প্রথমেই যে গ্রামটার কথা বলিয়াছি, সেই গ্রামে বাঘের বড় উৎপাত ছিল। একটা চিতাবাঘ প্রায়ই রাত্রে আসিয়া কুকুর, ভেড়া, ছাগল, মুরগী—যাহা পাইত, ধরিয়া লইয়া যাইত। গ্রামের লোকেরা তাহাকে মারিবার জন্য কত ফন্দী করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বন্দুক লইয়া বসিয়া থাকিলে, সে বেটা কেমন করিয়া টের পায়, আর কোথাও চলিয়া যায়। গ্রামের লোকেদের খালি রাত জাগাই সার হয়। তীর পাতিয়া রাখিলে, সে অন্য পথে যাওয়া-আসা করে, তীরের আশপাশও মাড়ায় না। খোঁয়াড় তৈরি করিয়া তাহাতে কুকুর-ছানা বাঁধিয়া রাখিলে, বাঘ তাহার ত্রিসীমায়ও ঘেঁসে না।

বাঘ ঝুলতে ঝুলতে গর্জ্জন ক'রছে।

শেষে তাহাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান্ লোক অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এক ফন্দী করিল। বড় বড় বাঁশের ডগায় খুব মজবুত্ পাকা বেতের ফাঁস বাঁধিয়া, সে কতকগুলি বঁড়্‌সী-ফাঁদ তৈরি করিল। গ্রামের চারিদিকে বেড়া দেওয়া, সেই বেড়ার মাঝে মাঝে ফুটা আছে, তাহারি ভিতর দিয়া বাঘ ঢুকে। বুদ্ধিমান্ লোকটি করিল কি, সেই সব ফুটার মুখে মুখে এক একটা ফাঁদ পাতিয়া, তাহাতে মুরগী বাঁধিয়া রাখিল।

দেখিতে দেখিতে তিন দিন কাটিয়া গেল। বাঘ আসে কিন্তু ফাঁদ দেখিয়া সন্দেহ করিয়া তাহাতে পা দেয় না। গ্রামের লোকে ভাবিল, আর কেন, এখন ফাঁদগুলি তুলিয়া ফেলি; উহাতে কি আর বাঘ পড়িবে? সেইদিন রাত্রেই বাঘের চ্যাঁচানিতে তাহাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি লাঠিসোটা ও বন্দুক লইয়া, মশাল জ্বালিয়া তাহারা বাহির হইয়া দেখে, বাঘ বাঁশের আগায় ঝুলিতে ঝুলিতে চীৎকার করিতেছে! তাহার পিছনের পায়ে ফাঁস লাগিয়াছে। এত দূরে তাহার দাঁতও পৌঁছাইতেছে না অথবা ফাঁস ছিঁড়িয়া সে পলাইতেও পারিতেছে না। খালি টানাটানি আর তর্জ্জন-গর্জ্জনই সার!

এমন তামাসা ত আর হামেশাই জোটে না, কাজেই সারাটি রাত জাগিয়া শাণেরা সকলে মিলিয়া তাহাই দেখিল। তামাসায় একটু ঢিল পড়িলে, বল্লমের খোঁচা মারিয়া বাঘ মশাইকে আবার চেতাইয়া দেওয়া ছাড়া তাহারা আর কিছুই করিল না। সকাল হইলে গুলি করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলা হইল। ইহার পর হইতে তাহাদের ছাগল, ভেড়া, মুরগী প্রভৃতি আর চুরি যাইত না।

(৬)

ট্রেন হইতে নামিয়া প্রায় আঠার উনিশ দিন পথ হাঁটিয়া, আমরা একটা বড় নালার ধারে এক বৌদ্ধ পুরোহিতের আশ্রমে আসিয়া তাঁবু খাটাইয়াছি।

পরদিন সেল্‌উইন্ নদী পার হইতে হইবে। আমি পূর্ব্বে আর দুইবার সেই পথে যাওয়া-আসা করিয়াছিলাম, কাজেই রাস্তা বেশ ভাল জানিতাম। আগের দিন সকলকে একটা পাহাড় দেখাইয়া বলিলাম, "ঐ পাহাড়ের নীচে গিয়ে দুটো পথ পাবে। যেটা পাহাড়ের উপর দিয়ে গেছে, সেইটেই আসল পথ।" কিন্তু দলের কয়েক জন আমার কথা অমান্য করিয়া অন্য পথে গিয়া, সেদিন যা নাকাল হইয়াছিল, তাহা আর কি বলিব!

এদিকে আমি সমস্ত জিনিস-পত্রশুদ্ধ নদী পার হইয়া, বালির উপর তাঁবু খাটাইয়া বসিয়া আছি। বসিয়া বসিয়া সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আর আমি ভাবিতেছি, তাই ত তাহারা এখনো আসিয়া পৌঁছিল না! ভোর সাড়ে চারটায় বাহির হইয়াছি, আর এখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাস্তা ত মোটে দশ মাইল! এমন সময় একজন খালাসী বলিল, "ঐ রে, বাবুরা আস্‌ছেন!" চাহিয়া দেখিলাম, নদীর ওপারে তাহাদের দেখা যাইতেছে। আর চলিতে পারে না! এক বেচারা ত নদীর ধারে আসিয়াই শুইয়া পড়িয়াছে; তাহার ওজন তিন মণ ছাব্বিশ সের। দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল, তাড়াতাড়ি তাহাদের পার করিয়া আনিয়া, চা-টা খাওয়াইয়া একটু সুস্থ করিলাম।

সেই রাত্রে আমার চাকর শশী বড় কপালজোরে বাঘের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ভোরে তাড়াতাড়ি উঠিতে হইবে বলিয়া, শশী তাহার ঘড়িতে 'য়্যালারম্' চড়াইয়া রাখিয়াছিল। রাত্রে বাঘ আসিয়া শশীর তাঁবুতেই ঢুকিয়াছে। একেবারে ভিতরে আসিতে পারে নাই, তাঁবুর বেড়ার তলা দিয়া কোমর পর্য্যন্ত ঢুকাইয়া, ঠেলাঠেলি করিতেছে ও চারিদিকে হাত্‌ড়াইতেছে! আর আধ হাত আসিলেই শশীর মাথা পায়! এমন সময় "ক্র—ড়্—ড়্—র্—র্—" শব্দে 'য়্যালারম্' বাজিয়া উঠিল। বাঘ ভাবিল, 'সর্ব্বনাশ! বুঝি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল!' সে বেজায় চম্‌কাইয়া গিয়া এমনি এক লাফ দিল যে, তাহাতে তাঁবুর দড়ি ছিঁড়িয়া, খোঁটা উপ্‌ড়াইয়া, সব ওলট্ পালট্।

গোলমাল শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখে, কি ভয়ানক ব্যাপার! তাঁবুর ভিতরে বাঘের বুকের দাগ আর নখের আঁচড় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে!

আমার সঙ্গে ভিখারী বলিয়া একজন লোক অনেক দিন ছিল। দুই পয়সা রোজগার করিতে পাইলে সে ছাড়িত না। বদ্যি বল, রোজা বল, একলাই সে সব। বদ্‌বুদ্ধি তাহার পেটে অনেক ছিল। একটি শাণ ছেলে প্রায়ই আমাদের তাঁবুতে আসিত। শাণেদের গোঁফ নাই, আর আমাদের খালাসীদের প্রায় সকলেরই গোঁফ আছে। শাণ ছেলেটির তাহা দেখিয়া ভারি সখ হইয়াছে, তাহারও গোঁফ হয়। সে কত অনুনয়-বিনয় করিয়া খালাসীদের জিজ্ঞাসা করে, কি করিলে তাহার গোঁফ গজাইবে! ভিখারী তাহাকে বলিল, "গোঁফ চেষ্টা ক'রলেই হ'তে পারে, কিন্তু তাতে খরচ আছে!" ছোক্‌রা ত শুনিয়াই বড় খুসী; খরচ যত লাগিবে সে দিবে, তার গোঁফ হওয়াই চাই। তখন ভিখারী খুব গম্ভীর হইয়া বলিল, "পূজো ক'র্‌তে হবে; তাতে ফুল চাই, ধূপ-ধুনো চাই, আর চাই দুটো সাদা ধব্‌ধবে মোরগ ও চার সের চাল।" ছোক্‌রার গোঁফের না কি নিতান্তই দরকার! তাই তখনি সব জিনিস আনিয়া হাজির করিল। ভিখারীও নূতন উনান তৈরি করিয়া, ভাত আর মোরগ চড়াইয়া দিতে একটুও দেরী করিল না।

রান্না যতক্ষণ হইতেছিল, ভিখারী ততক্ষণ ধূপ-ধূনা দিয়া পূজা করিল বেশ জম্‌কালো রকমের। বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া মন্ত্রও আওড়াইল ঢের। তার পর সব খালাসীতে মিলিয়া পেট ভরিয়া মোরগের ঝোল আর ভাত খাইল। খাওয়া-দাওয়ার পর ভিখারী কয়লার গুঁড়া, রেড়ীর তেল ও একটু চীনা কালী একসঙ্গে মিশাইয়া, শাণ ছোক্‌রাকে দিয়া বলিল, "এই মলম দিয়ে বেশ ক'রে মুখে গোঁফ এঁকে, নাকে মাথায় কাপড় জড়িয়ে শুয়ে থাক্‌বি; সকালে উঠে দেখ্‌বি, এয়া বড়া গোঁফ হ'য়ে আছে! লেকিন্ খবরদার, মুছে যেন না যায়, মলম মুছ্‌লে গোঁফ হবে না।" শাণ ছোক্‌রাও তাহাই করিল, কিন্তু হায়, তাহার গোঁফ হইল না! তখন সে ভিখারীকে আসিয়া ধরিল। ভিখারী বলিল, "এ পাশের আঁকা গোঁফটা একটু মুছ্‌ল কি ক'রে?" ছোক্‌রা বলিল, "কাপড় লেগে মুছে গেছে।" ভিখারী বলিল, "আমি ত আগেই বলেছি, মুছ্‌লে হবে না।"

আর একবার ভিখারী গিয়াছিল, এক বুড়ীর মাথা ধরা সারাইতে। বুড়ী ভাল হইলে তাহাকে একটা কুম্‌ড়া দিবে। সে দেশের লোকেরা বাঘের ভয়ে মাচার উপর ঘর বাঁধিয়া থাকে। ভিখারী যেই সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, অমনি বুড়ীর কুকুর আসিয়া পায়ের গোড়ায় দিয়াছে এক কামড়। সেদিন আর তাহার ডাক্তারী করা হইল না। উল্টিয়া তাহাকেই কাঁধে চড়িয়া তাঁবুতে আসিতে হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

আয়েনপুরের মানুষখাকী

প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগেকার ঘটনা। স্যাণ্ডারসন্ সাহেব একজন নামজাদা শিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আসল কাজ ছিল, মহীশূর রাজ্যে হাতী ধরার ব্যবস্থা করা। মহীশূরের দক্ষিণ-পূর্বে মার্লেই গ্রাম; সেখানে ভীষণ জঙ্গলের ধারে তাঁবু ফেলিয়া, তিনি হাতী ধরিবার সমস্ত কাজ দেখিতেন। তাঁহার পুস্তকে আমরা এই ঘটনাটির কথা পড়িয়াছি।

তখন সেপ্টেম্বর মাস। সাহেব হাতী ধরিবার জন্য সাত আট শত লোক সঙ্গে লইয়া প্রকাণ্ড তাঁবু ফেলিয়া বসিয়াছেন; এমন সময় শুনিতে পাইলেন, আশ-পাশের গ্রামের লোকেরা একটা মানুষখাকী বাঘিনীর অত্যাচারে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। সাহেবের ভাবনা হইল, পাছে বাঘিনীর উৎপাতে হাতী ধরার কাজে কোন রকম ব্যাঘাত ঘটে! যাহা হউক, মাস দুই তিন সে অঞ্চলে তাহার আর কোন খবর পাওয়া গেল না। আপদ্ গিয়াছে মনে করিয়া সকলেই একটু নিশ্চিন্ত হইল।

নভেম্বরের শেষে হঠাৎ খবর আসিল, মানুষখাকী তাহার আগের দিনই একটা মানুষ মারিয়াছে। সাহেব ভাবিলেন, এখন বাঘের সন্ধানে যাওয়া বৃথা, কারণ এই একদিনের মধ্যে সে কোথায়—কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, কে জানে! তিন সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই, আবার খবর পাইলেন, পাঁচ মাইল দূরে আয়েনপুর-গ্রামে আর একটা লোক মারিয়াছে। এবারও খবরটা সময়মত পাওয়া যায় নাই, তবু সাহেব ভাবিলেন, একবার সন্ধান করিয়াই দেখা যাক্।

আয়েনপুরের জঙ্গলের ধারে, গ্রামের কাছেই একটা তেঁতুল গাছের নীচে সেই লোকটার লাঠি, কম্বল আর চামড়ার টুপি পাওয়া গেল। বেচারা তাহার গরুর পাল লইয়া সন্ধ্যার সময় গ্রামে ফিরিবার পথে, বোধ হয়, তেঁতুল পাড়িবার জন্য গাছতলায় একটু দাঁড়াইয়াছিল। বাঘ যে জঙ্গল ছাড়িয়া কাছেই একটা ঢিপির উপরে, ঝোপের আড়ালে, খাপ পাতিয়া বসিয়া আছে, সে কি করিয়া জানিবে? ঢিপিটার পিছনেই একটা ক্ষেতের মধ্যে এক জায়গায় অনেকখানি রক্ত জমিয়া ছিল; বুঝিতে পারা গেল, লোকটাকে সেইখানে লইয়া গিয়া মারিয়াছে। বাঘের পায়ের দাগ ধরিয়া, আধ মাইল দূরে এক জঙ্গলের মধ্যে গিয়া দেখা গেল, লোকটাকে খাইয়া প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে—তাহার পায়ের হাড়গুলি তখনও পড়িয়া আছে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া

সারা জঙ্গল ঘুরিয়াও বাঘের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তখন কতকগুলি মহিষ আর গরু আনিয়া জঙ্গলে ছাড়িয়া দেওয়া হইল—যদি শিকারের লোভে বাঘ আসিয়া হাজির হয়। গরুগুলি প্রথমে ভয়ে জঙ্গলে ঢুকিতেই চায় না। কোথায় একটা পাখী নড়িয়া উঠিতেই, সব লেজ্ গুটাইয়া গ্রামের দিকে দৌড়! অনেক কষ্টে আবার তাহাদের জঙ্গলের মধ্যে একটা সুবিধামত জায়গায় লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বেলা ১টার সময় সাহেব যখন একটু বিশ্রাম করিতে বসিয়াছেন, তখন হঠাৎ কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া পালের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটা তেজীয়ান মহিষ সাম্‌নে থাকায়, বাঘটা বিশেষ কিছু করিতে পারিল না—দুইটা মহিষকে সামান্য কিছু আঁচড়-কামড় দিয়াই সরিয়া পড়িল। সাহেব তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিবারও সময় পাইলেন না। যাহা হউক, বাঘের পায়ের দাগ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, এ সেই মানুষখাকী বাঘিনীটা নয়, অন্য একটা বাঘ। আবার সপ্তাহ খানেক পরে একদিন কুম্বাপ্পার মন্দিরের নীচে নদীর ধারে, বাঘিনীটার পায়ের দাগ দেখিতে পাওয়া গেল। তখনই গ্রামের লোকেদের খবর দিয়া, সকলকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া, সাহেব আবার শিকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাত্রে খবর পাওয়া গেল, কাছেই একটা গ্রামের এক পাল গরু সন্ধ্যার আগে হুড়্‌মুড়্ করিয়া মাঠ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের রাখাল আর ফিরিয়া আসে নাই। খবরটা পাইয়া সাহেব তাড়াতাড়ি সব বন্দোবস্ত করিয়া, ভোর না হইতেই লোক-লস্কর লইয়া বাঘের সন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু বাঘও এদিকে রাতারাতি মানুষটাকে খাইয়া প্রায় শেষ করিয়া, নদী পার হইয়া পাহাড়ের দিকে পলাইয়াছে।

আবার সপ্তাহ খানেক চুপ্‌চাপ্। তার পর খবর আসিল যে, মানুষখাকী মর্লেই হইতে দশ মাইল দূরে একটা গ্রামের পূজারীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। বেচারা এক বলদের উপর চড়িয়া, কুম্বাপ্পার মন্দিরে যাইতে ছিল পূজা দিতে। পথের মাঝখানে বাঘিনীকে দেখিয়াই বলদটা চার-পা ছুড়িয়া, তাহার মনিবকে বাঘের মুখে ফেলিয়াই, এক দৌড়ে গ্রামে গিয়া হাজির!

ইহার পরেই আবার বাঘিনীর খবর পাওয়া গেল, রামসমুদ্রম্ গ্রামে। সেখানে এক মন্দিরের কাছে, একটুখানি জলা জায়গার মধ্যে, বাঘিনীটা একটি লোককে ধরিয়া ছিল। কিন্তু ঠিক কায়দামত, টুঁটি কাম্‌ড়াইয়া ধরিতে পারে নাই, কামড়টা পড়িয়াছিল কাঁধের উপর। তার পর বোধ হয়, তাহাকে ঝাপ্‌টা মারিয়া বাগাইতে গিয়াছিল; তাহাতেই লোকটি কেমন করিয়া বাঘিনীর মুখ ফস্‌কাইয়া একটা কাঁটা-ঝোপের উপর ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গের লোকজন তখনই যে যাহার প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিল।

পরদিন সকালে তাহারা দলবল লইয়া খোঁজ করিতে আসিয়া দেখে, লোকটি তখনও মাটি হইতে পাঁচ ছয় হাত উঁচুতে, সেই কাঁটা-ঝোপে ঝুলিতেছে, আর গোঁ-গোঁ করিতেছে। তাহার সমস্ত শরীরটা রক্তাক্ত—কত জায়গায় মাংস পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সকলে মিলিয়া তাহাকে নামাইল, কিন্তু তখনই বেচারার প্রাণ বাহির হইয়া গেল!

ইহার পর মানুষখাকী একদিন সাহেবের তাঁবুর কাছে আসিয়া হাজির। রাত্রে যে বটগাছের তলায় আগুন জ্বালাইয়া, সাহেব তাঁহার লোকজন লইয়া বসিয়া পরামর্শ করিতেন, তাহারই কাছে বাঘিনীর পায়ের দাগ দেখিতে পাওয়া গেল। সাহেবের সঙ্গে

মানুষখাকী বুড়ীকে নিয়ে পালাচ্ছে।

ওস্তাদ্ পাহাড়ী 'ট্র্যাকার' (Tracker) ছিল। পায়ের দাগ দেখিয়া জানোয়ার খুঁজিয়া বাহির করা তাহাদের কাজ। ইহাদের লইয়া সাহেব চলিলেন, বাঘিনীর পায়ের চিহ্ন ধরিয়া ধরিয়া নদীর ধার পর্য্যন্ত। সেখানে নদীর চড়ায় বালির উপর খুব পরিষ্কার দাগ পাওয়া গেল, কিন্তু অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহার পিছন পিছন গিয়া, শেষটায় দেখা গেল যে, মানুষখাকী ও-পারের গভীর জঙ্গলের দিকে ফিরিয়া গিয়াছে। সেখানে তাহাকে খুঁজিয়া শিকার করা অসম্ভব দেখিয়া, সবাই নিরাশ হইয়া তাঁবুতে ফিরিল। ট্র্যাকারেরা ভারি

অপমান বোধ করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "বাঘিনীটা বার বার আমাদের মুখে কালি দিচ্ছে!"

ইহার পর সাহেব কিছুদিন তাঁহার কাজে অন্যত্র গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়াই শুনিলেন, বাঘিনীটা সেই দিনই দুই মাইল দূরে, একটা গ্রাম থেকে এক বুড়াকে লইয়া গিয়াছে। জঙ্গল হইতে কিছু দূরে বুসানপুর-গ্রাম; সেই গ্রামে বুড়া যখন রাত্রে তাহার মেয়ের ঘরে যাইবার জন্য বাড়ার উঠান পার হইতেছিল, তখনি তাহাকে বাঘে ধরিয়াছে। এমন নিঃশব্দে লইয়া গিয়াছে যে, রাত্রে কেহ টেরও পায় নাই। বাড়ীর সামনেই একটা মস্ত গাছ, তাহার গোড়ায় পাথর দিয়া বেদী বাঁধানো; বাঘটা যে কোন্ সময় হইতে তাহার উপর হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া বসিয়া সব দেখিতেছিল, কেহ তাহা জানিতে পারে নাই। সাহেব তাড়াতাড়ি সেই গ্রামে গেলেন, খোঁজ লইতে। গিয়া শুনিলেন যে, গ্রামের লোকেরা আগেই দল বাঁধিয়া জঙ্গলে গিয়া, ঢাক-ঢোল-কাঁসী বাজাইয়া, বাঘকে এমন সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, শিকারের চেষ্টা বৃথা।

এই ব্যাপারের পর গ্রামে গ্রামে লোকের আতঙ্ক জন্মিল। মানুষ নিজের বাড়ীতে থাকিয়াও নিরাপদ নয়, এই কথা ভাবিয়া ভয়ে সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল যে, ও রকম যদি আবার হয়, তাহা হইলে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইবে।

ট্র্যাকারদের যে সর্দ্দার, তাহার নাম বোমাই গোদা। সাহেব এই বোমাই সর্দ্দারকে কয়েকজন লোক সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন, আয়েনপুরের দিকে বাঘের সন্ধান করিতে। ঘণ্টাখানেক পরেই তাহাদের একজন হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া আসিয়া খবর দিল যে, কড়াইপুর পাহাড়ের কাছে বাঘিনীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কড়াইপুরের পাহাড় এক শ' পঁচিশ হাত উঁচু—একটা ঢিপিমাত্র, তাহাতে ঝোপ-জঙ্গল খুবই কম। সেখান হইতে জঙ্গলে যাইতে হইলে বাঘকে অনেকটা খোলা মাঠ পার হইতে হয়। কাজেই বাঘ মারিবার ভারি সুবিধা। লোকটি বলিল, "বাঘিনীটা একটা বলদ মেরে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় আমাদের গোলমাল শুনে, সেটা ফেলে পাহাড়ের উপর পালিয়ে গেছে।"

সাহেব তাড়াতাড়ি সেই দিকে গিয়া দেখেন, বোমাই সর্দ্দার তাহার লোকদের লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছে। দূরে বলদটা পড়িয়া আছে দেখা যাইতেছে। তাহার কাছাকাছি কোথাও লুকাইয়া বাঘটার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় লুকান যায়? সেখান হইতে প্রায় সত্তর গজ দূরে একটা ঝোপ্ আছে, কিন্তু সেটা নেহাৎ ছোট। তাই ফন্দী আঁটা হইল এই যে, সবাই এক একটা পাতাওয়ালা ডাল হাতে লইয়া ঝোপ্‌টার পাশ দিয়া যাইবে; আর যাইবার সময় ডাল-পালাগুলি ঝোপের উপর ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। এমনি করিয়া সকলেই ঝোপের পাশ দিয়া, সোজা অন্য

দিকে চলিয়া গেল, খালি সাহেব আর বোমাই সর্দ্দার সেই পাতায় ঢাকা ঝোপের পিছনে গুঁড়ি মারিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

বাঘিনীটা যে রকম সেয়ানা, সে নিশ্চয়ই পাহাড় হইতে সব দেখিতেছিল; তাহার চোখের ধুলা দিবার জন্যই এই চালাকিটুকু খেলিতে হইল।

সারাটা বিকাল গেল, সূর্য্য অস্ত যায় যায়। বোমাই সর্দ্দার ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "এই হ'ল সময়, এমনি সময়েই, বাঘেরা শিকারের কাছে ফিরে আসে।" যেমন বলা, অমনি দূরের একটা ঝোপের মধ্য হইতে একটা বন-মোরগ হঠাৎ ডাক্ দিয়া উড়িয়া উঠিয়াছে। সাহেব তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পড়িয়া, পাতার ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিলেন, বাঘিনী আসিতেছে! বেশী বড় নয়, কিন্তু কি সুন্দর চেহারা। গায়ের চমৎকার রং সূর্য্যাস্তের রঙিন্ আলোয় আরো চমৎকার দেখাইতেছে। বাঘিনী আসিতেছে আর এক একবার থামিয়া দাঁড়াইয়া দূরে খোলা ময়দানের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। সাহেবের আর দেরী সয় না, কিন্তু বোমাই সর্দ্দার বলিল, "আর একটু আসুক্।"

বাঘিনী অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলদটার কাছে দাঁড়াইয়াছে আর সাহেবের বন্দুকও গুড়ুম্ করিয়া ছুটিয়াছে! উৎসাহে দুইজনেই তখন লাফাইয়া উঠিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বাঘিনী গেল কোথায়? লোকে বলিত মানুষখাকী, যাদু জানে! তবে কি সে সত্য সত্যই শূন্যে উড়িয়া গেল! দুইজনেই অবাক্ হইয়া তাকাইয়া দেখিতেছেন, এমন সময়, হঠাৎ বলদটার পিছন হইতে বাঘিনীর লেজের ডগাটুকু কাঁপিয়া উঠিল। বাঘিনী গুলি খাইয়া বলদটার পিছনে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে! তখন দৌড়াইয়া গিয়া আর একগুলি মারিতেই তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

সঙ্গের লোকেরা অনেক দূরে একটা তেঁতুলগাছের উপর হইতে সব দেখিতেছিল। বন্দুকের আওয়াজ হইতেই তাহারা দৌড়াইয়া আসিল। তার পর সকলের যা স্ফুর্ত্তি! প্রথমেই ট্র্যাকারেরা মরা বাঘিনীটাকে আচ্ছা করিয়া, মনের ঝাল মিটাইয়া, জুতা-পেটা করিল। তার পর তাহাকে হাতীর পিঠে চড়াইয়া, মশাল জ্বালাইয়া, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া গ্রামের লোকদের খুব খানিক তামাসা দেখান হইল। লোকে বলে বাঘেরা বুড়া হইলে বা কোন কারণে খোঁড়া বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে, যখন অন্য জন্তু মারিতে পারে না, তখনই মানুষ খাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু দেখা গেল, এ বাঘিনীটা দিব্য জোয়ান, মোটাসোটা, গোলগাল, বেশ সুস্থ।

বাঘিনী যেবার মন্দিরের পূজারীকে খাইয়াছিল, সেইবার না কি তাহার সঙ্গে একটা ছোট ছানাও ছিল। ছানাটা পাহাড়ের দিকে জঙ্গলে থাকিত, সেই জন্যই বাঘিনী পলাইবার সময় সেই আয়েনপুরের জঙ্গলের দিকেই যাইত। বাঘিনী মরিবার পর কয়েক

রাত্রি পর্য্যন্ত শোনা গিয়াছিল, ছানাটা তাহার মাকে ডাকিতেছে। তার পর আর তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। বেচারা বোধ হয় না খাইতে পাইয়া মারা গেল।

সুন্দরবনের গল্প

(প্রথমার্দ্ধ)

অনেক দিন আগে, আমি একবার সুন্দরবনে মাত্‌লা নদীর তীরে কতকগুলি মাটির কাজ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে দুইজন সহকারীও ছিল। আমরা একটা খোলা জায়গায় এক চালাঘরে থাকিতাম। সেখানে তখন বাঘের উপদ্রব খুব বেশী ছিল। রাত্রে অনেক সময় আমাদের বেড়ার বাহিরেই ছোট বড় নানা আকারের বাঘ আসিয়া উপস্থিত হইত। যে সব কুলী-মজুরেরা আমাদের অধীনে কাজ করিত, তাহাদের দুই একজনকে বাঘে লইয়া গেলে, অন্য সকলে প্রাণভয়ে কাজ ছাড়িয়া পলায়ন করিত। এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছিল।

একদিন বৈকালে নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের কতকগুলি লোক আসিয়া খবর দিল যে, পূর্ব্বরাত্রে এক বাঘ আসিয়া তাহাদের দুইটা গরু লইয়া গিয়াছে। বাঘটার উৎপাতে তাহাদের গ্রামে বাস করা ভার হইয়াছে। এই বাঘের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা অতি করুণভাবে আমাদিগকে অনুরোধ করিল। আমি তখন একাকী ঐ গ্রামের দিকে যাত্রা করিলাম। আমার হাতে মুঙ্গেরের কারখানায় তৈরি একটা দু’নলা বন্দুক ছিল। বন্দুকটার একটা মস্ত দোষ ছিল এই যে, ছুড়িবার সময় দুইটা ঘোড়াই একসঙ্গে পড়িয়া আওয়াজ হইয়া যাইত। কাজেই দু’নলা বন্দুকের সুবিধা তাহাতে পাওয়া যাইত না।

যাহা হউক, এই বন্দুক লইয়াই আমি যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, সেখানে বহু লোক জড় হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ছেলের সংখ্যাই বেশী। তাহারা বানরের মত মুখভঙ্গী করিয়া একসঙ্গে কথা কহিতেছিল।

আমার বয়স কম দেখিয়া, গ্রামবাসিগণ আমাকে ঐ কাজের অনুপযুক্ত বিবেচনা

করিল। এই কারণে বাঘটাকে তাড়া দিবার জন্য কতকগুলি লোক চাহিলে, তাহারা সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া, শুধু জঙ্গলের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল—"বাঘটা ঐদিকে গিয়েছে।" আমি তাহাদিগকে কত বুঝাইলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহারা বাঘকে তাড়া দিতে রাজি হইল না। নিরুপায় হইয়া আমি একাই ঝোপের দিকে অগ্রসর হইলাম। গ্রামের লোকেরা একটা উঁচু বাঁধের উপর সারি বাঁধিয়া বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ায়, দেখিবার জন্য।

বাঘটা যে ঝোপের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার নীচে ভীষণ কাঁটাবন—তাহার মধ্য দিয়া সোজাভাবে চলা কঠিন। লম্বা হইয়া শুইয়া কতকটা হামাগুড়ি দিবার মত করিয়া চলিতে হয়। ঝোপের ভিতরে এত অন্ধকার যে, আমি প্রথমে কিছুই দেখিতে পাই নাই। আমি যে একেবারে বাঘের মুখে আসিয়া পড়িয়াছি, সেটা মোটেই বুঝিতে পারি নাই। অন্ধকারে ক্রমে চক্ষু একটু অভ্যস্ত হইয়া আসিলে দেখিলাম, আমার সম্মুখে—হাত দুই তিন দূরে—কি যেন একটা পড়িয়া আছে। দৃষ্টি আরও অভ্যস্ত হইলে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার বুক কাঁপিতে লাগিল, মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল! আমার সম্মুখে প্রকাণ্ড এক বাঘ! তাহার পাশেই একটা অর্দ্ধভুক্ত গরু পড়িয়া রহিয়াছে। আমার বন্দুকের গুণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি অতি কষ্টে মাথা স্থির করিয়া, জানুতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং লক্ষ্য স্থির করিয়া বন্দুকের ঘোড়া টিপিলাম। অমনি দুইটা নলই এক সঙ্গে আওয়াজ হইয়া গেল! পরমুহূর্ত্তেই কে যেন ধাক্কা দিয়া আমাকে চিৎপাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর কি হইল, কিছুই জানি না।

আমার জীবনরক্ষার বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত। অতিরিক্ত বারুদ ঠাসায়, আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি নলই বন্দুকের বাঁট হইতে ছুটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ফাটিয়া যায় নাই। সেই মুহূর্ত্তে বন্দুকের বাঁট পিছনের দিকে হটিয়া আসিয়া এরূপ বেগে আমার কপালে লাগিয়াছিল যে, তাহাতেই আমি অজ্ঞান হইয়া যাই। অনেকক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিয়া, আমি কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া পড়ি। নিকটেই খালের মধ্যে একটা খালি নৌকা পাইয়া, তাহাতে আশ্রয় লইলাম। সেখানে রাত্রি কাটাইয়া, পরদিন পিয়ালী গ্রামে উপস্থিত হই। বাঘটার মাথার বেশীর ভাগই বন্দুকের গুলিতে চূর্‌মার হইয়া গিয়াছিল। আমি যখন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হই, তখন বোধ করি সে অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজন করিয়া, অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় পড়িয়াছিল এবং সেইজন্যই তখন আমাকে আক্রমণ করে নাই। ইহাই আমার জীবন-রক্ষার কারণ মনে হয়।

———

যায়। লোকজন উঠিয়া গোলমাল করাতে, চোরেরা পলাইবার চেষ্টা করে। গৃহস্থ যখন আলো লইয়া গর্ত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন সকলে সরিয়া পড়িয়াছে, শুধু একটা চোর পলাইতে পারে নাই। উহার পা-ছুইটা তখনও ঘরের মধ্যে ছিল। চোরের পা ধরিয়া গৃহস্থ ভিতরের দিকে সজোরে টানিতে লাগিলেন। গর্ত্তের বাহির হইতে অন্য চোরেরাও উহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষণকাল টাগ্-অব-ওয়ারের মত টানাটানির পর, হঠাৎ গৃহস্থ চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন। উঠিয়া দেখেন, চোরের মুণ্ডহীন দেহটা ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে! চোরেরা তাহাদের সঙ্গীকে ছাড়াইতে না পারিয়া, ধরা পড়িবার ভয়ে তাহার মুণ্ড কাটিয়া লইয়া প্রস্থান করিয়াছে!

কুমীরের মুখে

সুন্দরবনের ছোট বড় সকল নদীতেই অসংখ্য কুমীর দেখিতে পাওয়া যায়। নদীতে যে এত কুমীর থাকিতে পারে, চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাসই হয় না। অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, নদীর তীরে দুই তিন ফুট্ লম্বা বাচ্চা হইতে ষোল-সতর ফুট্ লম্বা ধাড়ী কুমীর পর্য্যন্ত, জলের দিকে মুখ ফিরাইয়া, ভীষণ রক্তবর্ণ হাঁ করিয়া রোদ পোহাইতেছে। একটু ভয় পাইলেই তাহারা ঝুপ্ঝাপ্ জলে গিয়া পড়ে। স্থলেও ইহাদের উৎপাত বড় কম নয়। শুনা যায়, রাত্রিতে নদীর তীর হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়া, ইহারা গরু-বাছুর পর্য্যন্ত ধরিয়া আনে। ল্যাজের ঝাপ্টা মারিয়া বড় বড় গরুর পা ভাঙিয়া দেয়, তার পর জলে লইয়া গিয়া আহার করে। কখনও কখনও দিনের বেলা মাঠ হইতে গরুর খোঁটা উপ্ড়াইয়া, টানিতে টানিতে নদীর জলে লইয়া আসে। একবার একটি জেলের ছেলে একটা ছোট নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছিল। হঠাৎ এক কুমীর আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। তাহার চীৎকার শুনিয়া লোকজন ছুটিয়া আসিয়া কুমীরকে আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যই করিল না। ছেলেটিকে বোধ হয় সে কায়দামত ধরিতে পারে নাই, তাই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তাহাকে শূন্যে ছুড়িয়া দিয়া, আবার ভাল করিয়া ধরিয়া লইল এবং পরক্ষণেই জলের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

মহিষে মানুষে

সুন্দরবনে দলবদ্ধ বন্য মহিষ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মহিষ বড় ভয়ানক জন্তু। এমন কি, পোষা অবস্থায়ও ইহারা যখন দলবদ্ধ হইয়া থাকে, তখন বাঘ পর্য্যন্ত

ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে ভরসা পায় না। ধনবান্ কৃষকগণ প্রায়ই অনেক মহিষ পুষিয়া থাকে। রাখাল বালকেরা দলের একটা মহিষের পিঠে বসিয়া, নির্ভয়ে ইহাদিগকে চরাইয়া বেড়ায়। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, দলবদ্ধ কোন রুগ্ন কিংবা বাচ্চা মহিষ ধরিবার আশায়, বাঘ অদূরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

একবার আমরা কয়েকজনে মিলিয়া মহিষ-শিকারে গিয়াছিলাম। পথে আমাদিগকে একটা খাল পার হইতে হইয়াছিল। সেখানে তালগাছের তৈরি একরকম ডোঙা পাওয়া যায়. উহাতে কষ্টেসৃষ্টে দুইজন লোক বসিতে পারে। অভ্যাস না থাকিলে এই ডোঙা চালান বড় কঠিন, একটু অসাবধান হইলেই উহা উল্টাইয়া যায়। যাহা হউক, আমরা অতি কষ্টে খাল পার হইলাম এবং একটা ঘাসবনের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সম্মুখেই ছিল এক দল মহিষ। তাহাদের নিকটে গিয়া একটাকে গুলি করিবামাত্র সে মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন দলের অন্য মহিষগুলা ক্ষেপিয়া উঠিয়া আমাদিগকে তাড়া করিল। তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতে গিয়া, আমাদের সবগুলি ডোঙাই উল্টাইয়া গেল। সেই উল্টান ডোঙা ধরিয়া, কোন ক্রমে আমরা গভীর জলে আসিয়া পড়িলাম। মহিষগুলা অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদের পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া আসিয়াছিল। অবশেষে জল গভীর দেখিয়া রাগে শিং নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

মহিষের পাল চলিয়া গেলে, মৃত মহিষটার শিং আনিবার জন্য আমি বাঁকা পথে ঘুরিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। মহিষকে মৃত ভাবিয়া, সেটার লেজ ধরিয়া টানিতে টানিতে আনন্দে চীৎকার করিয়া আমার দলের লোকদিগকে ডাকিতেছি, এমন সময় কি সর্ব্বনাশ! সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া আমাকে গুঁতাইতে আসিল! তাহার লেজ খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকাতে, গুঁতাইতে পারিল না—কেবল আমাকে লইয়া লাটিমের মত ঘুরিতে লাগিল। হাত ছাড়িয়া গেলেই সে আমার প্রাণ বিনাশ করিবে, এই আশঙ্কায়, আমি প্রাণপণে তাহার লেজ ধরিয়া তাহার সহিত ঘুরিতে লাগিলাম! আমার মাথার টুপি উড়িয়া গেল, সঙ্গী লোকজন যে যেদিকে পারিল, ছুটিয়া পলায়ন করিল। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময় মহিষটা হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল! দেখিলাম, এবার সে সত্যই মরিয়া গিয়াছে। সে যাত্রা আমিও বাঁচিয়া গেলাম।

পাল্কীচাপা বাঘ

আমি একবার পাল্কীশুদ্ধ এক বাঘের ঘাড়ে পড়িয়াছিলাম। সুন্দরবনের পশ্চিম দিকে, বহুদূরে, কোন স্থানে খাজনা লইয়া কৃষকদিগের সহিত গভর্ণমেণ্ট্ কর্ম্মচারিগণের

গোলযোগ হওয়ায়, আমাকে তাহার তদারকে যাইতে হইয়াছিল। সেদিকে লোকের বসতি খুব কম; চারিদিকেই ছোট বড় বন, এই সকল বনে বাঘও খুব বেশী। আমি পাল্কীতে যাইতেছিলাম। আমার সঙ্গে আট জন পাল্কী-বেহারা ও রাত্রে মশাল ধরিবার জন্য এক জন—সব শুদ্ধ নয় জন লোক ছিল।

আমরা একটা বন পার হইয়া যাইতেছিলাম। ঘোর অন্ধকার রাত্রি—মশালের আলোকে পথটা যেন আরো অন্ধকার দেখাইতেছিল। আমার একটু ঘুমের ভাব

পাল্কীচাপা বাঘ
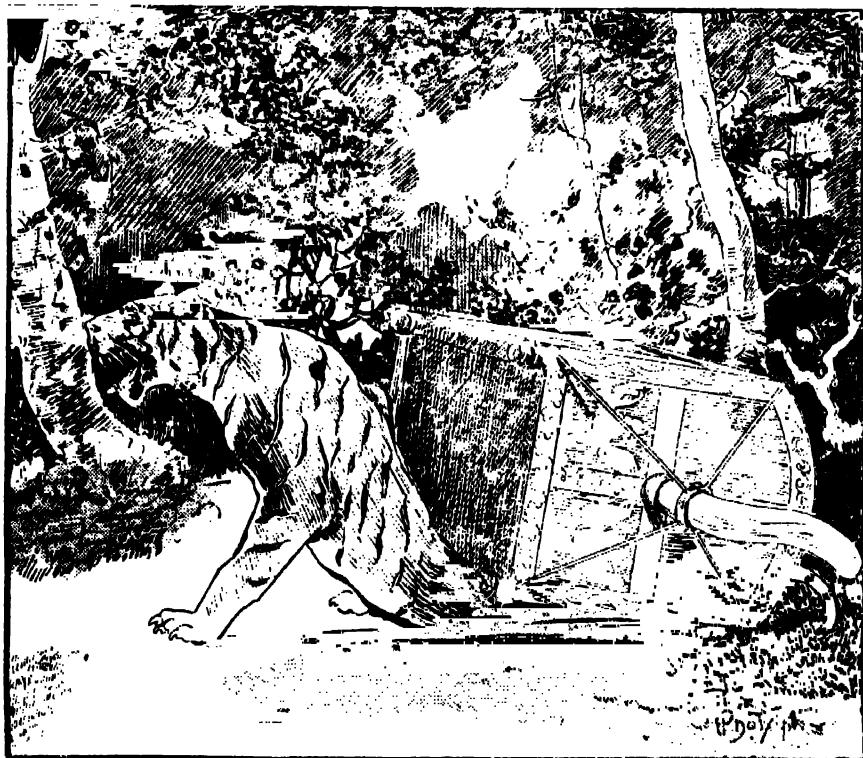
আসিয়াছিল, এমন সময় হঠাৎ হুড়মুড় শব্দে পাল্কীখানা মাটিতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট শব্দ শুনিতে পাইলাম পরমুহূর্ত্তে পাল্কীখানা কাৎ করিয়া দিয়া, কে যেন ছুটিয়া পলাইল! চারিদিক্ নীরব নিস্তব্ধ! আমি বাহির হইবার চেষ্টা করিতে গিয়া দেখি, পাল্কীর দরজা খুব আট্‌কাইয়া গিয়াছে; কিছুতেই খোলা যায় না। অবশেষে পদাঘাত করিতে করিতে, একখানা দরজা খুলিয়া গেল। বাহির হইয়া দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই, লোকজন সব পলায়ন করিয়াছে। তখন পাল্কীখানা সোজা করিয়া এবং উহার দরজা ঠিক করিয়া লইয়া, তাহারই মধ্যে কোন প্রকারে রাত্রিটা কাটাইয়া দিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে বাহকগণ ফিরিয়া আসিলে, প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলাম। বনের মধ্যে রাস্তা অতিক্রম করিবার সময়, হঠাৎ একটা বাঘকে পাল্কীর নীচ দিয়া ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া, তাহারা ভয়ে উহার উপরেই পাল্কী ফেলিয়া পলায়ন করে। সহসা এরূপভাবে পিঠের উপর পাল্কী পড়াতে, বাঘও খুব ভয় পাইয়াছিল এবং বিকট আওয়াজ করিয়াছিল। তার পর বেচারা সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে পলায়ন করিবার সময়, পাল্কীটা কাৎ হইয়া পড়িয়া গিয়া থাকিবে। সে সময় বাঘের মনে যে পলায়ন করা ভিন্ন অন্য কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভালুকের বিক্রম

আমাকে বাকি পথটুকু হাতীতে চড়িয়া যাইতে হইল। প্রজাগণ উত্তেজিত হইয়াছিল বলিয়া, দুইজন সশস্ত্র পুলিস-প্রহরী সঙ্গে লইয়াছিলাম। আমার হাতীর পিঠে হাওদা ছিল না, একখানা সতরঞ্চ বাঁধিয়া তাহারই উপর কোন রকমে বসিয়াছিলাম।

আমরা কিছুদূরে গিয়াছি, এমন সময়, প্রকাণ্ড এক ভালুক আসিয়া আমার হাতীকে আক্রমণ করিয়া বসিল! হাতীটার শিকারে যাওয়া অভ্যাস ছিল না, কাজেই ভয় পাইয়া দৌড়িতে লাগিল। এরূপ অবস্থায়, এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতে সতরঞ্চ আঁকড়াইয়া ধরিয়া, হাতীর পিঠে বসিয়া থাকা কিরূপ কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারিবে না। হাতী ছুটিয়াছে, কিন্তু ভালুক তাহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। আমি অনেক চেষ্টার পর ভালুকটাকে গুলি করিলাম, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ হাতী একপাশে ঘুরিয়া যাওয়াতে, গুলি ভালুকের গায়ে না লাগিয়া, মাহুতের হাতে গিয়া লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সে বেচারি ভয়ে মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন আর কথা কি, সঙ্গে মাহুত নাই, হাতী ছুটিল একেবারে তীরের মত। আমি বেগতিক দেখিয়া হাতের বন্দুক মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, দুই হাতে সতরঞ্চ আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া রহিলাম। ক্রমে হাতীটা একটা গাছের নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমি ডাল ধরিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। এদিকে হাতী দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। হতভাগা ভালুক কিন্তু তখনও তাহার পিছনে পিছনেই ছুটিয়াছে!

হাতী যে কোথায় গিয়া থামিয়াছিল বলিতে পারি না। পরে তাহাকে যখন খুঁজিয়া পাইলাম, তখন দেখা গেল, ভালুক তাহার পশ্চাদ্ভাগ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে। আমার ভয় হইয়াছিল, বুঝি বা মাহুতের হাতখানা কাটিয়া ফেলিতে হয়! কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ বিনা অস্ত্র-প্রয়োগেই সে আরগ্যলাভ করিয়াছিল।

কাল্ কেউটে

অনেকে বোধ করি জানেন যে, ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর হাজার হাজার লোক বিষধর সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। একদিন রাত্রিতে আমি টেবিলের পাশে বসিয়া পড়িতেছিলাম এবং অভ্যাসবশতঃ অন্যমনস্কভাবে চটি-জুতার উপর আস্তে আস্তে পা ঠুকিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে বাহিরে যাইবার আবশ্যক হওয়ায়, আমি দাঁড়াইয়া চটি খুঁজিতে যাইয়া দেখি, যেখানে জুতা আছে মনে করিয়াছিলাম, সেখানে একটা গোখুরা সাপ কুণ্ডলী

"ভালুক তখনও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে।"—৪৯ পৃষ্ঠা

পাকাইয়া পড়িয়া আছে। জুতা জোড়া চেয়ারের একপাশে রহিয়াছে। আমি জুতা মনে করিয়া, ভীষণ কাল্‌সাপের গায়ে পা ঠুকিতেছিলাম।

এরূপ অবস্থাতেও যে সাপ আমাকে কাম্‌ড়ায় নাই, তাহার কারণ, তখন ছিল শীতকাল। সে সময় সাপ মাত্রেই অত্যন্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। ঐ গোখুরা সাপটা এমন নির্জ্জীব অবস্থায় ছিল যে, অনেক লাঠির ঘা খাইবার পরেও উত্তেজিত না হইয়া, সে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। সে যদি আমাকে কামড়াইত, তবে আমার কি দশা হইত, তাহা কয়েকদিন পরের একটা ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

গভর্ণমেণ্টের এই নিয়ম আছে যে, কেহ বিষধর সাপ ধরিয়া আনিলে তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। একদিন একটি লোক একটা কেউটে সাপ ধরিয়া আমাকে দেখাইতে আনে। লোকটি সাপের খেলা ভালরূপ জানিত না। তবুও বাহাদুরী দেখাইবার জন্য, হাঁড়ির ঢাকনা খুলিয়া, সাপটার মুখের কাছে মাথা ও হাত নাড়িতে লাগিল। তখন সাপের কি ভীষণ ফোঁস্-ফোঁসানি! সে খাড়া হইয়া, ফণা বিস্তার করিয়া, ছোবল্ মারিতে উদ্যত হইলে, লোকটি চকিতে একটু হটিয়া গেল আর ছোবল্ পড়িল ঠিক হাঁড়ির মাঝামাঝি। এইরূপ ঘটনা একবার নয়, বার বার ঘটিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে সাপের নিজের মুখে আঘাত লাগা ভিন্ন আর কিছুই লাভ হইল না। অবশেষে লোকটিকে একবার একটু অসাবধান পাইয়া, সাপ হঠাৎ তাহার কজাতে দংশন করিল। আর রক্ষা নাই! হতভাগ্য ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতে করিতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই মরিয়া গেল।

বাঘে মানুষে লুকোচুরি

সুন্দরবনের আর দুইটা বাঘের কথা বলিয়া এই গল্প শেষ করিব। একদিন আমি ঘরে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত একখানা বই পড়িতেছিলাম। অত্যন্ত গরম বলিয়া ঘরের দরজা-জানালা সমস্তই খোলা ছিল। হঠাৎ বাহিরের বারান্দায় আরদালীর পায়ের শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখি, সে যেন থামের পিছনে থাকিয়া কাহার সহিত লুকোচুরি খেলিতেছে। ব্যাপার কি? আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হইল। তখন বারান্দায় গিয়া দেখিলাম, সম্মুখে ঝোপের মধ্যে প্রকাণ্ড এক বাঘ পাইচারি করিতেছে। একবার মাত্র আমার দিকে চাহিয়া, আবার ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কিছুকাল সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বাঘটা এক একবার শিকারী বিড়ালের মত গুঁড়ি মারিয়া চলিতেছে, আবার উঠিয়া ঝোপের মধ্যে ঢুকিতেছে! এইরূপ করিতে করিতে হঠাৎ একদিকে চলিয়া গেল। বোধ হয়, ঘরে যে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল, তাহা দেখিয়া তাহার মনে কোনরূপ সন্দেহ হইয়া থাকিবে এবং সেই জন্যই সে চলিয়া গিয়াছিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময়, নিকটস্থ এক নীলকুঠি হইতে দুই জন বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। রাত্রে আহারের পর আমি তাঁহাদিগকে গাড়ী করিয়া রাখিয়া আসিতে গিয়াছিলাম। আমার বাড়ী হইতে নীলকুঠি প্রায় এক মাইল দূরে। একটা সরু রাস্তা দিয়া সেখানে যাইতে হয়। রাস্তার দুই পাশে ভয়ানক জঙ্গল।

আমরা প্রায় অর্দ্ধেক রাস্তা গিয়াছি, এমন সময় আমাদের ঘোড়া যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল! পরমুহূর্ত্তেই বিকট গর্জ্জন করিয়া, প্রকাণ্ড এক বাঘ এক লাফে ঘোড়ার সম্মুখ দিয়া রাস্তার অন্য পাশে গিয়া পড়িল। বোধ হয়, ঘোড়া আগেই বাঘটাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সহসা সে একটু পিছু হটিয়া না গেলে, বাঘ নিশ্চয়ই তাহার মাথার উপরে আসিয়া পড়িত। যাহা হউক, ইহার পর ঘোড়া ভয়ে অস্থির হইয়া, ভীষণ বেগে ছুটিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে নীলকুঠিতে গিয়া উপস্থিত হইল। সে যাত্রা আমরা ভাগ্যগুণে বাঁচিয়া গেলাম।

এই ঘটনার পর, একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে, সেই বাঘটাই আমার কুঠির নিকট হইতে একটি রাখাল বালককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। রাখাল আমার বারান্দার সামনেই গরু চরাইতেছিল।

বাঘে মানুষে এক গর্ত্তে

আমরা যথাসময়ে সুন্দরবনে বন্ধুবর সুরেশচন্দ্রের কাছারী-বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। পথের কষ্টের কথা আর বলিব না।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। কাছারীতে বন্দুকের বাহুল্য আর প্রহরীদল দেখিয়া বুঝিলাম,—সত্যই আমরা বাঘের ঘরে আসিয়াছি। শুনিলাম, সারা রাত্রি পাহারা চলিবে, আর মধ্যে মধ্যে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হইবে। বন্দুকের আওয়াজে বাঘ ভয় পাইবে। পূর্ব্বে কয়েকবার বাঘ না কি কাছারীর মধ্যে আসিয়াছিল।

সুরেশচন্দ্রের এক জ্যেষ্ঠতাত পুত্র, অমরবাবু, কাছারীর নায়েব। তিনি আমাদিগকে এত অধিক যত্ন করিতে লাগিলেন যে, আমরা বিব্রত হইয়া পড়িলাম।

অন্ধকার একটু ঘন হইয়া আসিলে, কাছারীর চারিপার্শ্বে চারিটি স্থানে আগুন জ্বালা হইল। প্রহরীরা একবার বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করিল ও যে যাহার পাহারার স্থানে গেল। আমরা কয়জন বারান্দায় চেয়ারে বসিলাম। বারান্দার দুইপ্রান্তে দুইটা আলো জ্বলিতেছিল। প্রাঙ্গন হইতে ফুলের সৌরভ আর বৃক্ষপত্রের মৃদু মর্ম্মর শব্দ আসিতেছিল। চারিদিক্ নিস্তব্ধ।

চা-পান করিতে করিতে সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তোমরা বাঘের নামেই এত ভয় পাও, কিন্তু দাদা একবার বাঘের সঙ্গে এক গর্ত্তে রাত্রি কাটিয়েছিলেন।"

প্রমথ, অতুল ও আমি—আমরা তিন জনে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপারখানা কি, অমর বাবু?" তিনি বলিলেন, "এখন আপনারা শ্রান্ত, কিছু আহার করুন। পরে সে কথা ব'লব।"

আহারাদির পর অমরবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সে আজ প্রায় তিন বৎসরের কথা। গ্রীষ্মকাল—সকালে উঠিয়া চা-পান করিয়া বারান্দায় বসিয়া আছি, এমন সময় ঘোড়ায় চড়িয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ কেনেডি আসিয়া উপস্থিত। তিনি সেই দিন রাত্রে তাঁহার তাঁবুতে আহার করিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন। সদর রাস্তা দিয়া যাইলে, কাছারী হইতে তাঁবু প্রায় দুই ক্রোশ। বনের মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ হাঁটা-পথ ছিল, সে পথে এক ক্রোশেরও কম।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ ঘোড়া হইতে নামিলেন না। 'বড় ব্যস্ত' বলিয়া চলিয়া যাইলেন।

যখন যে ম্যাজিষ্ট্রেট্ এখানে আসেন, তখন তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়; কারণ এই বনে ম্যাজিষ্ট্রেটের খাদ্যাদি আমাকেই সংগ্রহ করিতে হয়। মিঃ কেনেডির সহিত আমার পরিচয়ের আরও একটা কারণ ছিল। পূর্ব্ববার যখন তিনি এখানে আসিয়াছিলেন, তখন যে গরুর গাড়ীতে তাঁহার কাপড়ের বাক্স প্রভৃতি ছিল, সেই গাড়ীর গাড়োয়ানকে পথে বাঘে ধরিয়া মারিয়া ফেলে। গাড়ী পৌঁছে নাই। শেষে আমিই তাঁহাকে আমার কতকগুলি পোসাক দিয়াছিলাম। সেই হইতে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয়—বন্ধুত্ব বলিলেও চলে।

সন্ধ্যার সময় আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের তাঁবুতে উপস্থিত হইলাম। অল্পক্ষণ পরেই চন্দ্রোদয় হইল। নিস্তব্ধ বনভূমি চন্দ্রালোকে প্লাবিত হইয়া গেল—চারিদিকে চিক্কণ শ্যাম বৃক্ষপত্রে জ্যোৎস্না পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। আমি হাঁটা-পথে কাছারীতে ফিরিব স্থির করিয়া, সহিসকে ঘোড়া লইয়া ফিরিয়া যাইতে বলিলাম।

আহারের পর ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও আমি তাঁবুর সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। খানিক পরে ঘড়ি খুলিয়া দেখি, রাত্রি প্রায় বারটা। আমি বিদায় লইয়া চুরুট টানিতে টানিতে হাঁটা-পথে রওনা হইলাম। সঙ্কীর্ণ পথ, কোথাও কেহ নাই। একবার মনে হইল, বন্দুকটা সঙ্গে আনিলে ভাল করিতাম। ইচ্ছা হইল, তাঁবুতে যাইয়া একটা বন্দুক লইয়া আসি। শেষে ভাবিলাম,—এইটুকু পথ, এখনই যাইব; আর বন্দুক আনিয়া কাজ নাই।

প্রায় অর্দ্ধপথ আসিয়া দেখিলাম, পথিপার্শ্বে একটা ছাগল-ছানা চীৎকার করিতেছে।

হয় ত ঝোপে তাহার পা আট্‌কাইয়া গিয়া থাকিবে ভাবিয়া, তাহাকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। কয়েক পা গিয়াছি, সহসা ঝপ্‌ করিয়া গর্ত্তে পড়িয়া গেলাম! তখন বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আমি বাঘধরা গর্ত্তে পড়িয়াছি।

"আমি যখন চুরুট টানি, অমনি বাঘ পিছাইয়া যায়।"—৫৫ পৃষ্ঠা।

বনে কোথাও বাঘের বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ হইলে, লোকে স্থানে স্থানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া, তাহাদের মুখ ছোট ছোট ডাল-পালা দিয়া ঢাকিয়া রাখে আর সেই সকল আচ্ছাদনের উপর এক একটা ছাগল বাঁধিয়া রাখে। ছাগলের লোভে বাঘ সেখানে আসে। ক্ষুদ্র ডাল-পালায় তাহার ভার সহে না—বাঘ গর্ত্তে পড়ে। তার পর লোকে

গুলি করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। আমি অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তখন আমি আমার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

আমি বুঝিলাম, সকাল না হইলে সেখানে লোক আসিবে না। কাজেই রাত্রিটা আমাকে সেই গর্ত্তেই থাকিতে হইবে। আমি উহার এক পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

আমি কতক্ষণ সে ভাবে ছিলাম, ঠিক বলিতে পারি না; কারণ এরূপ অবস্থায় পড়িলে, সময় যেন আর কাটিতেই চাহে না! যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে উপরে একটা শব্দ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে গর্ত্তে কি একটা ভারী জিনিস পড়িল। আমি চকিত হইয়া উঠিলাম। ভয়ে ভয়ে দেখিলাম, সেটা কোন জিনিস নহে—মস্ত একটা জানোয়ার! সেই অন্ধকার গর্ত্তে তাহার চক্ষু দুটা যেন জ্বলিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, সর্ব্বনাশ—গর্ত্তে বাঘ পড়িয়াছে!

সেই গর্ত্তের মধ্যে আমাতে ও বাঘে হাত কয়েকমাত্র ব্যবধান। আমি প্রতিমুহূর্ত্তেই আশঙ্কা করিতে লাগিলাম, বাঘ আমাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিবে। কিছুক্ষণ পরে দেখি, সে থাকিয়া থাকিয়া যেন ভয়ে পিছাইয়া যাইতেছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম, আমি যখনই চুরুট টানি, অমনি আগুন উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আর তাহা দেখিয়াই বাঘ পিছাইয়া যায়। আমার মনে পড়িল, বাঘ আগুনকে বড় ভয় করে। যে জলে ডুবিতেছে, সে শেষ অবলম্বন ভাবিয়া জলের উপর ভাসমান তৃণখণ্ড ধরে। আমিও সেইরূপ করিলাম।

পকেট হইতে দুইটা চুরুট বাহির করিয়া ধরাইয়া লইলাম। তাহার পর তিনটা চুরুট একসঙ্গে টানিতে লাগিলাম। বাঘ পিছাইয়া যাইয়া গর্ত্তের এক প্রান্তে স্থির হইয়া বসিল। গর্ত্ত চুরুটের ধূমে পূর্ণ হইতে লাগিল। বাঘ মধ্যে মধ্যে নাক দিয়া অদ্ভুত রকমের শব্দ করিতে লাগিল; তাহাতে বুঝিলাম, চুরুটের তীব্র গন্ধ তাহার সহিতেছে না।

চুরুট তখনও ফুরায় নাই। আমি পকেট হইতে আর তিনটা বাহির করিয়া ধরাইয়া লইলাম। একসঙ্গে এতগুলি চুরুট টানাতে ক্রমেই আমার মাথা যেন কেমন করিতে লাগিল! চাহিয়া দেখিলাম, বাঘ স্থির হইয়া বসিয়া আছে। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিলে, আমি আরও তিনটা চুরুট বাহির করিলাম। পকেটে হাত দিয়া দেখি আর দুইটা মাত্র আছে। স্থির করিলাম, এবার আস্তে আস্তে টানিব।

অল্পক্ষণ পরেই গর্ত্ত ধূমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলাম। আমার চক্ষের সম্মুখে সবই যেন কেমন অস্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল! তার পর কি হইল, আমার মনে নাই।

চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, চারিদিকে আলো; আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের তাঁবুতে তাঁহার ক্যাম্পখাটে শুইয়া আছি। মিঃ কেনেডি চামচে করিয়া আমার মুখে সুরুয়া দিতেছেন।

আমি বিস্মিত হইয়া ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ এই:—"প্রত্যুষে শিকারীরা যাইয়া দেখে যে, গর্ত্তে বাঘ পড়িয়াছে; গর্ত্তের এক প্রান্তে বাঘ বসিয়া আছে, আর অপর প্রান্তে আমি মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছি! তাহারা ছুটিয়া তাঁবুতে উপস্থিত হয়। তিনি তখনও ঘুমাইতে ছিলেন। তাঁহাকে জাগাইয়া এই সংবাদ দিলে, তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, বন্দুক লইয়া গর্ত্তের পাশে আসেন এবং আমাকে মৃত মনে করিয়া বাঘটাকে গুলি করেন। বাঘ মরিলে শিকারীরা আমাকে গর্ত্ত হইতে তুলিয়া আনে। তখন আমাকে ভাল করিয়া দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বুঝিয়াছিলেন যে, আমি মরি নাই—অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছি মাত্র। তাই আমাকে তাঁবুতে আনিয়া শুশ্রূষা করিতেছিলেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আমি যে আগে বুঝ্‌তে পারি নি যে, আপনি জীবিত, তাতে বড় ভাল হয়েছিল। কারণ আপনি জীবিত জান্‌লে খুবই মুস্কিলে পড়্‌তাম—বাঘটাকে গুলি ক'র্‌তে সাহস হ'ত না।"

রমণীর বিক্রম

কিছুদিন হইল, উইলিয়ম্ ম্যাক্‌লিন্ নামে এক সাহেব দাক্ষিণাত্যের এক জঙ্গলে পাহাড়ী লোকদের লইয়া শিকারে গিয়াছিলেন। সেই দলে কাইরমন্ নাম্নী এক আহিরিণীও ছিল। সাহেবের সঙ্গে একজন আহিরিণীর শিকারে যাইবার কথা, গল্প বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহা সত্য কথা। সেই জেলার ডেপুটী কমিশনার স্বয়ং এ কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

সাহেব এবং আহিরিণী অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন। তাঁহারা এক নালার মধ্যে একটা বাঘ দেখিতে পাইয়া গুলি ছুড়িলেন। গুলি খাইয়া বাঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। তাঁহারা একটা গাছের আড়ালে আশ্রয় লইলেন। নালার পাড় খুব উচ্চ ছিল বলিয়া, বাঘ লাফাইয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিলনা। তখন সাহেব স্থির করিলেন যে, নালাতে নামিয়া বাঘের উপর গুলি চালাইবেন। তাঁহার কথা শুনিয়া

আহিরিণী নিষেধ করিতে লাগিল। কিন্তু লোকে পাছে তাঁহাকে কাপুরুষ ভাবিয়া উপহাস করে, এই মনে করিয়া সাহেব তাহার কথায় কান দিলেন না।

ততক্ষণে পাহাড়ী লোকেরা আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। সাহেবকে নালায় নামিতে দেখিয়া, কাইরমন্‌ও বন্দুক হাতে তাঁহার পিছনে পিছনে চলিল। কিন্তু তাঁহারা বেশী দূর না যাইতেই বাঘ সাহেবের দিকে ছুটিয়া আসিল। তখন সাহেব বাঘের বুক এবং কাইরমন্ তাহার গলা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন। কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, বাঘ আসিয়া সাহেবের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আহিরিণী দেখিল, সেই অবস্থায় গুলি করিলে সাহেবের মৃত্যু হওয়াও আশ্চর্য্য নহে; তাই গুলি না করিয়া সে বন্দুকের বাঁট দিয়া বাঘের মাথায় আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু কাঠের বাঁট আর কতক্ষণ টিকিবে? বন্দুকের বাঁট ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে, বাঘ সাহেবকে ছাড়িয়া আহিরিণীকে ধরিল। তখন সাহেব বাঘকে আবার গুলি করিলেন। গুলি খাইয়া বাঘ ক্ষেপিয়া উঠিল এবং আহিরিণীকে ছাড়িয়া অদ্ভুত বিক্রমে সাহেবকে আক্রমণ করিল। এইবার সাহেব নীচে বাঘ তাঁহার উপরে! সাহেবের একখানা হাত বাঘের মুখের ভিতর। তখন সাহেবের ইঙ্গিতে কাইরমন্ এক পাহাড়ীর হাত হইতে বন্দুক লইয়া বাঘের কানের মধ্যে গুলি করিল। আর রক্ষা নাই। গুলি খাইয়া সে সাহেবকে ছাড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

তখন সাহেব নিজের ও কাইরমনের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া বাঘের অন্বেষণে ছুটিলেন। খানিক দূর গিয়া দেখিলেন, আহিরিণীর শেষ গুলি খাইয়া বাঘের দফা রফা হইয়াছে!

স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত নিম্নের ঘটনাটি 'মুকুলে' প্রকাশিত হইয়াছিল:—

"সুন্দরবনের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। কলিকাতা হইতে বিশ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এই মহাবন অবস্থিত। লোকে বলে, এ সকল স্থানে এক সময়ে মানুষের বাস ছিল। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে মগ্‌দের ও পোর্ত্তুগীজদের উপদ্রবে লোক উঠিয়া পলাইয়াছে। তার পর দেশটা ক্রমে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বার বার ঝড়ে সমুদ্রের তরঙ্গ উঠিয়া ঐ সকল স্থানের লোক-জন ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে; যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা শেষে পলাইয়াছে। যে কারণেই হউক, সুন্দরবন বহুকাল হইতে জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজের রাজ্য হওয়ার পর হইতে জঙ্গল আবাদ করিয়া লোকে আবার ঐ সকল স্থানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে সেখানে অনেক নগর ও গ্রাম হইয়া উঠিয়াছে।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি,—তখন সুন্দরবনের মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহে এক এক বংশের লোক এক এক পাড়াতে বাস করিত। সমুদয় পাড়াটি ঘিরিয়া বাহিরে একটি প্রাচীর দেওয়া হইত। সদর দরজা থাকিত একটিমাত্র। খিড়্‌কীর দ্বার ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন হইত। শীতকালে অপরাহ্ণ চারিটা না বাজিতেই সদর ও খিড়্‌কীর দরজা বন্ধ করিতে হইত, কারণ ঐ সময়েই বাঘের ভয়টা কিছু বেশী হইত।

একবার এইরূপ একটা গ্রামে একদিন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে বৈকালে কেমন করিয়া একটা বাঘ ঢুকিয়াছিল। বাঘ ঢুকিয়া দুই বাড়ীর মধ্যস্থানের গলিতে আঁস্তাকুড়ের

"জলন্ত আগুন দেখিয়া বাঘ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল"—৫৯ পৃষ্ঠা

পাশে বসিয়া আছে—কেহ দেখিতে পায় নাই! একজন বেলাবেলি আহার করিয়া আঁচাইতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, সম্মুখে বাঘ! বুঝিতেই পার, ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াইল! আঁচান ত মাথায় রহিল, তিনি 'বাঘ' 'বাঘ' বলিয়া চাৎকার করিতে করিতে সক্‌ড়ি হাতেই ঘরে গিয়া দরজা দিলেন। পাশের বাড়ীর উঠানে সে বাড়ীর একজন লোক বেড়াইতেছিলেন। তিনি এই গোলমাল শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'দিনের বেলা বাড়ীর ভেতরে আসিয়া বাঘে ধরে, এ ত বড় মন্দ কথা নয়! দেখি, কি রকম বাঘ!'—এই বলিয়া সেই গলির মধ্যে যেমন উঁকি মারিলেন, অমনি বাঘের সঙ্গে একেবারে চোখাচোখি! বাঘ তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই লোকটি চীৎকার করিয়া

নিজের পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বাবা, সত্যিই ত বাঘ! বাঘ আমাকে নিলে!' তাঁহার পিতা বলিলেন, 'খবরদার! যেমন আছিস্ তেমনি থাক্, পিছন ফিরিস্ না।' আমাদের দেশে লোকের সংস্কার আছে যে, বাঘের সঙ্গে চোখাচোখি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে বাঘে ধরে না; পিছন না ফিরিলে ধরিতে পারে না।

এদিকে ঘরের লোক যে যে অবস্থায় ছিল, যে হাতের কাছে যা' কিছু পাইল, তাহা লইয়াই 'মার্' 'মার্' করিয়া দৌড়াইয়া গেল। কেহ দ্বার দিতেছিল, দ্বারের তাড়াটা লইয়া ছুটিল। কেহ ঝাড়ু দিতেছিল, ঝাঁটাগাছটা লইয়া দৌড়িল। কিন্তু তাহাতেও বাঘ ভয় পাইল না। যে লোকটি বাঘের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী তখন রন্ধন করিতেছিলেন। তিনি আপনার পতির বিপদ্ দেখিয়া, একখানা জ্বলন্ত কাঠ উনান হইতে বাহির করিয়া লইয়া বাঘের দিকে ছুটিলেন। বলিলেন, 'রোসো, বাঘের মুখ আমি পোড়াব!'—তাঁহার হাতের কাঠখানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই জ্বলন্ত আগুন দেখিয়া বাঘের ভয় হইল। সে লেজ তুলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

বাঘে কুমীরে

একবার দাক্ষিণাত্যে, নর্ম্মদা নদীর তীরে, কোন এক গ্রামে বাঘের উপদ্রব আরম্ভ হয়। স্থানীয় বনেজঙ্গলে বাঘ এত বেশী যে, সাধারণতঃ গ্রামবাসীরা বাঘের নামে তেমন ভয় পায় না। সে আসে রাত্রিযোগে, কচিৎ-কদাচিৎ দু'একটা ছাগল, ভেড়া বা বাছুর লইয়া পলায়ন করে, কিন্তু সেবার একদিন সকালে চারিদিকে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কি ব্যাপার? গ্রামের মোড়লের একটা প্রকাণ্ড হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড়কে পাওয়া যাইতেছে না। খোঁজ্ খোঁজ্ পড়িয়া গেল। ষাঁড়টাকে পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু রাত্রে যে কোন ব্যাঘ্র মহাপ্রভু তাহাকে লইয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। মোড়ল ত চটিয়া আগুন। তাহার হুকুমে তখনই একদল বলিষ্ঠ লোক বাঘের সন্ধানে বাহির হইল। তাহারা সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, বাঘটা খুব বড়। সে নদীর ধারে একটা ঝোপে বসিয়া, সেই ষাঁড়ের মাংস পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেছে।

অমনি বাছা বাছা কয়েকজন শিকারী অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তাহারা প্রথমে আগুন জ্বালাইয়া, চীৎকার করিয়া বাঘটাকে সেই ঝোপ্ হইতে তাড়াইয়া দিল। তার পর কয়েক মিনিটের মধ্যে ঝোপের কাছাকাছি একটা গাছের উপর মাচা বাঁধিয়া ফেলিল। গাছটা তেমন উচ্চ নহে।

সন্ধ্যার পর একজন ওস্তাদ্ শিকারী একটা প্রকাণ্ড বর্শা লইয়া সেই মাচার উপর উঠিয়া বসিল। অস্ত্রটি একেবারে ক্ষুর-ধার! দলের আর সকলে কতকটা আড়ালে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শিকারীকে কেবলমাত্র তাহার স্থির লক্ষ্য ও কব্জীর জোরে বাঘটাকে হত্যা করিতে হইবে। অস্ত্র ফস্কাইলে আর রক্ষা নাই। ক্রোধোন্মত্ত বাঘ তখন মাচার উপর লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রাণসংহার করিবে। যাহা হউক, রাত্রি আন্দাজ বারটার সময় বাঘটা খাদ্যের লোভে সেই ঝোপের ধারে অতি সন্তর্পণে উপস্থিত হইল। মানুষের গন্ধ পাইলেও তাহার ক্ষুধার জ্বালা এত অধিক যে, সে এদিক্-ওদিক্ না তাকাইয়াই ঝোপে ঢুকিয়া আহার করিতে বসিল। অন্ধকার তখন খুব গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ওস্তাদ্ শিকারী পাতার মর্ম্মর শব্দ শুনিয়াই বাঘের আগমন বুঝিতে পারিল। তার পর স্থির দৃষ্টিতে অন্ধকার ঝোপের দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে, তাহার চোখ দুটি দেখিতে পাইয়াই, সে সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করিল। এমনি তাহার হাতের কায়দা যে, অস্ত্রটি বাঘের পায়ের হাড় পর্য্যন্ত এফোঁড়্ ওফোঁড়্ না করিয়া ছাড়িল না। বাঘ রাগে উত্তেজিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে সম্মুখের দিকে দিল এক প্রচণ্ড লাফ। সেই এক লাফে শিকারী যে গাছে ছিল, একেবারে ঠিক তাহার উপরে আসিয়া পড়িল। গাছটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের পা হইতে বর্শাটিও খুলিয়া গেল! শিকারীর ত চক্ষুস্থির! তাহার হাতে অন্য কোন অস্ত্র ছিল না।

এদিকে বাঘের গর্জ্জন শুনিবামাত্র দূরের লোকেরা ঢাক-ঢোল পিটাইয়া ও আগুন জ্বালাইয়া সেই দিকেই ছুটিয়া আসিল। আগুন দেখিয়া আহত বাঘ কোথায় সরিয়া পড়িল। কাছাকাছি অনেক ঝোপ্-ঝাপ্ খোঁজা হইল, কিন্তু বাঘের মৃতদেহ কোথাও পাওয়া গেল না। সে যে বেশী রকম জখম হইয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। সে রাত্রির মত সকলে গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

মোড়ল কিন্তু নিরস্ত হইবার পাত্র নহে। এবার অন্য উপায়ে বাঘকে হত্যা করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই উপায়টি এ দেশের বন্য জাতিরা প্রায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। কোথাও বাঘের অত্যাচার আরম্ভ হইলে, গ্রামবাসীরা তাহার ভুক্তাবশিষ্ট মাংসে এক প্রকার তীব্র বিষ মাখাইয়া রাখে। সেই মাংস আহার করিবার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বিষের কার্য্য আরম্ভ হয়। বাঘ অত্যন্ত কাবু হইয়া পড়ে। তাহার বুক ও জিব

শুকাইয়া আসে। সে তখন নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে গিয়া দারুণ পিপাসা দূর করিবার চেষ্টা করে। এইভাবে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে করিতে বাঘের মৃত্যু হয়।

এরূপ ঘটনা মোড়ল অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এ ক্ষেত্রেও সেই উপায়ে বাঘটা নিহত করিবে, স্থির করিল। ষাঁড়ের তখনও কতকটা অবশিষ্ট ছিল। সে বিশেষভাবে জানিত যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাংসের কিছুমাত্র বাকি থাকিবে, ততক্ষণ বাঘ কোথাও

কুমীরে বাঘে লড়াই

নড়িবে না। সেইটুকু নিঃশেষ করিয়া তবে অন্যত্র যাইবে। পরদিন সকালে মোড়লের পরামর্শ মত সেই ভয়ানক বিষ ষাঁড়ের ছিন্নভিন্ন মাংসে মাখাইয়া রাখা হইল; এবং সে নিজে সন্ধ্যার পরে ঝোপের কাছাকাছি নদীর ধারে, একটা গাছে বন্দুক লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মোড়ল যাহা ভাবিয়াছিল, ঠিক তাহাই ঘটিল। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া রাত্রি প্রায় তিনটার সময় বাঘ আসিয়া উপস্থিত। কয়েকটা শৃগাল আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ বিষের গন্ধ পাইয়া মাংস আহার করে নাই। বাঘ আসিবামাত্র তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। ক্ষুধিত বাঘ কিন্তু বিষের অস্তিত্ব কল্পনাও করে নাই। সে মহানন্দে আহার করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরেই বিষের কার্য্য আরম্ভ হইল। তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিবার উপক্রম! করুণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সে নদীর দিকে ছুটিল।

তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে। মোড়ল বন্দুক লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। বাঘ কোন দিকে না চাহিয়া, একেবারে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং চক্ চক্ করিয়া জল খাইতে লাগিল। জল খাওয়া শেষ হইলে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে আর একটা ঝোপের কাছে গিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। বুকের জ্বালা এদিকে বাড়িয়াই চলিয়াছে, সে আবার জল খাইতে ছুটিল।

বাঘের এই যাতনার অবস্থা দেখিয়া মোড়লের আর রাগ রহিল না গুলি করিয়া সে তাহার কষ্টের লাঘব করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মোড়ল বন্দুকের ঘোড়া টিপিবার পূর্ব্বেই, একটা বৃহৎ কুমীর আসিয়া বাঘের ঘাড় কাম্‌ড়াইয়া ধরিল। তার পর মরণাপন্ন বাঘে ও কুমীরে কি ভীষণ লড়াই! মোড়ল বন্দুক নামাইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। লড়াইয়ের উত্তেজনায় বাঘ কিছুকালের জন্য সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল।

কুমীর বাঘের থাবার আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাকে জলের ভিতর টানিতে চেষ্টা করিতেছিল; বাঘও প্রাণপণ বলে জল তোলপাড় করিয়া, কুমীরকে ডাঙায় তুলিবার জন্য ব্যস্ত। একবার দুইটাই ডুবিয়া যায়; পরক্ষণেই আবার বাঘ মাথা তুলিয়া উঠে। কুমীর কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার কামড় ছাড়ে নাই। শেষে কুমীরেরই জিত হইবার উপক্রম হইল। বিষের জ্বালা এবং কুমীরের আক্রমণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাঘ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল। ইহার পর কুমীর যেই মাথা তুলিয়া বাঘকে জলের তলে টানিতে যাইবে, মোড়ল অমনি নিমেষমধ্যে অব্যর্থ গুলির আঘাতে তাহাকে বিনাশ করিল। মোড়ল পরের গুলিতে বাঘকেও সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিল।

বনের খবর

(৯)

আমরা বনের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। পথে দেখিলাম, একটা গ্রামের বাড়ী-ঘর সব পড়িয়া আছে, তাহাতে একটিও মানুষ নাই। দিনের বেলায় বাঘ আসিয়া সেই গ্রাম হইতে মানুষ ধরিয়া লইয়া যাইত, তাই সকলে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। কাজে থাকিলে এমন বনের ভিতর দিয়াও মানুষকে চলিতে হয়! একলা যাইবার সাধ্য নাই, তাহা হইলে অমনি বাঘে ধরিবে। আমাদের সঙ্গে একজন লোক আসিয়াছে, পথ দেখাইতে। সে আর দুইজনকে সঙ্গে আনিয়াছে—তাহা না হইলে আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়া, একলা ফিরিয়া যাইবার সময় তাহাকে বাঘে ধরিয়া খাইবে। বনের ভিতর যদি রাত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারা আড্ডায় থাকিবে। সে আড্ডা কি রকম, জান? পাঁচিল ঘেরা বাড়ী নয়, শুধু বাঁশ-ঝোপের মাথায় একটা ছোট মাচা। তাহাতে উঠিয়া বসিয়া কোন রকমে কাঁপিতে কাঁপিতে রাত কাটাইতে হয়।

বাঘেরা জানে যে, বনের ভিতরে তাহারাই রাজা। বেলা সাড়ে আটটার সময় ঘোড়ায় চড়িয়া একটি ছোট নদী পার হইতেছি, সঙ্গে পাঁচ ছয় জন লোক। নদীর মাঝামাঝি আসিয়া দেখি, মস্ত বড় এক বাঘ প্রায় আমাদের পথের উপরেই দাঁড়াইয়া জল খাইতেছে। আমরা যে এতগুলি লোক আসিয়াছি, সেজন্য তাহার কোন চিন্তাই নাই। দুই এক ঢোক জল খায়, আর মাথা তুলিয়া এক একবার আমাদের দিকে চাহিয়া দেখে! আমরা অনেক চ্যাঁচামেচি করাতে, আস্তে আস্তে উঠিয়া, রাজার মত চালে সেখান হইতে চলিল। দুই চারি পা যায়, আর ঘাড় ফিরাইয়া আমাদের দেখে। ততক্ষণে পিছন হইতে আমাদের আরও ঢের লোক আসিয়া পড়িয়াছে। সকলে মিলিয়া খুব সোরগোল জুড়িয়া দিলে পর, ব্যাটা ছুটিয়া গিয়া জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল।

সেখান হইতে একটা গ্রামে গিয়া দুইদিন ছিলাম। তার পর আবার ওই পথেই ফিরিতে হইল আর ওই জায়গাতেই রাত্রে থাকিতে হইল। গ্রামের মোড়ল অনেক মানা করিয়াছিল। কোন মতে ফিরাইতে না পারিয়া, শেষে দুইজন লোক লইয়া, নিজেই বন্দুক হাতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। বিকালে দুটা নালার মোহনায় আসিয়া তাঁবু খাটাইয়াছি। চাকর-বাকরেরা কেহ রাঁধিতে, কেহ খাইতে, কেহ বাসন মাজিতে ব্যস্ত। আমি আমার তাঁবুর সম্মুখে বসিয়া পরদিনের কাজের পরামর্শ করিতেছি।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, সেই নালা দুইটার মোহনার কাছে, একটা খুব বড় গাছের আড়াল হইতে গলা বাড়াইয়া, কে যেন আমাদিগকে দেখিতেছে! বার কতক সহসা কথা বন্ধ করিয়া, আমি সেই দিকেই তাকাইলাম, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। শেষে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম, যেন দুইটা কি জিনিস ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল। তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সে দুইটা বাঘের চোখ! অমনি 'বন্দুক আন' বলিয়াই আমি লাফাইয়া উঠিয়াছি এবং বাঘও আর লুকাইয়া

একটা বাঘ প্রায় আমাদের পথে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছে।—৬৪ পৃষ্ঠা।

থাকিয়া ফল নাই দেখিয়া, দুই লাফে একেবারে আমার কাছাকাছি একটা নীচু জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

এদিকে খালাসীরা বাঘের গন্ধ পাইয়াই, যে যাহার কাজ ফেলিয়া তাঁবুর ভিতরে গিয়া দরজা আঁটিয়া দিয়াছে! বন্দুকটা লইয়া আসিতে কাহারও ভরসা হইতেছে না। কাজেই আমি নিজে গিয়া তাড়াতাড়ি 'রিভল্‌ভার্‌' লইয়া আসিলাম, কিন্তু বাঘ আর দেখিতে পাইলাম না। বেগতিক দেখিয়া সে আগেই সরিয়া পড়িয়াছিল। ততক্ষণে

খালাসীদের মুখে কথা ফুটিয়াছে। একজন বলিল, "হামি দেখিয়েছে! এত্তো উঁচা ছেলো, ওই দিকে চল্ গেলো।"

একটা পাহাড়ে কাজ করিতে গিয়াছিলাম, সেটাকে দূর হইতে দেখিতে ঠিক দেওয়ালের মত। পাহাড়ের মাঝামাঝি আট দশ ইঞ্চি চওড়া একটু পথের মত আছে, তাহার নীচেই একেবারে খাড়া। সেই সরু পথে আমরা যাওয়া-আসা করি। একদিন সকালে উঠিয়া আমি বাহির হইয়া গিয়াছি, কুলীরা জিনিস-পত্র লইয়া চলিয়া গিয়াছে, তাঁবুতে রহিয়াছে খালি, আমার চাকর শশী, একজন দোভাষী, আর শঙ্কর ও মঙ্গল নামে দুইজন খালাসী। মঙ্গলের সঙ্গে দোভাষীর কি লইয়া ঝগড়া হইয়াছে। মঙ্গল তাই চটিয়া—"যাই সাহেবের কাছে রিপোর্ট্ ক'র্তে" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দোভাষী ভাবিল, তাড়াতাড়ি গিয়া মঙ্গলের সঙ্গে ভাব করিতে হইবে; কি জানি, পাছে রিপোর্ট্ করিয়া বসে। এই ভাবিয়া সে-ও মঙ্গলের পিছন পিছন ছুটিল। ভয়ানক রাস্তা, পা হড়্কাইলেই একেবারে এক শ' দেড় শ' ফুট নীচে গড়াইয়া পড়িতে হইবে। দোভাষী ভয়ে ভয়ে মাথা হেঁট করিয়া, পথের উপর চোখ রাখিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া দেখিতেছে, মঙ্গলকে দেখা যায় কি না।

মঙ্গলের তামাক খাইবার রোগ। পথ চলিতে চলিতে ক্রমাগতই তাহাকে কল্কে হাতে লইয়া দাঁড়াইতে হয়। দোভাষী দেখিল, সামনেই বাঁশের আড়ালে লালচেপনা কে যেন বসিয়া রহিয়াছে। মঙ্গলের মাথায় লাল পাগ্ড়ী, তাহা হইলে সে-ই নিশ্চয় ওখানে বসিয়া তামাক সাজিতেছে। দোভাষী হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল, আর দুই পা অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিল, "হাঁ ভাই মঙ্গল, এটা কি ভাল? এক জায়গায় দশ পাঁচটা হাঁড়ি থাক্লে একটু আধটু ঠোকাঠুকি হ'য়েই থাকে! তাই বলে কি কথায় কথায় উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট্ ক'র্তে আছে?" বলতে বলতে সে বাঁশগুলির সাম্নাসাম্নি আসিয়াছে, আর মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে, বাবা গো! এ ত মঙ্গল নয়! এ যে প্রকাণ্ড বাঘ! বাঘটা তখন ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, আর দোভাষীর দিকে চোখ রাঙাইয়া চাহিয়া লেজ ঘুরাইতেছে।

দোভাষী তাড়াতাড়ি তাহার ছোট্ট তলোয়ারখানার মুখ বাঘের দিকে বাগাইয়া ধরিয়াছে, যদি সে লাফ মারে! বাঘটারও বোধ হয় সেই মৎলব! সে কিন্তু লাফাইবার সুবিধা পাইতেছে না কারণ মাঝে বাঁশঝাড়। দোভাষী ভাবিতেছে, শশী আর শঙ্কর তাহার পিছনে, তাহারা এখনি বন্দুক চালাইবে! শশী যে বন্দুক লইয়া চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়াইয়া জুতার ফিতা বাঁধিতেছে, তা কি সে জানে? শেষে যখন একটু মুখ

ফিরাইয়া চাহিয়া বুঝিতে পারিল যে, পিছনে কেহ নাই, তখন সে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার কি সহজে বাহির হইতে চায়! ভয়ে বেচারার গলা শুকাইয়া গিয়াছে। যাহা হউক একটা গলাভাঙা রকমের আওয়াজ গিয়া কোন রকমে শশী ও শঙ্করের কানে পৌঁছিল, আর তাহারাও তখনি 'ভয় নাই' বলিয়া ছুটিয়া আসিল। বাঘও বেজায় থতমত খাইয়া 'হুপ্' বলিয়া গাল দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এক ছুট! দোভাষী তখন ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, ঘামে তাহার গায়ের কাপড় সব ভিজিয়া গিয়াছে, কথা বলিতে পারিতেছে না। অনেক কষ্টে খালি বলিল, "বা—ঘ!" তাহার পর হইতে আর কখনো সে এক্‌লা পথ চলিত না।

সে দেশ হইতে আমি দুইখানা বাঘের চামড়া লইয়া আসিয়াছিলাম। সেই দুইটা বাঘের কথা বলি। একদিন একটি শাণ যুবক হরিণ মারিতে গিয়াছিল। একটা হরিণের পায়ের দাগ দেখিয়া, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, সে গুলি করিতে গেল, কিন্তু বন্দুকে আওয়াজ হইল না। আবার ঘোড়া তুলিয়া বন্দুক ছাড়িতে গেল, সে বারেও আওয়াজ হইল না। লোকটি ভাবিল, বুঝি বা ক্যাপ্‌টা খারাপ। তাই সে কোমর হইতে আর একটা ক্যাপ্ লইতে গেল। ক্যাপ্ বাহির করিয়াছে, এমন সময় মুখ ফিরাইয়া দেখে, তাহার পিছনেই এক প্রকাণ্ড বাঘ! সাত আট হাত দূরেও নয়! তাহাকে ধরে আর কি! তখন সে প্রাণের ভয়ে বিষম ব্যস্ত হইয়া, সেই খারাপ ক্যাপ শুদ্ধই বন্দুক তুলিয়া ঘোড়া টিপিল। কি আশ্চর্য্য! এবারে গুড়ুম করিয়া আওয়াজ হইয়া বাঘের মগজ উড়িয়া গেল!

আর একটা বাঘকে মারিয়াছিল, একটি বারো বছরের ছেলে। বেলা দুই প্রহরের সময়, গ্রামের পুরুষ, রমণী সবাই ক্ষেতে কাজ করিতে গিয়াছে; ঘরে রহিয়াছে শুধু ছোট ছেলেমেয়েরা। সে দেশের ঘর হয় মাচার উপর। উপরে মানুষ থাকে, আর নীচে থাকে তাহাদের পোষা জন্তুগুলি। দিনের বেলাতেই একটা বাঘ একজনদের ঘরে ঢুকিয়া একটা শূয়র ধরিয়াছে, আর সে চেঁচাইয়া দেশ মাথায় করিয়া তুলিয়াছে! ঘরে ছিল ঐ বারো বছরের ছেলেটি। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া, তাহার বাবার গুলিভরা বন্দুক লইয়া, মাচার বাঁশের ফাঁক দিয়া, এক গুলিতেই বাঘটার শূয়র খাইবার সাধ মিটাইয়া দিল। তার পর গ্রামশুদ্ধ লোক তৃপ্তির সহিত সেই বাঘের মাংস খাইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে লাগিল।

(৫)

জঙ্গলের কাজ, পথ নাই বলিলেই হয়। সঙ্গে হাতী আছে। পাহাড়ে নদীর পাশ দিয়া চলিতে হয়। নদীর ধারগুলি এক এক জায়গায় নীরেট পাথর, আর দেওয়ালের মত খাড়া। তাহাতে পা রাখিবার মত একটু আধটু জায়গা আছে বটে, কিন্তু সে অতি সামান্য।

তাহার উপর দিয়া বানরের মত চার হাত-পায়ে না হইলে চলিবার উপায় নাই। মানুষেরই এই দশা, হাতী চলিবে কি করিয়া ?

ভোরের বেলা উঠিয়া তাড়াতাড়ি চা খাইয়া কাজে বাহির হইয়াছি। একজন বর্মা সার্ভেয়ার সঙ্গে। লোকটি বড় ভাল। আমাদের যাইতে হইবে আট শ' হইতে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়া। হাতী গিয়াছে অন্যদিকে। সঙ্গের লোকদের, পাঁচ ছয় মাইল দূরের একটা হাতীর আড্ডায় গিয়া তাঁবু ফেলিতে বলিয়া দিয়াছি। দুই-আড়াই মাইল দূরে আর একটা আড্ডা আছে। বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছি, যেন সেখানে না যায়।

আমরা বরাবর চলিয়াছি। একে এমনি রাস্তা, তাহাতে আবার পাহাড় বেজায় চড়াই। আন্দাজ দশ আনা উঠিতে না উঠিতেই বেলা শেষ হইয়া আসিল। কাজেই সার্ভেয়ারকে বলিলাম, "চল এখন ফিরি, বাকি কাজ কাল সকালে এসে শেষ ক'রব।" এই বলিয়া আমরা সেখান হইতেই সোজাসুজি নদীতে নামিতে লাগিলাম। নামিতে নামিতে হাঁটুতে ব্যথা ধরিয়া গেল, তবু পথ আর ফুরায় না। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, তখনো নদী প্রায় সিকি মাইল নীচে। বাকি পথটুকু আরও খাড়া, আলো না হইলে তাহাতে চলাই যাইবে না। কাজেই আমরা সেইখানে বসিয়া, শুক্‌নো বাঁশ দিয়া চার পাঁচটা মশাল তৈরি করিয়া লইলাম। মশাল জ্বালাইয়া কি সহজে নামা যায় ? কাঁটা গাছ, কাঁটা ডালপালা, কাঁটা লতাপাতা ধরিয়া নামিতে গিয়া অনেকেরই হাত ছড়িয়া গেল।

নদীতে আসিয়া সার্ভেয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আড্ডা কত দূরে ?" সে বলিল "একটা আধ মাইল নীচে, আর একটা বোধ হয় দেড় মাইল দু' মাইল উপরে; অন্ধকারে ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না।"

সেই উপরের আড্ডাতেই আমাদের যাইতে হইবে। সে যে কি বিদ্‌ঘুটে রাস্তা তা আর ভুলিব না। কখনো বালির উপর দিয়া, কখনো পাথর ডিঙ্গাইয়া, কখনো বানরের মত কাঁটা ডাল-পালা আঁকড়াইয়া ধরিয়া খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া চলিয়াছি। দুইটা মশালের আলোতে সেই অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছে না। দেড় মাইল পথকে আমাদের মনে হইতেছিল যেন আট দশ মাইল। যাইতে যাইতে যখন আর পা চলিতে চায় না, তখন সার্ভেয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কত দূর ?" সে বলিল, "অর্দ্ধেক এসেছি।" শুনিয়াই ত আমাদের চক্ষুস্থির !

খালাসীরা বলিল, "একটু না জিরুলে আর চল্‌তে পাচ্ছি না।" কি করি ? তাহাদের সেখানে রাখিয়া, সার্ভেয়ার ও একজন খালাসীকে লইয়া চলিলাম। খালাসীর হাতে একটা বেশী মশাল দিয়া রাখিলাম, দরকার হইলে জ্বালাইব। এমনি করিয়া খানিক

দূর গেলাম। মনে হইল, কত ঘণ্টাই না জানি চলিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কত দূর?" সার্ভেয়ার বলিল, "পঞ্চাশ ষাট জরীপ (২২ গজে ১ জরীপ) হবে।"

"জানোয়ারটা অমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।"—৬৯পৃষ্ঠা

তখন মনে একটু উৎসাহ হইল; আবার খানিক চলিয়া নদী পার হইলাম। ততক্ষণে সার্ভেয়ারের হাতের মশালটি প্রায় নিভিয়া আসিয়াছে। সে খালাসীকে বলিল, "সেই যে আর একটি মশাল এনেছিলি, সেটা দে।" সে বলিল, "সে ত ফেলে

দিয়েছি!" ব্যস্! আমাদের চোখ গিয়া কপালে ঠেকিল! "ফেলে দিয়েছিস্ কি রে ব্যাটা! কার হুকুমে ফেল্লি?" "কেন? বাবু যে বল্লে, আর বেশী দূর নেই, তাই ফেলে দিয়েছি।" তখন নূতন একটি মশাল তৈরী করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। খালাসীকে বলিলাম, "তোর সঙ্গে দা আছে, দে।"

কিন্তু দা খানাও বেটা পিছনের লোকদের কাছে রাখিয়া আসিয়াছে। এখন উপায়? সার্ভেয়ারকে বলিলাম, "শুক্‌নো লতাপাতা জড় ক'রে, ঐ নিবু নিবু মশালটার বাকি বাঁশ দিয়ে আগুন জ্বেলো; তার পর শুক্‌নো বাঁশ পাথর দিয়ে থেঁতলিয়ে মশাল বানাও।"

ততক্ষণে মশালটা প্রায় নিবিয়া আসিয়াছিল। সার্ভেয়ার আর খালাসী শুক্‌নো পাতা জড় করিয়া, তাহার ভিতরে মশালের বাকি বাঁশ কয়খানা দিয়া, উপুড় হইয়া ফুঁ দিতে লাগিল। আমি পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি। আমার পিছনে ছোট্ট নদীটি। সম্মুখে হাত ছয় সাত দূরেই একখানা মস্ত চওড়া পাথর প্রায় আমার মাথার সমান উঁচু। উহারা খালি ফুঁ-ই দিতেছে, হিমে ভেজা পাতা কিছুতেই জ্বলিতেছে না।

এমন সময় হঠাৎ সেই পাথরের দিকে আমার চোখ পড়িল। দেখিলাম, তাহার উপর দুইটা কিসের চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে! সে দুইটা যেন আমারই পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে! চোখ দুইটা পাথরখানার চাইতে প্রায় দেড় হাত উঁচুতে। ভাবিলাম, নেক্‌ড়ে বা হায়না হইবে। আবার মনে হইল, তাহাই যদি হয়, তবে চোখ দুইটা এত দূরে দূরে কেন?

উহারা সবে একটু আগুন করিয়াছে। এখন যদি আমি কিছু বলি, তবে উহারা আগুন জ্বালাইতেই পারিবে না, আর তাহা হইলে বড়ই বিপদ। কাজেই আমি চুপ করিয়া আছি। উহারা তখনও খালি ফুঁ এর পর ফুঁ-ই দিতেছে। দিতে দিতে যেই দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, জানোয়ারটা অমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাপ্ রে কি প্রকাণ্ড বাঘ! এতক্ষণ গুঁড়ি মারিয়া ছিল, তাই বেশী উঁচু দেখায় নাই। বাঘটা উঠিয়াই লাফাইয়া মাটিতে নামিয়াছে, অমনি সার্ভেয়ার টের পাইয়াছে। সে সেই দেশের লোক, বনে বনে ফিরে, তাহার কাছে লুকাইবার যো নাই। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ওটা কি রে?" আমি বলিলাম, "যাই হোক্ না কেন, এখন ত চলে গেছে, শীগ্‌গির মশাল জ্বালো!"

ততক্ষণে আগুন খুব জ্বলিয়া উঠিয়াছে, চারিদিক্ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে। বাঘটা ত তাহা দেখিয়া আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠিয়া গেল। শুক্‌নো পাতার উপর তাহার পায়ের শব্দ শুনিয়া সার্ভেয়ার বলিল, "বড়া জবর শের?" খালাসী কিছুই বলিল না, সে বেচারা ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

যাহা হউক, আমরা তাড়াতাড়ি মশাল জ্বালাইয়া লইয়া, সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। সার্ভেয়ার ঠিকই বলিয়াছিল; আড্ডার লোকেদের চীৎকার করিয়া ডাকিতেই তাহারা জবাব দিল, আর আমরাও একটু পরেই সেখানে পৌঁছিয়া গেলাম।

ক্রমশঃ

ত্রিহুতে বাঘশিকার

কোন প্রসিদ্ধ শিকারী লিখিয়াছেন ঃ—"শিকারের নেশা একবার ঘাড়ে চাপিলে আর রক্ষা নাই। এধার-ওধার ভ্রমণ করিয়া যখন ত্রিহুতের জঙ্গলে পৌঁছিলাম, তখনও খুব শিকারের ঝোঁক রহিয়াছে।

বাহন যোগাড় করিতে দেরী হইল না। তবে বন্দুকধারী সঙ্গী আর কাহাকেও পাইলাম না। দুই তিন দিনের মধ্যেই খবর আসিল, পাঁচ ছয় মাইল দূরে একটা খুব বড় বেতবন আছে, সেই বনে এবং তাহার আশ-পাশের জলাভূমির ঝোপে-ঝাপে বাঘের অভাব নাই। বনটা ঠেঙাইতে থাকিলে, বাঘ ফাঁকা জলায় বাহির হইয়া পড়িবে; তখন মারিবার সুবিধা হইবে। কিন্তু বন ঠেঙাইবার সময় যদি বাঘ সামনের দিকে না আসিয়া ডান দিক্ বা বাঁ দিক্ দিয়া আরো গভীর বনে পলাইয়া যায়, তাহা হইলে শিকার করা মুস্কিল হইবে। এই শুনিয়া আমি কয়েকজন তীরন্দাজ শিকারী যোগাড় করিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, লোকগুলিকে এদিক্-ওদিক্ গাছের উপর বসাইয়া দিব। বাঘ যখনই গভীর বনে পালাইতে যাইবে, তখনই তাহারা চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে জলার দিকে তাড়াইয়া দিবে।

এই সব ব্যবস্থা করিয়া আমি হাতীর পিঠে চড়িয়া বনের ভিতর চলিতে লাগিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন মাহুতও আরো কতকগুলো হাতী লইয়া চলিল। বেতবনের কাঁটা যে কি ভয়ানক তাহা হয় ত অনেকেই জানে না। সে কাঁটা ঠিক বঁড়শীর মত। গায়ে লাগিলে মাংস তুলিয়া লয়, কাপড়চোপড়ে লাগিলে তাহা একেবারে ছিঁড়িয়া যায়। এই বনে সাবধানে চলিতে লাগিলাম। খানিক গিয়া দেখি, এক জায়গায় ভিজা মাটিতে বাঘের থাবার ছাপ রহিয়াছে। সে ছাপ বরাবর একটা ঝোপের দিকে গিয়াছে। মাহুতদের ডাকিয়া সেই ঝোপ টা ঘিরিয়া ফেলিলাম। আমি রহিলাম ঠিক মাঝখানে।

বিশটা হাতী বন মাড়াইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। পাঁচ মিনিট এইরূপ চলিবার পর মনে হইল, বনের মাঝখানটা যেন নড়িতেছে। মনে হইল, একটা বাঘ; কিন্তু একটু পরে বনটা এত নড়িয়া উঠিল যে, একটার বেশী বাঘ আছে বলিয়া সন্দেহ হইল। আমি

তখন নিজেকে ঠিক করিয়া লইলাম এবং বাঘ বাহির হইবার পূর্ব্বেই, যে স্থানটি খুব বেশী নড়িতেছিল, সেইখানে গুলি চালাইলাম। সেই মুহূর্ত্তে মনে হইল, বাঘের লাফালাফিতে বন বুঝি ভাঙিয়া যায়! আমি যেটার উদ্দেশে গুলি ছুড়িয়াছিলাম, সে ভুল করিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে, বন হইতে বাহির হইয়া আসিল। মনে হইল, গুলি লাগিয়াছে। আর একটা বাঘ ছুটিয়া আসিয়া একটা হাতীকে আক্রমণ করিল। আমি তাড়াতাড়ি আমার হাতী লইয়া সেই হাতীকে বাঁচাইতে গেলাম। কিন্তু এ কি! সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটা বাঘ বাহির হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

মাহুত, হাতী ও বাঘের মধ্যে তখন মহা হৈ-চৈ বাধিয়া গেল। হাতীগুলা চীৎকার করিতে করিতে পলাইবার যোগাড় করিল। আমার সৌভাগ্য যে, আমার নিজের হাতীটার দিকে কোন বাঘ আসে নাই এবং সে বেশ ধীর দৃঢ়ভাবেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার গুণে বেশ সুফল ফলিল। যে বাঘটা (সেটা বোধ হয় বাঘিনী) প্রথম হাতীকে আক্রমণ করিয়াছিল, আমি তাহাকে এক গুলিতে শেষ করিয়া দিলাম। তার পর অন্য দুইটার দিকে ফিরিলাম। সে দুটা বাচ্চা; কিন্তু বেশ বড়। তাহাদের তর্জ্জন-গর্জ্জনে হাতীরা পিছু হটিতেছিল। তিন চারিটি গুলিতে আমি তাহাদেরও নিপাত করিলাম।

তিনটা বাঘ মারিয়া আমি হাতীগুলাকে আগের মত সাজাইয়া লইলাম। তার পর প্রথম বাঘটার খোঁজে অগ্রসর হইলাম। বেশী দূর যাইতে হইল না। খানিক গিয়াই দেখিলাম, সে-ও মরিয়া পড়িয়া আছে! সুতরাং একদিনে অল্প সময়ের মধ্যেই পর পর চারিটা বাঘ বা একটি ব্যাঘ্র-পরিবারকে শমনসদনে পাঠাইলাম।

কয়েক বৎসর পরের কথা। আবার বাঘশিকারে বাহির হইয়াছি। এবারে বনে

নয়, কেবল ঘাসে ভরা একটা নির্জ্জন জমিতে। ঘাস সেখানে খুব বড় বড়। তাহার ভিতর বাঘ অনায়াসে বসিয়া থাকিতে পারে। এবার আমার বন্দুকধারী সঙ্গী ছিল। সঙ্গে পাঁচটা হাতী।

ঘাস মাড়াইয়া মাড়াইয়া খানিকটা যাইতেই, হঠাৎ আমাদের একটা হাতী চেঁচাইয়া উঠিল। বাঘ দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া যে হাতীটা চেঁচাইয়াছিল, তাহা নহে; সে বাঘের গন্ধ পাইয়াছিল। এদিক্-ওদিক্ চাহিতেই দেখিতে পাইলাম, একটা অর্দ্ধভুক্ত গরু পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং বাঘটা ইহা খাইতেছিল এবং কাছেই কোথাও লুকাইয়া আছে, বোধ হইল। আমরা চারিদিক্ ঘিরিয়া ফেলিয়া আনন্দে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলাম। গরুটা, সেখানে পড়িয়াছিল, সেখান হইতে প্রায় দুই শত হাত অগ্রসর হইবার পরও বাঘের কোন সন্ধান নাই। বড় ঝোপ্‌টার কাছে আমরা যখন আসিয়াছি, তখন হঠাৎ বাঘটা বাহির হইল। তার পর ঝোপের ভিতর দিয়া একবার সামনে ও একবার পিছনে অনবরত দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। তখনও কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। কেবল ঝোপ্‌টা নড়িতেছিল বলিয়াই, তাহার গতিবিধি বোঝা যাইতেছিল। তাহাকে তখন অবধি মারিবার কোন সুবিধা হয় নাই।

শেষকালে দেখা গেল, প্রায় কুড়ি হাত তফাতে, আমার পাশ দিয়া সে একটা নালার দিকে চলিয়াছে। আর যায় কোথায়! গুলি চালাইলাম। কোন আর্ত্তনাদ বা শব্দ নাই। কেবল মনে হইল, সে একটু ধীরে ধীরে যাইতেছে, যেন হামাগুড়ি দিতেছে। তখন দ্বিতীয়বার গুলি চালাইলাম। এবার আর বাঁচোয়া নাই। বাঘটা পড়িয়া মরিয়া গেল। মজা এই যে, সেবারেও তাহার মুখ দিয়া কোন রকম আর্ত্তনাদ বা গোঙানি শোনা গেল না।

বাঘশিকারে পর পর কয়েকবার কৃতকার্য্য হইয়া, উৎসাহের চোটে আমি সাবধানতার সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিলাম। তাহার ফলে শেষবার শিকারে গিয়া আমি বাঘের মুখে প্রাণ দিতে দিতে রক্ষা পাইয়াছি। সে অতি মারাত্মক ব্যাপার! একটা বেতবনে তাড়া দিয়া এ যাত্রা যে বাঘ পাইলাম, সেটা আকারে খুব বড় না হইলেও বিক্রমে যে অনেক বৃহদাকার ব্যাঘ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বকার সেই হাতীর উপরেই ছিলাম। আমার গুলি খাইয়া বাঘটাও মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শিকারী মাত্রেই যে সতর্কতা অবলম্বন করে, আমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া নিজের মৃত্যু নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছিলাম।

বাঘ পড়িবামাত্র হাতী হইতে নামিয়া আমি সেইদিকে ছুটিলাম। অনেকে নিষেধ করিল, কিন্তু আমি কাহারও কথা গ্রাহ্য করিলাম না। বাঘের নিকট গিয়া দেখিলাম,

তাহার দাবনায় গুলি লাগিয়াছে, ক্ষতস্থান দিয়া প্রবল বেগে রক্ত বাহির হইতেছে। আমি আমার গুলির ফলাফল পরীক্ষা করিতেছি, সহসা এ কি সর্ব্বনাশ! বাঘটা হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া আমার হাতে—কাঁধের কাছে এমন জোরে কামড় বসাইল যে, তাহার দাঁতে দাঁত ঠেকিয়া গেল। আমি যন্ত্রণায় প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময় বাঘ আমাকে মাটিতে ফেলিয়া, আমার হাত ছাড়িয়া উরু চিবাইতে আরম্ভ করিল। তার পর কি হইল, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নাই।

তিন চারি দিন পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া, আমার লোকজনের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা এই:—বাঘটা আমার পা ধরিয়া টানিতে টানিতে একটা নালার মধ্যে লইয়া যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া সকলে লাঠি, কুড়াল, বন্দুক প্রভৃতি লইয়া ছুটিয়া আসে এবং আমাকে রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। বাঘ এ সব অগ্রাহ্য করিয়া অবাধগতিতে আমাকে মুখে লইয়া ছুটিতে লাগিল।

নালার দুই ধারে ভীষণ জঙ্গল। আন্দাজ আধ মাইল দূরে, নালার পাশেই একদল কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছিল। লোকজনের কোলাহল এবং বন্দুকের শব্দ শুনিয়া তাহারা পূর্ব্বেই কতক বুঝিতে পারিয়াছিল, ব্যাপারটা কি! বাঘের মুখে আমাকে দেখিয়া সকলে হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল। এইরূপে দুই দিক্ হইতে তাড়া খাইয়া, বাঘটা আমাকে ফেলিয়া পলায়ন করে।

সে অবস্থায় আমাকে দেখিয়া কেহ মনে করিতেও পারে নাই যে, আমি জীবিত আছি। তথাপি পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা ডুলি তৈরি করিয়া সকলে আমাকে হাস্‌পাতালে লইয়া আসে। সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার বাবু সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন। শেষে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার মনে যেন একটু ভরসা হইল।

তাঁহারই চিকিৎসার গুণে, প্রায় আড়াই মাস পরে আমি হাস্‌পাতাল হইতে ছুটি পাইয়াছি। আজ যে এই গল্প লিখিতে পারিতেছি, এ তাঁহারই অনুগ্রহে।"

মানুষ-খেকোর শয়তানী

মানুষকে ভয় না করে পৃথিবীতে এমন জানোয়ার নাই। বাঘও মানুষকে ভয় করে। গরুর পালে বাঘ পড়িলে, অনেক রাখাল লাঠির চোটে তাহাকে তাড়ায়। একবার এক

বাঘ একটা বলদকে ধরে, কিন্তু আট নয় বছরের দুটি ছেলে তাহাকে এমনি তাড়া করিয়াছিল যে, তাহাকে শিকার ফেলিয়া পলাইতে হইল। বাঘ স্বভাবতঃই মানুষকে ভয় করে, কিন্তু কোন কারণে যদি এই ভয়টা একবার ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকে না। নয়াডুমকার একটা বাঘ প্রথম বৎসরে সাতাইশ জন, দ্বিতীয় বৎসরে চৌত্রিশ জন এবং তৃতীয় বৎসরে সাতচল্লিশ জন লোককে খাইয়া ফেলে। তার পর এই বাঘটা মারা পড়িলে, আর কোন উৎপাত হয় নাই। নাইনিতালে একটা বাঘ এক বৎসরে আশী জন লোক মারিয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে দেখা যায় যে, একটা বাঘিনী মধ্যপ্রদেশে তেরটি গ্রাম উজাড় করিয়াছিল, আড়াই শত বর্গ মাইলের চাষ-বাস বন্ধ করিয়াছিল। এই বাঘিনাটা মারা পড়িলে পর, আবার চাস বাস আরম্ভ হইয়াছে।

"চারিটা নয়, একটা বাঘেরই এই কাণ্ড, তাহা বেশ বুঝা গেল।"—৭৫ পৃষ্ঠা

মানুষ-খেকো বাঘেরা এমনি চালাক-চতুর হয় যে, তাহারা ফাঁদে পড়ে না। যেখানে একটু সাড়া পায়, সেখানে সহজে যায় না। অস্ত্রধারী মানুষকে আক্রমণ করে না, তাহাকে দেখিয়া পলায়। আমি একটা মানুষ-খেকো বাঘের কথা জানি, তাহাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও মারিতে পারা যায় নাই। উড়িষ্যায় নরসিংহপুর ও হিন্দোল নামে দুইটি করদরাজ্য পাশাপাশি আছে। এই দুই রাজ্যের মধ্যস্থলে গভীর অরণ্যময়

পর্ব্বতশ্রেণী আছে। এই সব বনে বাঘ, ভালুক ও বুনো হাতীর বাস। দুই রাজ্যেই এই, বনের ধারে কয়েকটি গ্রাম আছে। একবার নরসিংহপুরে এই সব গ্রামের একটিতে বাঘের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল। এক মাসের মধ্যে তিনজন লোক বাঘের হাতে মারা পড়িল। অমনি শিকারীরা বাঘ মারিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কেহ গ্রামের নিকটে বন্দুক লইয়া গাছে বসিয়া রহিল, কেহ বনে গাছতলায় একটা ছাগল বাঁধিয়া, তীর-ধনুক হাতে করিয়া গাছের উপর উঠিয়া বসিল। এইরূপ দুই তিন দিন তাহারা বাঘের প্রতীক্ষায় রহিল, বাঘ আর আসিল না। আবার পাঁচ ছয় দিন পরে খবর আসিল যে, নিকটে আর এক গ্রামে একটা মানুষকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। সে গ্রামের লোকেরাও তাহার পর দুই তিন দিন পর্য্যন্ত বাঘ মারিবার চেষ্টা করিল, বাঘ আর আসিল না। আট নয় দিন পর, পূর্ব্বের সেই গ্রামের একটা লোককে আবার বাঘে লইয়া গেল। আবার পাঁচ ছয় দিন বাঘ মারিবার চেষ্টা হইল, বাঘের দেখাও পাওয়া গেল না। এইরূপে মাঝে মাঝে এই দুই গ্রাম হইতে বাঘে মানুষ লইয়া যাইতে লাগিল। দুই মাস পরে সংবাদ আসিল যে, হিন্দোল রাজ্যে পাহাড়ের ধারে দুই গ্রামে ঐরূপ বাঘের উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বাঘকে মারা যাইতেছে না। সেখানেও এক গ্রাম হইতে একটা লোককে বাঘে লইয়া গেল, তার পর দশ পনর দিন আর কোন উৎপাত নাই। তার পর পাশের আর এক গ্রাম হইতে আর একটা লোক বাঘের হাতে মারা পড়িল। লোকে মনে করিল, প্রত্যেক গ্রামেই এক একটা বাঘ আসিয়া মানুষ লইয়া যায়। চারিটা মানুষ-খেকো বাঘ! এ ত কম কথা নয়! আবার লোকজন যখনই বাঘ মারিতে সচেষ্ট হয়, তখনই বাঘের আর সন্ধান মিলে না। প্রায় এক বৎসর ধরিয়া এইরূপ বাঘের উৎপাত চলিতে লাগিল। অবশেষে এই সকল গ্রামে মানুষ মরার একটা কেমন যা নিয়ম দেখা গেল। নরসিংহপুরের প্রথম গ্রামে যে দিন একটা মানুষ মারা পড়িল, তার তিন চারি দিন পরে, পাহাড়ের ওপারে হিন্দোল রাজ্যের প্রথম গ্রামে, একজন মানুষ বাঘের হাতে মারা পড়িল। তাহার তিন চারি দিন পরে, পাহাড়ের এধারে তিন ক্রোশ দূরে, নরসিংহপুর রাজ্যের দ্বিতীয় গ্রামে বাঘের হাতে মানুষ মরিল। তাহার তিন চারি দিন পরে, হিন্দোল রাজ্যের দ্বিতীয় গ্রামে বাঘের উৎপাত আরম্ভ হইল। এইরূপে নরসিংহপুরের গ্রামেতে যে দিন বাঘের দৌরাত্ম্য হয়, তাহার তিন চারি দিন পরে, হিন্দোলের গ্রামে বাঘের দৌরাত্ম্য হয়। আবার এক রাজ্যের এক গ্রাম হইতে যে দিন বাঘে মানুষ লইয়া যায়, তাহার সাত আট দিন পরে সেই রাজ্যের অপর গ্রাম হইতে বাঘের হাতে মানুষ মরার সংবাদ আসে। এইবার সব রহস্য বাহির হইয়া পড়িল। চারিটা বাঘ যে নয়, একটা বাঘেরই এই কাণ্ড, তাহা বেশ বুঝা গেল। তখন সকলেই বাঘের চালাকি বুঝিতে পারিল। গ্রামে মানুষ মরিলেই,

সেই গ্রামের লোকেরা তাহার পর দুই তিন দিন খুব সতর্ক থাকে ও বাঘ মারিবার নানা প্রকার চেষ্টা করে। তার পর বাঘ না আসিলে আবার অসাবধান হয়, বাঘ এটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সে এক গ্রাম ছাড়িয়া পাহাড়ের ওধারে অন্য গ্রামে যাইয়া মানুষ ধরিত, আবার পাহাড়ের এধারে আসিয়া আর এক গ্রাম হইতে মানুষ ধরিয়া খাইত। বাঘের এই চালাকি ধরা পড়িলে, নরসিংহপুরের এক গ্রামে যখন মানুষ মারা পড়িল, তখন বুঝা গেল, সেই রাজ্যের অপর গ্রামে সাত আট দিন পরে বাঘ আসিবে। এই গ্রামে অনেক শিকারী চারিদিকে বাঘের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। প্রথম দিনেই সন্ধ্যার সময়ে বাঘ মারা পড়িল। সেই অবধি এই চারি গ্রামেই এককালে বাঘের হাতে মানুষ মরা বন্ধ হইয়া গেল।

একজন ইংরেজ শিকারীর 'ভারতবর্ষে বাঘশিকার' নামে একখানা বই আছে। তাহা হইতে নিম্নের ঘটনাটি উদ্ধৃত হইল:—"হায়দরাবাদ ছাড়িয়া আমরা পদব্রজে দুই দিন মুলুকপুরের দিকে চলিলাম। 'বোটা সিঙ্গারাম' নামক এক গ্রামের কাছাকাছি আসিয়া একটি গাছতলায় বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় আমার একজন অনুচর আসিয়া খবর দিল যে, ক্রোশ দুই দূরে বোটা সিঙ্গারামের কাছেই একটা প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়াছে। মানুষ, গরু, ভেড়া ইত্যাদি মারিয়া সে একাকার করিতেছে। কালকেই এক বুড়ীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। বাঘটা যেন সাক্ষাৎ শয়তান! গ্রামের লোকে দল বাঁধিয়া প্রত্যহ তাহার খোঁজ করিতেছে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না! অথচ এদিক-ওদিক খোঁজ করিয়া যখন তাহারা গ্রামে ফিরিয়া আসে, তখনই শুনিতে পায়, সে অমুক লোকের, কি অমুক ছেলের ঘাড় ভাঙিয়াছে।

এই সংবাদ পাইবামাত্র আমি গ্রামে গিয়া, গ্রামের লোকদের কাছে খোঁজ লইলাম। যাহা শুনিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। লোকটা ঠিকই বলিয়াছে, বাঘটা যেন শয়তানের অবতার! আজ মাস ছয়েক ধরিয়া, গাঁয়ের বড় রাস্তার ধারে, একটা ঝোপে আস্তানা গাড়িয়া, সে নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করিতেছে। এই ছ'মাসের মধ্যেই সে গাঁয়ের চল্লিশজন লোককে হত্যা করিয়াছে। তন্মধ্যে ষোল জন 'রাণার' বা ডাক-হরকরা। রাণারদের ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই বাঘটার টনক নড়ে, অমনি যেখানে থাকুক, ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের ঘাড় ভাঙে। রাখালেরা গরু চরাইতে যায়, গরুগুলি অক্ষত দেহে ফিরিয়া আসে, কিন্তু রাখাল আর ফিরে না! সেটা একটা প্রকাণ্ড মানুষ-খেকো বাঘ। তাহাকে কিছুতেই খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। কারণ সে দু'রাত্রি এক জায়গায়

থাকে না। খুব সম্ভব, বড় রাস্তার ধারে ঝোপে-ঝাপে সে ঘুরিয়া বেড়ায়; তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই।

কিন্তু আমার এই বর্ণনা বিশ্বাস হইল না। যে বাঘ ছ'মাস ধরিয়া এই গ্রামের কাছাকাছি আছে, তাহার একটা পাকা আস্তানা নিশ্চয়ই আছে; সুতরাং আমি লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাঘের আস্তানা খুঁজিতে বাহির হইলাম। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা জঙ্গলে জঙ্গলে, জলাভূমি ও কাঁটাঝোপের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া একটা খুব ঘন বেতের ঝোপের নিকট উপস্থিত হইলাম; অমনি অদূরে কিসের যেন ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ ও হাড় চিবানর স্পষ্ট আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। বন্দুকটি দৃঢ় করিয়া ধরিয়া কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়া আমি সেই ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিলাম। খানিকটা যাইতেই দেখি, বেশ একটুখানি পরিষ্কার জায়গা, তাহার মধ্যে দুইটি শৃগাল একটা মানুষের মাংস লইয়া কামড়াকামড়ি করিতেছে। সেটা যে বাঘের আস্তানা, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলাম। ব্যাঘ্র মহাপ্রভু বাড়ী ছিলেন না, সুতরাং শৃগালেরা সুবিধা বুঝিয়া প্রচুর খাদ্যে ভাগ বসাইতেছে।

"বাঘটা ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছে।"—৭৮ পৃষ্ঠা

সমস্ত জায়গা ব্যাপিয়া মানুষের মুণ্ড আর নরকঙ্কাল। সেই স্থানেই ডেকশাটা বুড়ার মাথা দেখিতে পাইলাম। তা ছাড়া, চেঁড়া চুল, হাতের ও পায়ের গহনা ইত্যাদিও দেখা গেল। শেয়াল দুটাকে তাড়াইয়া রূপার গহনাগুলি সংগ্রহ করিলাম। গ্রামের লোকেরা সকলেই সেগুলিকে সেই বুড়ার গহনা বলিয়া চিনিতে পারিল। বুড়ার খানিকটা দেহ তখনও অভুক্ত ছিল। তাহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। এক জোড়া সোণার টেক্কা-ছবিও পাওয়া গেল। একটা বড় ছুরিও মিলিল, সেটি নিশ্চয়ই কোন ডাক-হরকরার।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং ফিরিয়া আসাই যুক্তিসঙ্গত মনে হইল। এতগুলি মানুষের গন্ধ পাইয়া বাঘটা যে শীঘ্রই তাহার আস্তানায় ফিরিয়া আসিবে, তাহা মনে হইল না। গ্রামে ফিরিয়া কি ভাবে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করা যায়, তাহার জন্য সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলাম। অনেকে অনেক রকম উপায় নির্দ্ধারণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোনটিই আমার পছন্দ হইল না। যেমন-তেমন বাজে বাঘ মারিতে এই সকল উপায় যথেষ্ট বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদিগকে

জানাইলাম, 'আমি একা সন্ধ্যার পর ডাক হরকরাদের মত ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে বড় রাস্তা দিয়া চলিতে থাকিব। তাহাদের উপর বাঘটার অসীম প্রীতি! সে নিশ্চয়ই ঘণ্টার আওয়াজ শুনিয়া লোভে লোভে আসিবে। সন্ধ্যার পর কোন গোলমাল থাকিবে না। মাইল খানিক দূর হইতে ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাইবে। তাহার পর বাঘের সহিত মুখোমুখি হইলে, যাহা করিবার করিব।' আমার প্রস্তাব শুনিয়া গ্রামের লোকেরা শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! এ যে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা! তাহারা কিছুতেই আমাকে যাইতে দিবে না; কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। কাহারও মানা শুনিলাম না।

পরদিন ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহির হইলাম। তখনও সূর্য্য অস্ত যায় নাই। অস্তগামী সূর্য্যের লোহিতাভা সমস্ত আকাশকে রাঙাইয়া দিয়াছিল। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। কিন্তু আমার ভিতরের উত্তেজনা এত প্রবল ছিল যে, আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। মনে হইল, হয় ত আমার জীবনের সমাপ্তি ঘটাইতে চলিয়াছি। হয় ত আজই আমার শেষ বিদায়ের দিন! ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে যখন বাঘের আস্তানার কাছাকাছি আসিলাম, তখন সেখানকার তেইশটি নরমুণ্ডের কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম! কে জানে, হয় ত কাল সেখানে চব্বিশটি মুণ্ড গড়াগড়ি যাইবে!

খুব সাবধানে চারিদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বন্দুক ঠিক করিয়া চলিতেছিলাম। একটা জলাশয়ের কাছাকাছি আসিয়া একটু দাঁড়াইয়াছি, অমনি মনে হইল, যেন, শুক্‌নো পাতার মর্‌মর্ শব্দ শুনিলাম। কান পাতিয়া রহিলাম, পাতার শব্দই বটে! পথের বাঁ-ধারে সরিয়া গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলিয়া স্পষ্ট দেখিলাম, কাশবনের পাতা নড়িতেছে। তাহার পরই একটা মৃদু ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ শোনা গেল। মনে হইল, যেন বাঘটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া শব্দ করিতেছে! ঝোপ্‌টা আমার নিকট হইতে আট দশ হাতের বেশী হইবে না। বুঝিলাম, বাঘটা লাফ মারিবার উদ্যোগ করিতেছে। আমি বিদ্যুৎগতিতে কয়েক পা পিছু হটিয়া, বন্দুক তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলাম! যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঠিক! পিছনে আসিয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটা ঠিক রাস্তার মাঝখানে লাফাইয়া পড়িল। পূর্ব্বে যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই জায়গা হইতে দুইহাত দূরেও হইবে না। আমি আর ইতস্ততঃ না করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম। সে তখন আর একটা লাফ দিবার জন্য তাক্ করিতেছিল। গুলির ধোঁয়া মিলাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাইলাম, বাঘটা ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে ও ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ভীষণ গর্জ্জন সুরু করিয়াছে। সেই আর্ত্তনাদ আজিও আমার কানে বাজিতেছে! গুলিটা ঠিক তাহার বুকে লাগিয়াছিল, তার পর আর এক গুলি করিতেই সব ঠাণ্ডা হইয়া গেল।"

পেটুক বাঘ

স্যাণ্ডারসন্ সাহেবের পুস্তকে একটা পেটুক বাঘের কথা আছে, সেটা একদিকে যেমন গরু খাবার যম, অন্য দিকে তেমনি নিরীহ 'ভাল মানুষ' গোছের ছিল। 'মর্‌লে' গ্রামের লোকেরা সবাই তাহাকে জানিত এবং তাহার নাম দিয়াছিল 'ডন্'। প্রকাণ্ড সণ্ডা বাঘ, যেমনি মোটা সোটা জোয়ান, তেমনি বুদ্ধিটাও ভোঁতা! ডন্ কোন দিন কোন মানুষের অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া কেহ জানে না। বাঘটা ছিল বিলক্ষণ পেটুক, আর খাইত শুধু গরু আর মহিষ! তাহাও আবার বেশ মোটা সোটা না হইলে তাহার পছন্দ হইত না। ঠিক নিয়মমত ক'দিন পর পর একটা করিয়া শিকার তাহার বাঁধা ছিল। সন্ধ্যাবেলা গরুর পাল লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময়, রাখালদের সাধ্য ছিল না যে, সবগুলি কে ডনের হাত হইতে বাঁচাইয়া আনে! একটা না একটা সে মারিবেই! মর্‌লে গ্রামের লোকেরা একবার খরগোষ ধরিবার জন্য জাল পাতিয়াছিল, তাহাতে হঠাৎ ডন্ আট্‌কা পড়িয়া যায়। জাল ছাড়াইয়া পলাইবার সময় একটা লোক সহসা, তাহার পথের সম্মুখে পড়িয়া গেল। এ অবস্থায় লোকটাকে একটা চড় না মারিয়া বেচারা ডন্ আর করে কি! লোকটা ঐ এক চড়েই ক'দিন পরে মারা গেল; কিন্তু তাহাতে ডনের একটুও দুর্নাম হইল না! সকলেই বলিল, "ডন্ কি আর ইচ্ছে ক'রে মানুষ মেরেছে? বেচারা ঘাব্‌ড়ে গিয়ে দৈবাৎ একটা ভুল ক'রে ফেলেছে।"

বিপদে আপদে ডন্ বহুকাল ধরিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া চলিয়াছে—যেন সে যাদুমন্ত্র জানে। তাই মর্‌লে গ্রামের লোকেরা বলিত, "ডন্ বনদেবতা 'কুম্‌বাপ্পার' প্রিয়পাত্র। কুম্‌বাপ্পা স্বয়ং তাকে রক্ষা করেন!" বাস্তবিক তাহারা বিশ্বাস করিত যে, ডন 'কুম্‌বাপ্পার' বাহন, তাহার পিঠে চড়িয়াই তিনি তাঁহার বনের জমিদারী দেখিয়া বেড়ান। ডন্‌কে মারিবার জন্য সাহেব যখন চেষ্টা করিতেন, তখন সকলেই বলিত, "আরে, ডন্ কি বন্দুকের গুলিতে মরে?" ক্রমে সাহেবের যেন একটা জেদ্ চড়িয়া গেল; যেমন করিয়াই হউক্, ওটাকে মারিতে হইবে।

সাহেব মাসের পর মাস কত চেষ্টা করিলেন, কত রকমের ফন্দী আঁটিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। সে কেবলই ফাঁকি দিয়া পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। সাহেব বনের মধ্যে গরু বাঁধিয়া রাখিয়া, কত রাত গাছের উপর মাচায় বসিয়া, বন্দুক হাতে পাহারা দিলেন, ডন্ হয় ত সে দিকেই আসিল না।

অথবা চোরের মত কখন যে আসিয়া, হঠাৎ মুহূর্ত্তের মধ্যে গরু লইয়া সরিয়া পড়িল, কিছুতেই তাহার কিনারা করা গেল না। এ রকম করিয়া কত গরু যে ডনের পেটে গেল, তাহার সংখ্যা নাই।

একবার ডন্ এক কাণ্ড করিয়াছিল। একটা দুষ্ট গাই প্রায়ই রাত্রে পলাইয়া গিয়া ধান টান খাইয়া ফেলিত। তখন রাখাল গরুটাকে আট্‌কাইবার জন্য একটা বুড়ো বলদের সঙ্গে জুড়িয়া দিল। তাহাতে কিন্তু গাইটা শুধ্‌রাইল না, বরং বলদটাই তাহার সঙ্গে মিশিয়া দুষ্ট হইয়া গেল। একদিন বিকালে দুইটাতে মিলিয়া এক অড়হর-ক্ষেতে গিয়া

"একটা গরু আগ্‌লিয়ে সে আরামে বিশ্রাম ক'রছে।"—৮১ পৃষ্ঠা

বেশ খাইতে লাগিয়াছে—এমন সময় ডন্ আসিয়া উপস্থিত। গাইটা বেশ মোটাসোটা ছিল, তাই ডন্ তখনই তাহাকে মারিয়া জলযোগ আরম্ভ করিল। বলদ বেচারা তখনো গাইয়ের সঙ্গে বাঁধা, দাঁড়াইয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সব দেখিতেছে, পলাইবার যো নাই! পরদিন সকালে দেখা গেল, অর্দ্ধেক খাওয়া গাইটা পড়িয়া আছে, আর বলদটা তখনো সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে!

অবশেষে ডনের দিন ফুরাইয়া আসিল। ১৮৭৪ সালে গ্রীষ্মের সময়ে ভয়ঙ্কর ঝড়-বৃষ্টি হয়। তাহার ফলে কত যে গরু, মহিষ ঠাণ্ডা লাগিয়া মারা পড়িয়াছিল,

তাহার সংখ্যা নাই। সে সময়ে একদল বেদে, মর্‌লে গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে অনেকগুলি গরু, মহিষ লইয়া, বনের মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছিল। কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টির পর তাহাদের দুরবস্থার একশেষ হইল। মানুষ, গরু, মহিষ সব জলে ভিজিয়া, ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হইয়া, অতি কষ্টে গ্রামের দিকে চলিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে ডন্ আসিয়া হাজির! এমন অবস্থায় মড়াও খাড়া হইয়া উঠে! গরু, মহিষ সবগুলিই তখন প্রাণপণে গ্রামের দিকে ছুটিল। ডন্ বেচারারও বোধ হয় কয়েকদিন খাবার-টাবার জোটে নাই; সে ডাইনে বাঁয়ে যেটাকে দেখে, তাহাকেই মারে! গ্রামে পৌঁছিবার মধ্যে চৌদ্দটি গরু, মহিষ মারিয়া তবে সে ক্ষান্ত হইল।

এখন আর ভাবনা কি! বেশ রীতিমত কিছুদিনের খোরাক যখন সংগ্রহ হইয়াছে, তখন ডন্ কি আর শীঘ্র অন্য কোথাও যায়? এদিকে বৃষ্টিতে জমি বেশ নরম হইয়া আছে, পায়ের দাগ লুকাইয়া চলিবার যো নাই। সাহেব ভাবিলেন, 'এমন সুযোগ আর পাইব না। এই সময়ে একবার লোকজন লইয়া চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক।'

ডন্ যেদিন গরু ও মহিষগুলিকে মারিয়াছিল, তাহার তিন দিন পরে সঙ্গে পাঁচটা হাতী আর প্রায় একশত লোক লইয়া সাহেব শিকারে যাত্রা করিলেন। ট্র্যাকার্‌রা পায়ের দাগ ধরিয়া সহজেই খুঁজিয়া বাহির করিল—ডন্ নদীর ধারে পাথরের বাঁধের উপরে একটা ঝোপের মধ্যে শুইয়া আছে। এই ঝোপে তিনটা গরু টানিয়া লইয়া, তাহাদেরই একটাকে আগ্‌লাইয়া লইয়া সে আরামে ও নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করিতেছে। নদীর ওপারে তিন চার হাত উঁচু একটা জায়গা ছিল। শিকারের পক্ষে জায়গাটি বেশ। নদী পার হইতে হইলে, বাঘটাকে ওখান দিয়াই যাইতে হইবে। নদীটা সেখানে ষাট হাত চওড়া—সামান্য হাঁটুজল। সাহেব নদীর ওপারে উঁচু জায়গায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এদিকে বাঘকে তাড়াইয়া নদীর দিকে আনিবার জন্য, জঙ্গল ভাঙা আরম্ভ হইল। জঙ্গলে নাড়া পড়িতেই ডন্ একটা ঝোপের আড়াল দিয়া সুড়্ সুড়্ করিয়া জলে নামিয়া আসিয়াছে, আর কান খাড়া করিয়া ওপারের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। যেমন খোলা জায়গায় আসিয়া দাঁড়ান, অমনি দড়াম্ করিয়া সাহেব গুলি করিয়াছেন। গুলি খাইয়াই 'ঘাউ' করিয়া এক ডাক দিয়াই বাঘটা আবার ফিরিয়া নদীর পাড়ে উঠিয়া দেখে, সম্মুখেই একটা হাতী; অমনি আবার আর এক ডাক দিয়া, সে এক দৌড়ে নদীর ওপারে একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সাহেব তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন, যাহাতে বাঘটা জঙ্গল পার হইয়া যাইতে না পারে। লোকজন আর হাতীগুলিও বাঘের পিছন পিছন নদী পার হইয়া আসিল। কিন্তু জঙ্গল ঘাঁটিয়া দেখা গেল যে, ডন্ আবার ফাঁকি দিয়াছে। সাহেব পৌঁছিবার আগেই সে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে।

তখন ভাবনা হইল, ডন্ হয় ত এবার অনেক দূরে না গিয়া আর থামিবে না। ইহার পর আশ্রয় লইবার মত বন প্রায় এক মাইল দূরে—একটা নালার কাছে। বাঁধ হইতে নালা পর্য্যন্ত শক্ত জমি, তাহাতে পায়ের দাগ পাওয়া কঠিন। কিন্তু সাহেবের তখন জিদ্ চড়িয়া গিয়াছে, তিনি শুধু ট্র্যাকারদেব লইয়াই অগ্রসর হইয়া চলিলেন। খানিক দূর গিয়াই বুঝিতে পারিলেন, ডন্ আবার নদীর দিকেই ফিরিয়া গিয়াছে। ডন্ ত আর জানিত না যে, ভোজনের পরই লোকের তাড়া খাইয়া, তাহাকে এই ভয়ানক গরমে প্রাণের জন্য ছুটিতে হইবে। তাই সে ভোজনটা করিয়াছিল, তাহার মত পেটুকেরই উপযুক্ত। প্রায় মণ খানেক মাংস পেটে লইয়া, বেচারা এই গরমে কি আর দৌড়িতে পারে! ফিরিয়া আসিয়া আবার নদীর ধারের সেই বনেই সে আশ্রয় লইতে গিয়াছে।

সাহেব নদীর পারেই একটা গাছে চড়িয়া বসিলেন। সঙ্গে একজন ট্র্যাকার। তার পর লোকেরা ঝোপ্‌টার কাছেই তাড়া দিতেই, ডন্ বাহির হইয়া ঠিক সেই গাছের নীচ দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া চলিল। গাছের নীচে আসিতেই আবার বন্দুকের দুই গুলি—একটা তাহার ঘাড়ের উপর আর একটা উরুতে আসিয়া লাগিল। গুলি খাইয়াই খানিকটা গড়াগড়ি দিয়া আবার সে একটা জঙ্গলে গিয়া ঢুকিল।

সেই জঙ্গলের কিনারায় খুব ঘন একটা ঝোপ্ ছিল। সাহেব মাহুতকে বলিলেন, "ঐ ঝোপের ভিতর দিয়ে হাতী চালিয়ে নাও।" আহত বাঘকে এরূপ ভাবে খোঁজা বড় নিরাপদ নয়; কিন্তু এখন আর অন্য উপায় ছিল না।

হাতী যখন ঝোপ্ হইতে প্রায় বিশ গজের মধ্যে গিয়াছে, তখন ভীষণ শব্দে গলা খাঁক্‌রাইয়া বাঘটা তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল। কিন্তু সাহেবের হাতী এক পা-ও নড়িল না দেখিয়া কেমন একটু ভড়্‌কাইয়া গিয়া আবার ফিরিয়া চলিল। তার পর তাহার যা রাগ আর গর্জ্জন! বাঘ একবার ভয় পাইলে আর অগ্রসর হয় না। ডন্‌ও এক লাফে একটা ঝরণা পার হইয়া আবার কোথায় লুকাইয়া পড়িল।

সাহেব তখন হাতী হইতে নাম্‌িয়া কাছেই একটা গাছে চড়িলেন। হাতীগুলা এদিকে ওদিকে ঝোপ্ ভাঙিতেছে, এমন সময় সাহেব দেখিলেন যে, তাঁহার পিছনেই আর একটা ঝোপের মধ্যে কি যেন নড়িয়া উঠিল। সাহেব তাড়াতাড়ি হাতী আনাইয়া তাহার পিঠে চড়িতে যাইবেন, এমন সময় ডন্ ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়াই অন্য হাতীগুলার মাঝখান দিয়া দে ছুট! একজন ট্র্যাকার মাটিতে ছিল—সে তাহার হাতের ডাণ্ডা ছুড়িয়া ডনের গায়ে মারিল। সাহেবও তাড়াতাড়ি আর এক গুলি লাগাইয়া দিলেন। গুলিটা বাঘের গায়ে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতেও সে থামিল না।

তার পর ঘণ্টা দুই বাঘটার সঙ্গে ছুটাছুটি চলিল। এ ঝোপ্ হইতে সে ঝোপ্, এমনি করিয়া ক্রমাগত পলাইয়া পলাইয়া, শেষে একটা উঁচু জায়গায় গিয়া ডন্ একটা ঘন কাঁটা-ঝোপে বসিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। ততক্ষণে দিনের আলো শেষ হইয়া আসিয়াছে। কাজেই আর ঝোপের ভিতরে হাতী লওয়া গেল না। কে জানে, বাঘ যদি ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে!

পর দিন আর একজন শিকারী—স্যাণ্ডারসন্ সাহেবের এক বন্ধু—হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত। দুইজনে ট্র্যাকারদের লইয়া আবার সেই ঝোপের কাছে গিয়া দেখেন, ডন্ সেখানে নাই। অনেক খুঁজিয়া দেখিলেন, খুব ঘন লম্বা লম্বা ঘাস আর কাঁটায় ভরা একটা জায়গায় ডন্ নিতান্ত কাহিল অবস্থায় পড়িয়া আছে। তখন হাতীর পিঠ হইতেই আর এক গুলি মারিতেই ডনের প্রাণ শেষ হইয়া গেল। ইহাতেও কিন্তু সাহেবকে কম নাকাল হইতে হয় নাই। তিনি তাড়াতাড়িতে তেমন ভাল করিয়া বন্দুকটা ধরিতে পারেন নাই, কাজেই শেষ গুলিটা ছাড়িবার সময় বন্দুকের ঘোড়া গেল সাহেবের নাকে বসিয়া! আর দেখিতে দেখিতে সাহেবের একেবারে রক্তারক্তি অবস্থা! হইবে না? 'কুম্‌বাপ্পার' বাহনকে মারা কি সহজ কথা!

ডন্‌কে মারিয়া সাহেবের মনেও একটু দুঃখ হইয়াছিল। অন্য লোকেদের ত কথাই নাই! তাহারা দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিল, 'আহা! বেচারি কোনদিন আমাদের কারো কোন অনিষ্ট করে নি!'

———

মহেশ সর্দ্দার

ঠেঙিয়ে বাঘ-মারা

বেশী দিনের কথা নয়, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে, কেহ সুন্দরবনে চাকুরী করিতে গেলে, লোকে তাঁহাকে বিস্ময়মিশ্রিত সম্মানের চক্ষে দেখিত। অসাধারণ শারীরিক বল ও সাহস না থাকিলে, কেহই সুন্দরবনে যাইতে রাজী হইত না। চতুর্দ্দিক্ জঙ্গলে পূর্ণ। জমীদারের কাছারি-বাড়ীও তেমন নিরাপদ স্থান নহে; কখন্ কাহাকে বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হয়, কে বলিতে পারে? দিবসে লোকজনের গোলযোগ এবং কাজকর্ম্মের ব্যস্ততা, কিন্তু রাত্রে প্রাণটা যেন হাতে লইয়া বসিয়া থাকিতে হইত! সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আহারাদি সারিয়া যে যাহার গৃহে আশ্রয় লইত; সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর ঘরের বাহির হয় কাহার সাধ্য! অন্ধকার একটু ঘনীভূত হইলেই, অমনি ঘন ঘন ভীষণ গর্জ্জন। সেই গর্জ্জন কখন দূরে, কখন নিকটে, কখনও বা কাছারি-বাড়ীর আঙিনায়। অতি সাহসী ব্যক্তিও ভয়ে জড় সড় হইয়া পড়িত।

সুন্দরবনের অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময়ে একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মহেশ সর্দ্দার নামে একজন প্রজা কাছারি-বাড়ীতে আসিয়াছে। নায়েব মহাশয়ের কাছে বিশেষ প্রয়োজন। জমির সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে, ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। নায়েব মহাশয় বলিলেন, "মহেশ, এ অন্ধকার রাত্রে তোমার আর বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। খাওয়া-দাওয়া ক'রে রাতটা এখানেই কাটিয়ে দাও।" মহেশ বলিল, "না নায়েব মশাই, বাড়ী যেতে হচ্ছে। আমি কাউকে কিছু বলে আসি নি, তারা ভয় পাবে।" নায়েব বলিলেন, "তবে এক কাজ করো, একটা লণ্ঠন আর ঐ একনলা বন্দুকটা সঙ্গে নাও। তোমার বাড়ী ত আর কাছে নয়, বিশেষ, পথে যে জঙ্গল! সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমাদের ওদিকে দিনের বেলা যেতেও ভয় হয়।" নায়েব মহাশয়ের কথা শুনিয়া মহেশ বলিল, "নায়েব মশাই, ইস্তনাগাদ এই সুঁদরবনেই আছি; ভয় কাকে বলে, তা জানি নে। আমি লণ্ঠনও চাইনে বন্দুকও চাইনে। আমার ছাটা (বাঘ-মারা লম্বা লাঠি) গাছটাই যথেষ্ট। কপালে মরণ থাক্‌লে কেউ বাঁচাতে পার্‌বে না।" নায়েব বলিলেন, "সে কথা সত্যি, বন্দুকই বলো আর যাই বলো, কপালটাই আদৎ। আচ্ছা, তবে এখন যাও—তোমার কথা আমার মনে রইল। দু'চার দিন পরে খবর নিও।"

কাছারি-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, মহেশ সর্দ্দার ভেড়ীর রাস্তা ধরিয়া চলিল। নদীর বাঁকে বাঁকে সেই রাস্তা ঘুরিয়াছে। বরাবর সেই রাস্তা ধরিয়া চলিলে, অনেকটা ঘুরিতে হয় সত্য, কিন্তু মহেশ হয় ত নিরাপদে বাড়ী পৌছিতে পারিত। দুঃখের বিষয়, কিছু দূর গিয়াই মহেশ ভেড়ীর রাস্তা ছাড়িয়া, শীঘ্র বাড়ী পৌছিবার জন্য একটা সংকীর্ণ বিপদসঙ্কুল রাস্তা ধরিল। নিজের শক্তিতে প্রবল বিশ্বাস এবং নির্ভর ভিন্ন রাত্রে সে রাস্তায় কেহ অগ্রসর হয় না। চারিদিক্ ঘন অন্ধকারময়। বীরহৃদয় মহেশ কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিতেছে। বাড়ী আর বেশী দূরে নহে, আর একটু অগ্রসর হইলেই সম্মুখে একটা সঙ্কীর্ণ নালা, তাহার পরেই মহেশের বাগান-বাড়ী।

"বাঘের সঙ্গে ভার মহেশের লাঠির উপর!"—৮৬ পৃষ্ঠা

এদিকে হইয়াছে কি, সন্ধ্যার পরেই এক বিশালকায় ব্যাঘ্র, মহেশদের বাগান-বাড়ীতে আসিয়া, সামান্য কতকগুলা ঘাসের জঙ্গল আশ্রয় করিয়া বসিয়াছিল। নালা পার হইয়া মহেশকে সেই স্থান দিয়াই বাড়ীতে ঢুকিতে হইত। বাঘ আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে, খাদ্যসামগ্রী তাহার সম্মুখেই হাজির হইত; কিন্তু তাহার আর দেরী সহিল না। নালার অপর পারে মহেশের পদশব্দ শুনিয়াই সে চক্ষের পলকে নালার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। ঠিক সেই সময় মহেশও নালার নিকটে আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছে। কি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত! সম্মুখে কয়েক হাত মাত্র দূরে প্রকাণ্ড বাঘ! তাহার চক্ষু দুইটি যেন জলন্ত অগ্নি! কিন্তু ইহাতেও মহেশের বীরহৃদয় টলিল না। সে তাহার দীর্ঘ ছাটা গাছ বাগাইয়া ধরিল। তার পর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, বাঘ যেমন গর্জ্জিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছে, অমনি তাহার মুখ লক্ষ্য করিয়া মহেশ তাহার ছাটার প্রবল একটা গুঁতা দিল। সেই গুঁতার চোটে ছাটা একেবারে বাঘের কণ্ঠনালীতে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। সে শত চেষ্টাতেও উহা উগ্‌রাইয়া ফেলিতে পারিল না! বেচারার পশ্চাতের দুই পা নালার এপারে, আর তাহার দেহের সমস্ত ভার মহেশের ছাটার উপরে! সেই ছাটার গোড়ার দিক দুই হাতে দৃঢ়রূপে ধরিয়া, মহেশ তাহা আপনার কোমরের উপর রক্ষা করিতে লাগিল।

বাঘের মুখের মধ্যে প্রকাণ্ড ছাটা! সে ভীষণ গর্জ্জন আর নাই! কেবল কাতর গোঙানি মাত্র! সেই গোঙানিতে আকৃষ্ট হইয়া, মহেশের ছোট ভাই রাখাল আর একগাছা ছাটা লইয়া, গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। তাহাকে বাঘের পশ্চাতে উপস্থিত দেখিয়া মহেশ বলিল, "রাখাল, একটু দেরী কর্, আমি ছাটাগাছ আগে কোমর থেকে ওঠাই, তার পর বেটার মাথা বরাবর বিরাশী সিক্কা ওজনের এক ঘা বসাবি।"

রাখাল তাহার দাদার উপযুক্ত ভাই। অল্পক্ষণ পরেই প্রকাণ্ড ছাটার ঘা খাইয়া, বাঘ নালার মধ্যে উপুড়্ হইয়া পড়িল। সাম্‌লাইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই, দুই ভাইয়ে মিলিয়া দুই দিক্ হইতে তাহার জীবন শেষ করিয়া দিল।

জাগিয়ে বাঘ মারা

আমার বাবা সুন্দরবনে কাজ করিতেন। মহেশ সর্দ্দারের সাহসের পরিচয় পাইয়া তিনি তাহাকে আপনার কাছারি-বাড়ীতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সেবার পূজার ছুটিতে বাবার সহিত আমি সুন্দরবন দেখিতে যাই। আমার বেশ মনে আছে, যেদিন আমরা কাছারিতে পৌঁছিলাম, সেদিন বড়ই দুর্য্যোগ ছিল। কেবল বাতাস আর বৃষ্টি। যাহা হউক, সমস্ত দিন বৃষ্টির পর রাত্রে আকাশ বেশ পরিষ্কার হইল। বাবা সর্দ্দারকে ডাকিয়া বলিলেন, "মহেশ, আমার ছেলে সুন্দরবন দেখ্‌তে এসেছে, আকাশ পরিষ্কার থাক্‌লে তুই কাল সকালে শিকারে যাবার সময় এ-কে সঙ্গে নিয়ে যাস্।"

পরদিন শিকারে বাহির হইব ভাবিয়া, আমার মনে খুবই আনন্দ হইতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকালে উঠিয়াই দেখি, ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। সমস্তদিন

বৃষ্টি হইয়া সন্ধ্যার পরে আকাশ আবার বেশ পরিষ্কার হইল। এইভাবে তিন চারিদিন ক্রমাগত বৃষ্টি ও বাতাস হইয়া একদিন অপরাহ্ণে সকল দুর্য্যোগ কাটিয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর, কয়েকজন প্রজা এবং বাবা ও আমি কাছারি-ঘরের আঙিনায় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছি, এমন সময়, জলা-মাঠের উপর দিয়া কেহ ছুটিয়া গেলে যেমন শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ খালের দিক হইতে আসিতে লাগিল। একটু পরেই কয়েকজন প্রজা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু! গতিক বড় ভাল নয়। যে রকম শব্দ শোনা যাচ্ছে, তাতে বাঘ আস্‌ছে বলে সন্দ হয়, আপনারা ঘরের ভিতর গিয়ে বসো।" বাবা বলিলেন, "বাঘ আস্‌ছে আসুক, তাতে এত ভয় কি? বাঘ ত আর কাছারি-বাড়ীর ভিতরে আস্‌বে না!" বাবার কথা শেষ হইতে না হইতেই কিন্তু কাছারি-বাড়ীর অতি নিকটে আমরা ভীষণ একটা গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। ভয়ে আমার আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। আমরা তাড়াতাড়ি সকলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

তখন বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। আমরা ঘরের ভিতর হইতে জানালা ফাঁক করিয়া বাঘের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই কাছারি-বাড়ীর কয়েকটা কুকুর ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে দূরে পলায়ন করিল।

বাঘটা নিশ্চয়ই কাছারি-বাড়ীতে ঢুকিয়াছে, তাহা না হইলে কুকুরগুলা পলাইবে কেন? এই ভাবিতে ভাবিতে আমরা জানালার ভিতর দিয়া এদিক সেদিক সন্ধান করিতেছি, এমন সময় কাছারি-ঘর এবং রান্নাঘরের মাঝের সংকীর্ণ পথ দিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিলাম। আমাদের নিকট হইতে চার পাঁচ হাত দূর দিয়া বাঘ নিরাপদে চলিয়া গেল দেখিয়া, আমার দুঃখের সীমা রহিল না। কিন্তু উপায় কি? কাছারি-বাড়ীর একমাত্র বন্দুক লইয়া তখন মহেশ সর্দ্দার কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, বাঘকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াও ঘরের দরজা খুলিতে আমাদের সাহস হইল না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, দরজা খুলিব মনে করিতেছি, এমন সময়, বাঘটা যে দিকে গিয়াছিল, হঠাৎ সেই দিক হইতে বন্দুকের আওয়াজ এবং পরমুহূর্ত্তেই বাঘের ভীষণ গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া গেল। বাঘের গর্জ্জন থামিতে না থামিতে, আরও একবার বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। ব্যাপারটা কি, দেখিবার জন্য আমরা দরজা খুলিয়া আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইলাম।

কিছুক্ষণ পরে মহেশ সর্দ্দার হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "বাবু, মস্ত একটা বাঘ মেরেছি। আমি হরিণ মারবার জন্যে একটা গাছের উপর লুকিয়ে ছিলাম।

ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা ক'রেও যখন হরিণের উদ্দেশ পাওয়া গেল না, তখন ফিরে আস্‌ব ভাব্‌ছি—এমন সময় দেখ্‌লাম, কাছারি-বাড়ীর কুকুরগুলো লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে। তাদের রকম-সকম দেখে, আমার কেমন যেন সন্দ হলো, তাই আরো কিছুক্ষণ গাছের উপরে থেকে চারদিক্ দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

আমাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'র্‌তে হলো না; একটু পরেই দেখি, কাছারি-বাড়ী থেকে বেরিয়ে বাঘটা ধীরে ধীরে ঠিক আমার গাছটার দিকেই আস্‌ছে। সে ক্রমে এগিয়ে এসে, একটা ছোট্ট ঝোপের ভিতর ঢুক্‌তে যাচ্ছে, এমন সময় আমি গুলি ক'র্‌লাম। প্রথম গুলি খেয়ে বাঘটা চীৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠেছিল, কিন্তু পরের গুলিতেই তার দফা রফা হ'য়ে গিয়েছে।"

মহেশ সর্দ্দারের কথা শুনিয়া আমি আনন্দে লাফাইয়া উঠিলাম। বাবা তখনই কয়েকজন লোক পাঠাইয়া বাঘটাকে কাছারি-বাড়ীতে আনাইলেন। আমি মাপিয়া দেখিলাম, বাঘটা ঠিক সাত হাত।

পরদিন সকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। বাবার আদেশমত মহেশ সর্দ্দার আমাকে লইয়া শিকারে বাহির হইল। আমরা কাছারি হইতে কিছুদূর গিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় একজন পাইক আসিয়া খবর দিল যে, কিছুদূরে একদল হরিণ চরিতেছে। হরিণের কথা শুনিয়া মহেশের উৎসাহ দেখে কে! সে আমাকে লইয়া তখনই তাহার সাথে সাথে চলিল।

আমরা একটা ঘন জঙ্গল পার হইয়া, প্রায় বিশ মিনিট পরে সম্মুখে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা এক মাঠ দেখিতে পাইলাম। উহার এক পাশে একটা ডোবা। ডোবার ধারে কতকগুলি হরিণ চরিতেছিল। আমরা ঝোপের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু বিশেষ চেষ্টাতেও তাহাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারিলাম না। ক্রমে একটা হরিণ বাদে আর সবগুলা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইল। সে-ও বোধ করি আমাদের সন্ধান পাইয়াছিল। বন্দুকের পাল্লা ততদূর পৌঁছিবে না বলিয়া, আমরা হরিণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলাম। হরিণও ক্রমে খালের দিকে যাইতে লাগিল। সেই দিকেই আকাট জঙ্গল। পূর্ব্বরাত্রে কাছারি-বাড়ীর কাছে যে বাঘ মারা হয়, সেটা সেই খালের দিক হইতেই আসিয়াছিল। হঠাৎ এই কথা মনে হওয়ায়, ভয়ে আমার বুক কাঁপিতে লাগিল। আমি পাইককে সঙ্গে লইয়া কাছারিতে ফিরিয়া আসিলাম।

তখন বেলা প্রায় এগারটা বাজিয়াছিল। আমি স্নান-আহার করিয়া একখানা গল্পের বই লইয়া শয়ন করিলাম এবং অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না,—বাবা আমার গা ঠেলিয়া বলিলেন, "ওঠ্, ওঠ্, ঐ ছাখ্ মহেশ কি মেরে এনেছে!" মহেশ ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া আমি লাফাইয়া উঠিলাম এবং বাহিরে আসিয়াই দেখিলাম, উঠানে প্রকাণ্ড একটা বাঘ পড়িয়া রহিয়াছে! আমি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে, মহেশের কাছে গিয়া সেই বাঘ শিকারের গল্প বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। বাবা বলিলেন, "এখন গল্প বল্‌বার সময় নয়, মহেশ নেয়ে খেয়ে আসুক, তার পর গল্প শুন্‌বি।"

আন্দাজ দুই ঘণ্টা পরে মহেশ ফিরিয়া আসিল। আমরা তিন চারি জনে তাহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। মহেশ আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "তুমি কাছারিতে ফিরে এলে পর, আমি হরিণ তাড়াতে তাড়াতে একেবারে খালের ধারে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম, কিন্তু সেখানে কোন্ ঝোপে যে সে লুকালো, কিছুই ঠিক ক'র্‌তে পার্‌লাম না। এদিকে বেলাও তখন অনেক হ'য়েছিল। আমি জঙ্গলের পথ ধরে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আস্‌তে লাগ্‌লাম। কিছুদূর এসেছি, এমন সময় যেন একটা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ আমার কানে গেল। শব্দ শুনে আমার সন্দ হ'ল, কি জানি হঠাৎ যদি বাঘের মুখে গিয়ে পড়ি। আমি আর এক পা-ও না এগিয়ে, গলা বাড়িয়ে এদিক সেদিক খোঁজ ক'র্‌ছি, এমন সময় দেখি কি না, একটা ঝোপের ভিতর থেকে ভন্ ভন্ ক'রে এক ঝাঁক মাছি উড়ে উঠ্‌ল। এই মাছি ওড়ার মানে কি, তা আমি জান্‌তাম। বাঘের মুখে পচা রক্ত-মাংসের দুর্গন্ধে অনেক সময় মাছি জড় হয়। বাঘ একটু নড়া-চড়া ক'র্‌লেই তারা উড়্‌তে থাকে।

আমি যা ভেবেছিলাম, তাই। একটু হেঁট হ'বামাত্র ঐ প্রকাণ্ড বাঘ আমার চোখে পড়্‌ল। বাঘটা তখন ঘুমুচ্ছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পর? বন্দুক তুলে দাঁ ক'রে লাগিয়ে দিলে বুঝি?"

"না বাপু, শিকারীর তা দস্তুর নয়। যত বড়ই শত্রু হোক না কেন, ঘুমন্ত অবস্থায় কাকেও মার্‌তে নেই। আগে তাকে জাগিয়ে তা'র প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ না দিলে, আমি যে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারতাম না।"

"তুমি ক্ষেপেছ না কি? বাঘকে কাদার মধ্যে পেয়ে এ ভাবে ছেড়ে দেওয়া আর সাধ ক'রে মরণ ডেকে আনা—একই কথা! এ ত পাগলের কাজ।"

"তা যাই বল বাপু, আমাদের সেকালের শিকারীদের মধ্যে এতটুকু মনুষ্যত্ব এখনো আছে।"

"যা হোক, তুমি কি কর্‌লে?"

"আমি বাঘের উপর চোখ রেখে খানিকদূর পিছিয়ে গেলাম। তার পর খুব

ছোট একটা সুঁতি খাল আর কয়েকটা ঝোপ্ বেড় দিয়ে, বাঘের কাছাকাছি এসে, খুব জোরে গলা খাঁক্‌রি দিলাম! বাঘ অমনি লাফিয়ে উঠ্‌ল। প্রথমটা তার যেন ধাঁধা লেগে গেল। শেষে মুখ বাড়িয়ে যেই সে আমার দিকে ফিরেছে, অমনি দড়াম্ ক'রে এক গুলি! গুলিটা ঠিক গলায় লেগেছিল, তাই ব্যাঘ্র মশাইকে বেশীক্ষণ ছট্‌ ফট্‌ ক'র্‌তে হয় নি।"

আমি কেবলমাত্র পনর দিন সুন্দরবনে ছিলাম। ইহার মধ্যে দুইটি প্রকাণ্ড বাঘ মারা পড়িল দেখিয়া, আমার আনন্দের সীমা রহিল না। দুই খানি বাঘের চামড়া লইয়া, পূজার ছুটির শেষে আমি আবার দেশে ফিরিয়া আসিলাম।

———

কুপিয়ে বাঘ মারা

বাবার কাছারি-বাড়ী হইতে দশ বার মাইল দূরে ক্ষুদ্র একটি পল্লী আছে। উহার লোক সংখ্যা দুই শতেরও কম। পল্লীবাসিগণ কয়েক শত বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষবাস দ্বারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া থাকে।

পল্লীর চারিদিকেই নিবিড় জঙ্গল। তাহাতে বাঘ, ভালুক, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর অভাব নাই। এই সকল দুর্দ্দান্ত প্রতিবেশীর সহিত বাস করিতে করিতে পল্লীর সকলেই ক্রমে নির্ভীক হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত দরকার হইলে, বাঘ ভালুকের সম্মুখীন হইতে ভয় পায় না।

বাঘের উপদ্রব সেখানে লাগিয়াই আছে। সেটা কিছু নূতন কথা নহে। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, অমুকের মহিষটা বাঘে লইয়া গিয়াছে, অমুকের বলদটাকে বাঘে মারিয়াছে, অমুকের ছাগল, ভেড়া খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এ সব ক্ষতি অধিবাসিগণের এক প্রকার 'গা সহা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি একটা মানুষখেকো বাঘ আসিয়া যে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বাঘটা দিন-দুপুরে লোকের ঘাড়ে পড়িয়া, পল্লীবাসীগণকে বিষম আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। আন্দাজ দেড় মাসের মধ্যে ছোটয় বড়য় তেরটি লোককে খাইয়াও তাহার তৃপ্তি হয় নাই। নূতন নূতন ফন্দী খাটাইয়া নিত্য নূতন আহার্য্য সংগ্রহ করিতে সে ব্যস্ত। তাহার মস্তকের জন্য জমিদার পঁচিশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। সরকার বাহাদুর হইতে প্রথম পঞ্চাশ, শেষে একশত টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করা হইল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। দলে দলে শিকারী ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। বাঘটা যেন সে রাজ্যের একছত্র

রাজা! কাহাকেও গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। থাকে থাকে,—হঠাৎ কোথায় সরিয়া পড়ে, লোকে একটু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে না ফেলিতে, আবার আসিয়া রাজকর আদায় করিতে থাকে। পল্লীবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া কত স্থানে-অস্থানে, কত ঝোপে-ঝাপে, কত নদী-নালায় সন্ধান করিল, শয়তান বাঘ কোথায় যে গা ঢাকা দিয়া থাকে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। এই ভাবে আরো কিছুদিন কাটিল। তার পর হঠাৎ

কুপিয়ে বাঘ মারা

একদিন বাঘটা পল্লীতে ঢুকিয়া আসন্নপ্রসবা একটি স্ত্রীলোককে লইয়া প্রস্থান করিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কৃষকেরা ক্ষেত হইতে সবেমাত্র ফিরিয়াছে, এমন সময় এই দারুণ দুর্ঘটনা। ব্যাপার শুনিয়া ভয়ে সকলে কম্পমান, শোকে তাহাদের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। রাগে চক্ষু দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল। লোকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলিয়া, ক্লান্তি-অবসাদ অগ্রাহ্য করিয়া অভাগিনীর

বাড়ীর পানে ছুটিল। পথে যাইতে যাইতে কেহ প্রতিজ্ঞা করিল, 'যদি সারা রাত্রি জাগিয়া বাঘের সন্ধান করিতে হয়, তাও স্বীকার, তথাপি এই অত্যাচারের প্রতিশোধ না লইয়া কোন মতেই ছাড়িব না।'

দেখিতে দেখিতে আট দশটা মশাল জ্বালিয়া, বন্দুক-বর্শা-কুড়াল প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া, গ্রামের অধিকাংশ যুবাপুরুষ দলে দলে বাঘের অনুসন্ধানে বাহির হইল। উপস্থিত বিপদ্‌টাকে নিজের বিপদ্ জ্ঞান করিয়া, সকলেই একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি বা শারীরিক দুঃখ-কষ্ট তাহারা গ্রাহ্যই করিল না। বাঘকে বাহির করিতেই হইবে, তা প্রাণ যায় আর থাকে!

উৎসাহের অভাব নাই, অনুসন্ধানের কোন ত্রুটি হইল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় ফল হইল না মোটেই। দিনের বেলা যে বাঘকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, রাত্রে সে বাঘের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব! তথাপি কেহ ভগ্নোৎসাহ হইল না। সকালে আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, এই স্থির করিয়া রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় তাহারা জঙ্গল হইতে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন সকাল হইতে না হইতে নিকটবর্ত্তী পাঁচ সাতটি কাছারি-বাড়ী হইতে দশ বার জন শিকারী আসিয়া সেই দলে যোগ দিল। তাহাদের মধ্যে আমাদের পরিচিত মহেশ সর্দ্দার একজন প্রধান। মহেশ আসিয়াই অনুসন্ধানের পদ্ধতি একেবারে বদ্‌লাইয়া ফেলিল; তাহার পরামর্শ অনুসারে সকলে একসঙ্গে দলবদ্ধ না হইয়া—ছোট ছোটদল করিয়া, এক এক দল এক এক দিকে অগ্রসর হইল। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র, প্রত্যেকেই প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছে, সুতরাং তাহারা কোন দুর্গম স্থানই খোঁজ করিতে বাকি রাখিল না। অবশেষে মহেশের দল একটা নালা পার হইতেছে, এমন সময় অগ্রবর্ত্তী লোকটি দেখিল, সম্মুখে একটি গহ্বরের মুখের কাছে স্ত্রীলোকটির কাপড়ের ছেঁড়া টুক্‌রা পড়িয়া আছে। দেখিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মহেশকে ডাকিয়া তাহা দেখাইল। ততক্ষণে আরও পাঁচ সাত জন লোক সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। সকলে মিলিয়া খোঁজ করিতে করিতে, স্ত্রীলোকটির দেহের কোন কোন অংশও দেখিতে পাইল। গর্ভস্থ শিশুটি সেই সকল ছিন্নভিন্ন মাংস খণ্ডের মধ্যেই পড়িয়াছিল! তাহার গায়ে একটি আঁচড়ের দাগও নাই। বোধ হয়, সেই সুকুমার অঙ্গে দন্ত প্রবেশ করাইতে, বাঘের প্রাণেও করুণার উদ্রেক হইয়া থাকিবে! এরূপ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া কেহ অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

মহেশ ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিল। বাঘ যে সেখানে কোথাও গুঁড়ি মারিয়া লুকাইয়া আছে, সে বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। আবার নূতন উদ্যমে

সন্ধান আরম্ভ হইল। মহেশের দল কয়েক পা অগ্রসর হইয়া আর একটি গহ্বর খুঁজিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে দলের এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখে, বাঘে মানুষে ভয়ঙ্কর কুস্তী আরম্ভ হইয়াছে। লোকটি ছিল বেজায় বলবান্—যণ্ডা গুণ্ডা কিন্তু বাঘের সহিত কুস্তী করা তো সহজ কথা নয়! মহেশ দেখিল, বাঘটা তাহার বুকের উপরে লাফাইয়া উঠিয়া, মুখ ও মাথা ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। বেচারার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত। লোকটি কিন্তু একেবারে হাল ছাড়িয়া দেয় নাই। যথাসাধ্য বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

মহেশ মুহূর্ত্ত কালের জন্য বাহ্যজ্ঞান হারাল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই প্রকৃতিস্থ হইয়া একখানা প্রকাণ্ড কুঠার লইয়া ছুটিল। এক্ষেত্রে গুলি চালাইতে তাহার সাহস হইল না। কি জানি, হঠাৎ যদি লোকটিকে মারিয়া বসে।

মহেশ যে এ ভাবে পশ্চাত হইতে তাহাকে আক্রমণ করিবে, বাঘ ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কুড়ুলের দুই চারি ঘা পিছনের পায়ে ও পিঠে পড়িতে না পড়িতে বাঘ বুঝিল, এবার সে যমের হাতে পড়িয়াছে। লোকটিকে ছাড়িয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং দাঁত মুখ খিঁচাইয়া মহেশের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল, কিন্তু তাহার ঐ উদ্যোগই সার! নির্ভীক মহেশ চকিতে একটু হটিয়া গিয়া, ভীমবলে বাঘকে আক্রমণ করিল এবং কোপের পর কোপ বসাইয়া বাঘের মস্তক প্রায় দেহচ্যুত করিয়া ফেলিল। ব্যাপার দেখিয়া উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত।

স্ত্রীলোকটির এবং তাহার গর্ভস্থ শিশুর অপঘাত মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হইল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আহত লোকটিকে বাঁচাইতে পারা গেল না।

প্রস্তাবিত পুরস্কার—১০০ টাকা—যথা সময়ে মহেশের হাতে পৌঁছাইয়াছিল। কিন্তু সে যাহা করিয়াছে, তাহার মূলে অর্থলাভ-প্রত্যাশা একেবারে ছিল না। পত্নীহারা শ্যামার এবং মাতৃহারা পল্টুর মধ্যে টাকাগুলি সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিয়া সে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিল, তাহার তুলনা নাই। মহেশ দুই হাত তুলিয়া ভগবানকে প্রণাম করিল।

ভোঁদাদার বাঘশিকার

গাছের উপরে মাচা বাঁধিয়া বাঘশিকার করিবার প্রথা, ভারতবর্ষের নানা স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না ইহাতে বিপদের আশঙ্কা খুবই কম। আমি কিন্তু একজন শিকারীর কথা জানি, তিনি মাচায় বসিয়া শিকার করেন না। শুধু তাহাই নহে, আবার বন্দুকের বদলে পিস্তল দিয়া বাঘ মারিয়া থাকেন। তাঁহার মত এরূপ অসমসাহসী এবং নিপুণ শিকারীর কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। তিনি বড় লোক—একজন রাজা। তাঁহার নিজের বন আছে। শিকারের সময় তাঁহার ভাইপো সঙ্গে থাকেন। ভাইপোর হাতে 'ইলেক্‌ট্রিক্ টর্চ্ লাইট্' থাকে। খাদ্যের লোভে বাঘ নিকটে আসিলে, তিনি টর্চের আলো তাহার উপরে ফেলেন আর শিকারী তখনই গুলি করেন। এই ভাইপোটিও না কি তাঁহারই মত ওস্তাদ্ শিকারী হইয়া উঠিতেছেন।

একবার রাজার এক মাতব্বর প্রজা আসিয়া বলিল, "মহারাজ! আমার পালের গোদা মোষটাকে কাল রাত্রে বাঘে নিয়ে গেছে। মোষটা খুঁজে পেয়েছি, অমুখ বনের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় রেখে দিয়েছে। জায়গাটা ছোট্ট; চারিদিকে খুব ঘন বন, কিন্তু কাছে এমন কোন গাছ নেই, যাতে মাচা বাঁধা যায়।"

মাচা বাঁধিবার মত গাছ না থাকিলেই বা ক্ষতি কি! রাজা ত আর মাচায় বসিয়া বাঘশিকার করেন না! সেই প্রজাটি ছিল নিজেও বেশ ভাল শিকারী। রাজা বলিলেন, "এক কাজ করো, সেই খোলা জায়গার একধারে, মাটিতে ডালপালা দিয়ে একটা ঝোপের মত তৈরি করো। একটু হিসাব ক'রে দেখো, যে দিক থেকে বাঘটার শিকারের কাছে আসবার সম্ভাবনা, তার উল্টা দিকে ঝোপ্‌টা হওয়া চাই।"

খাওয়া দাওয়ার পর, রাত্রি প্রায় আট্‌টার সময়, রাজাবাহাদুর তাঁহার ভাইপোকে সঙ্গে লইয়া রওনা হইলেন। বলা বাহুল্য, ভাইপোর হাতে টর্চ্ লাইটও ছিল। বনে গিয়া দেখিলেন, খোলা জায়গার ঠিক মাঝখানে সেই মহিষটা পড়িয়া আছে। খুড়ো ভাইপো ঝোপের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উভয়ের দৃষ্টি মহিষের দিকে। ক্রমে রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল, তবুও বাঘের দেখা নেই। ঝোপটার ভিতর বাহির একেবারে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! কিন্তু খোলা জায়গাটিতে মহিষের উপর বেশ চাঁদের আলো পড়িয়াছে। হঠাৎ রাজা মহাশয়ের গায়ে গরম নিশ্বাস লাগিল! ডান দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখিলেন, বিশাল বাঘ তাহার পানে তাকাইয়া আছে; উভয়ের মধ্যে অল্পই ব্যবধান! কি সাংঘাতিক ব্যপার! মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজার মাথার চুল খাড়া

হইয়া উঠিল! একটু ভয়ও পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঘের চক্ষু হইতে তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইলেন না; কাঠের পুতুলের মত একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন! বাঘের পেটে দারুণ ক্ষুধা, মন তখন তাহার খাদ্যের দিকে এবং সেইটাই হইল রাজার পক্ষে নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। ক্ষণকাল তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বাঘটা মহিষের দিকে অগ্রসর হইল।

অসমসাহসী রাজা, জীবনে কখনও ভয় পান নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন বাঘটা সম্মুখের দিক্ হইতে মহিষের কাছে আসিবে, তাই সেই দিকেই তাকাইয়াছিলেন। পিছন দিক্ হইতে যে বাঘ আসিবে, সেটা মনেও করিতে পারেন নাই। সুতরাং হঠাৎ এত কাছে বাঘটাকে দেখিয়া, রাজা যে ভয় পাইবেন ইহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি!

বাঘ ধীরে ধীরে গিয়া শিকারের পাশে বসিল ও চারিদিকে খানিক তাকাইয়া নিশ্চিন্ত মনে খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আর এক মুস্কিল উপস্থিত! বাঘ রাজার দিকে পিছন করিয়া খাইতেছে, এরূপ অবস্থায় তাহাকে গুলি করা চলে না। এক গুলিতে বাঘকে মারা চাই, সুতরাং সেই রকম মারাত্মক স্থানে গুলি করিতে হইবে। রাজাবাহাদুর অপেক্ষা করিলেন, বাঘ কিছুতেই ফিরিল না। কি উপায়!

সহসা তাহার মাথায় একটা খেয়াল জাগিল; তিনি ভাইপোর গা বাঁ হাত দিয়া টিপিলেন। শিক্ষিত ভাইপো তখনই টর্চ্ লাইটের ঝলক্ বাঘের উপরে ফেললেন! ফেলিবামাত্র, বাঘটা দারুন 'ঘোঁৎ' শব্দ করিয়া, লাফাইয়া আলোর দিকে ফিরিল! সেই মুহূর্ত্তে রাজা বাঘের বুকে গুলি চালাইলেন, আর সেই এক গুলিতেই সব শেষ।

বাঘশিকারের আর একটি গল্প বলিতেছি। এ গল্পেও খুড়ো ভাইপোর ব্যাপার। তফাৎ এই,—এ গল্পের ভাইপোটি শিকারে নিতান্ত আনাড়ি। তবু তাঁহার শিকারের সখ্ খুবই আছে এবং নিজে শিকারী বলিয়া একটু জাঁকও করিয়া থাকেন। এই অহঙ্কারের দরুণ শিক্ষাও পাইয়াছিলেন রীতিমত।

একজন বাঙালী ভদ্রলোক সরকারী 'রিজার্ভ ফরেষ্টে' কাজ করিতেন। বেশ বড় কাজ, একটা বিস্তৃত বনের সম্পূর্ণ ভারই ছিল তাঁহার উপরে। স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর এবং সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও খুব সুন্দর। খুড়া নিজে খুব বড় শিকারী, আবার রিজার্ভ ফরেষ্টের কর্ত্তা। এই কারণে ভাইপো ছুটি পাইলেই কাকার নিকটে যাইবার প্রলোভন ছাড়িতে পরিতেন না।

একবার কলেজের ছুটি হইয়াছে, ভাইপো কলিকাতা হইতে কাকার নিকট গিয়াছেন। কাকা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। বন পরিদর্শনে দুই দিনের জন্য বাহির

হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে ভাইপোর ভালই হইল—কাকার অনুপস্থিতিতে কেহ আসিয়া যদি বাঘের সংবাদ দেয়, তবে তাঁহার বন্দুক লইয়া নিজেই শিকার করিতে যাইবেন। কাকা উপস্থিত থাকিতে, বাঘশিকারে কোনও দিন তাঁহাকে যাইতে দিতেন না।

সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে, যাহাই হউক—পরদিন সকাল বেলাই বাঘের সংবাদ লইয়া, এক বৃদ্ধ সাঁওতাল মাঝি আসিয়া উপস্থিত! মাঝি বৃদ্ধ হইলেও, তখনও তাহার বলিষ্ঠ দেহ প্রায় ছয় ফুট উঁচু। এই বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া যুবকের কাকা চিরকাল বাঘ শিকারে গিয়া থাকেন। যুবকও বৃদ্ধকে চিনিতেন।

যুবককে সেলাম করিয়া মাঝি জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব কোথায়?" যুবক বলিলেন, "কাকা বন দেখ্‌তে বেরিয়েছেন, কাল আস্‌বেন, কেন?"

মাঝি বলিল, "মস্ত বড় বাঘ! খানিক দূরেই বনের মধ্যে খোলা যায়গায় একটা মোষ মেরে নিয়ে ফেলেছে—রাত্রে খেতে আস্‌বে। তা, সাহেব যখন বাড়ী নেই, তখন আর কি হবে!"

যুবক উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন, আমি ত আছি, আমিই বাঘ মার্‌ব। তুমি গিয়ে ওখানে মাচা টাচা বেঁধে সব ঠিক করে রাখো।"

মাঝি বলিল, "উহুঁঃ, তোর কাজ নয় বাবু। ভারি বাঘ! তুই পারবি না।"

যুবক রাগিয়া গিয়া অনেক বক্তৃতা করিলেন। অগত্যা মাঝি বলিল, "আচ্ছা তবে বাবু, তুই তৈরী হ'য়ে থাকিস্, আমি গিয়ে মাচা বেঁধে রাখ্‌ছি, রাত ঠিক আট্‌টার সময় আমি আসব।"

যুবকের উৎসাহ দেখে কে! কাকার সকলের চেয়ে ভাল বন্দুকটি ঠিকঠাক করিয়া রাখিলেন, গুলিটুলিও সব দোখয়া লইলেন। দিনটা যেন আর শেষই হয় না।

সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া যুবক প্রস্তুত। কাকার হাতী ছিল, মাহুতকে ঠিক করিয়া রাখিতে বলিলেন। প্রায় রাত্রি আটটার সময় মাঝি আসিয়া উপস্থিত। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল, যুবক মাঝির সঙ্গে তখনই হাতীতে চড়িয়া রওনা হইলেন। যথাস্থানে পৌঁছিয়া, মাঝি ও যুবক মাচায় চড়িলে পর, হাতী লইয়া মাহুত ফিরিয়া আসিল।

বৃদ্ধ মাঝি, শিকারের অনেক সন্ধান জানে, যুবককে নানা রকম উপদেশ দিয়া রাখিল। বলিল, "টু শব্দটি করিস্ না, বন্দুকের ঘোড়াটা আগে থেকে তুলে রাখ্‌বি; বাঘ এলেই গুলি মারিস্ না, বাবু, আমি তোর গা টিপ্‌লে পরে গুলি ক'রবি।

রাত্রি প্রায় আড়াইটার পর বাঘ আসিয়া উপস্থিত। বাপ্‌ রে বাপ্‌! সেটা

তা বাঘ নয়, যেন একটা ঘোড়া—এত বড় বাঘ! মাঝি যুবকের কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া আবার বলিল, "সাবধান! আমি তোর গা না টিপ্‌লে গুলি ক'রবি না কিন্তু।"

বাঘটা আসিয়াছিল সম্মুখের দিক্ হইতে। আসিয়া, চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া, বসিল,—ঠিক মাচাটিকে সমুখে করিয়া। হয়ত বা একটু সন্দেহ হবার দরুণ, যেই বাঘটা মাচার দিকে বুক টান করিয়া চাহিয়াছে, অমনি মাঝি যুবকের গা টিপিল। একবার, দুইবার, তিনবার গা টিপিলে পরও যুবক বন্দুক ছুড়িলেন না! তখন মাঝি দেখিল, তাঁহার শরীর কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে! বাঘের চেহারা দেখিয়াই ভয়ে যুবকের দাঁতকপাটি লাগিয়াছে, গুলি মারিবে কে!

যুবকের বাঘশিকার এই ভাবেই শেষ হইল। মাঝি তাঁহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া অনেক কষ্টে সুস্থ করিল। ততক্ষণে, গোলমালে বাঘ চম্পট দিয়াছে। তখন যুবক মাঝির কাছে যা বকুনি খাইলেন, জীবনে তেমন বকুনি আর কখনো খান নাই। যুবকের মুখে আর কথাটি নাই! তিনি মাথা নীচু করিয়া মাচায় বসিয়া রহিলেন।

"বাঘ দেখিয়াই ভয়ে যুবকের দাঁতকপাটি লাগিয়াছে।"

বাঘ দেখিয়াই ভয়ে যুবকের দাঁতকপাটি লাগিয়াছিল, এটা কিছুই বিচিত্র নহে। আমি একজন প্রসিদ্ধ শিকারীর কথা জানি, এক হাজারিবাগ অঞ্চলেই তিনি শতাধিক ডোরাদার বড় বাঘ মারিয়াছেন। তাঁহার বীরত্বের কাহিনী শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এমন যে নির্ভীক পুরুষ, তিনিও একবার আসামে শিকার করিতে গিয়া একটা বাঘের গর্জ্জনে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়েন যে, দুই তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙে নাই। মস্তিষ্কের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে প্রায় পাঁচ বৎসর লাগিয়াছিল। ভদ্র লোকটির নিজের মুখে তাঁহার এই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াছি।

আর একটা ঘটনা মনে হইতেছে। সৈন্যবিভাগের দুইজন বড় কর্ম্মচারী একবার মধ্যপ্রদেশের এক জঙ্গলে বাঘশিকার করিতে গিয়াছিলেন। বনতাড়ুয়াগণের চেষ্টায়

একটা বাঘ তাঁহাদের দিকে আসে, কিন্তু তাহার বিশাল আকৃতি দেখিয়া তাঁহারা ভয়েই আড়ষ্ট! একজন একেবারে মূর্চ্ছাপন্ন, আর একজন ক্ষীণস্বরে সর্দ্দারকে বলিলেন, "এত্তা বড়া শের কাহে ভেজা?" এই ঘটনা মনগড়া গল্প নহে, সত্য কথা।

ফাঁদ পাতিয়া বাঘ ধরা

বন্দুক দিয়া শিকার করার চাইতে ফাঁদ পাতিয়া জীবন্ত পশু ধরায়, অনেকখানি চেষ্টা, যত্ন এবং পরিশ্রমের দরকার। ইহাতে অনেক সময় প্রাণ যাইবার আশঙ্কাও নিতান্ত কম থাকে না।

চার্লস্ মেয়ার নামক একজন প্রসিদ্ধ শিকারী, মালয় উপদ্বীপের গভীর বনে ফাঁদ পাতিয়া, অনেক হাতী, বাঘ, অজগর প্রভৃতি ধরিয়াছেন। মালয়ের বহুস্থানে ছোট ছোট পাহাড়, নদী ও ঘন জঙ্গল আছে। একবার মিঃ মেয়ার অনেক লোকজন লইয়া, নদী-পথে পাঁচ দিন চলিবার পর, এক পার্ব্বত্য স্থানে উপস্থিত হন। মালয়-বাসীরা এই পর্ব্বতকে 'ভূতের পাহাড়' বলে। এই পর্ব্বত পার হইয়া অন্য দিকে কেহই যায় না। তাহাদের বিশ্বাস, যদি কেহ এই পর্ব্বত পার হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিবে—কিংবা সে নিজেই বাঘ হইয়া যাইবে!

পার্ব্বত্য শিকারীদের সাহায্য না পাইলে, আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব; অথচ স্থানীয় লোকে ভয়ে ভূতের পাহাড়ের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করে না—ঐ পাহাড়ের নাম করিলেও নাকি বিপদ্ হয়! এরূপ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি? মেয়ার সাহেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, একটা ফন্দী বাহির করিলেন। সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া বলিলেন, "ভূতের মন্ত্র আমার ভাল রকমই জানা আছে। ভূত-প্রেতের হাতে আমার কিংবা আমার দলের কারো কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।" এই কথায় অনেকটা ভরসা পাইয়া এবং পুরস্কারের আশায় তাহারা তাঁহার সঙ্গে যাইতে রাজি হইল।

এখানকার বনে 'ডুরিয়ান্' নামে এক প্রকার গাছ আছে। তাহার ফল পাকিলে, গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, নানা জাতীয় পশু পক্ষী উহা খাইতে আসে। যে সকল শিকারী ফাঁদ পাতিয়া শিকার করেন, তাঁহারা এই সময়ে এখানে ওখানে নানা রকম ফাঁদ পাতিয়া রাখেন। ফল খাইতে আসিয়া জীবজন্তু ফাঁদে আট্‌কা পড়ে।

মেয়ার সাহেবের দল ক্রমে ভূতের পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

চারিদিকে গভীর বন, দিনের বেলাতেও অন্ধকার! এই পথে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ সাহস করিয়া অগ্রসর হয় নাই। প্রায় তিন ঘণ্টা চলিবার পর, হঠাৎ তাঁহারা একটা খোলা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থানটি বালুকাময়। মেয়ার এই বালুতে পা দিতে যাইবেন এমন সময় তাঁহার সঙ্গী গ্রামের সর্দ্দার, তাঁহার হাত ধরিয়া পিছনের দিকে টান মারিয়া বলিল, "সাবধান! পা দেবেন না—চোরা-বালি।"

সর্দ্দারের নিষেধ সত্ত্বেও, মেয়র সাহেব সকলের সহিত আরও কিছুদূর গিয়া, একটা সমতল জমিতে তাঁবু ফেলিলেন। তাঁবুর নিকটে ছোট একটি নদী ছিল। দেখা গেল, কয়েকটা বড় বড় কুমীর নদীর জলে নিশ্চলভাবে হাঁ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিলে, জিহ্বার উপর পুরু হইয়া মশা বসে। তখন মুখ বন্ধ করিয়া মশাগুলাকে গিলিয়া ফেলে, তার পরে আবার হাঁ করিয়া থাকে। সমস্ত রাত্রি লোকজনেরা মশার কামড়ে জ্বালাতনের একশেষ হইয়াছিল। কিন্তু মেয়ার সাহেবের সঙ্গে মশারি ছিল, তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয় নাই।

পরদিন সর্দ্দার বলিল, সে জঙ্গলের পথে হাতী, বাঘ, গণ্ডার প্রভৃতির পায়ের দাগ দেখিয়াছে। কিন্তু ভূতের পাহাড়ে আজ পর্য্যন্ত কেহই যাইতে সাহস করে নাই সে-ও যাইতে পারিবে না। কাজেই সে যাত্রায় সাহেবের দল পাহাড়ের তলা পর্য্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিল। বড় বড় শিকার ধরা আর হইল না।

সপ্তাহ খানেক বিশ্রামের পর, ফাঁদ পাতিবার সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করিয়া, মেয়ার সাহেব আবার সদলবলে সেই পাহাড়ের দিকে যাত্রা করিলেন। এবার পথ পরিচিত, সুতরাং পূর্ব্ব বারের মত কষ্ট হইল না। সাহেব কয়েকজন বুদ্ধিমান ও সাহসী লোক সংগ্রহ করিয়া, ফাঁদ প্রস্তুত করিবার কৌশল শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

বাঘ ধরিবার ফাঁদ কতকটা বড় আকারের ইঁদুর ধরিবার বাক্স-কলের মত। একটা লম্বা চারকোণা জায়গার তিন দিকে, শক্ত শক্ত উঁচু খোঁটা পুতিয়া ঘিরিয়া, তাহার উপরে মজবুত করিয়া চাল ছাইয়া দিলেই, ফাঁদের কাঠামো প্রস্তুত হইল। খোলা দিকটার মাথায় এমন কৌশলে একটা ভারি দরজা ঝুলান থাকে যে, বাঘ উহার ভিতরে প্রবেশ করিলে, আপনা হইতেই দরজা পড়িয়া খোঁয়াড়ের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। চারিদিকে ডালপালা পুতিয়া, যাহাতে খোঁয়াড়টাকে একটা ঝোপের মত মনে হয়, তাহার ব্যবস্থাও করা হয়। ভিতরে—খোঁয়াড়ের অপর প্রান্তে, একটি জীবন্ত পশু বাঁধা থাকে। সেটাকে ধরিতে যাইয়া, ব্যাঘ্র মহাশয় আট্‌কা পড়িয়া যান।

ফাঁদের কৌশল শিখিয়া মেয়ার সাহেবের লোকেরা ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই এখানে সেখানে অনেকগুলি ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়া আসিল। সপ্তাহ খানেক কাটিয়া গেল,

কিছুই ধরা পড়িল না। একদিন হঠাৎ সর্দ্দার হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সংবাদ দিল, প্রকাণ্ড এক বাঘ খোঁয়াড়ে আট্‌কা পড়িয়াছে। সকলে তাড়াতাড়ি বাঘ লইয়া আসিবার জন্য একটা খাঁচা প্রস্তুত করিতে লাগিল। সর্দ্দার ও তাহার লোকেরা কতকগুলি ডাল ও গাছের গোড়া কাটিয়া আনিল। খাঁচার তলার দিকে গাছের গোড়াগুলি খুব কাছাকাছি করিয়া পাতিয়া দেওয়া হইল। পরে সেগুলিকে একটার সঙ্গে আর একটা বেত দিয়া খুব মজবুত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। দরজার দিকটা বাদ দিয়া, অপর তিন দিক এবং উপরের চালটিও এইরূপ গাছের ডাল ও বেত দিয়া যতদূর সম্ভব শক্ত করা হইল। খাঁচাটি লম্বায় একটু বড় রাখা হইল—যাহাতে বাঘটার দাঁড়াইতে অথবা শুইতে কষ্ট না হয়। কিন্তু চওড়া বেশী করা হইল না, কারণ, তাহা হইলে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া, লাফালাফি করিয়া খাঁচা ভাঙিয়া ফেলিতে পারে। আটক পড়িলে বাঘ অনেক সময় এরূপ ক্ষেপিয়া উঠে যে, রাগের চোটে নিজের শরীর পর্য্যন্ত কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলে।

বাঘটাকে খোঁয়াড় হইতে খাঁচার ভিতর আনিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। খোঁয়াড়ের দরজা ও খাঁচার মুখ এক করিয়া বসাইয়া, খোঁয়াড়ের দরজা তুলিয়া দেওয়া হইল। তার পর, অন্য দিক হইতে খোঁচাখুঁচি করাতে, বাঘটা ক্রমে ক্রমে খোঁয়াড়ের ভিতর অগ্রসর হইতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতে খাঁচার অপর প্রান্তে একটা মুরগী বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। ক্ষুধার তাড়নায় এবং মুরগীর ছট্‌ফটানি ও চীৎকারে বিরক্ত হইয়া, সেটাকে ধরিতে যেই বাঘটা খাঁচার মধ্যে একেবারে ঢুকিয়া পড়িল, অমনি খাঁচার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

খাঁচার চারিদিক খুব মজবুত করিয়া বাঁধা হইলে, দুইটা লম্বা বাঁশ বাঁধিয়া ষোলজন লোকে উহা বহিয়া লইয়া চলিল। মিষ্টার মেয়ার সকলের আগে আগে, সহর অভিমুখে চলিলেন। অন্য সকলে মহা আনন্দে হৈ-চৈ, হাসি-তামাসা, গল্প-গুজব করিতে করিতে বনপথে সাহেবের পিছনে পিছনে যাইতেছে, এমন সময়, মুহূর্ত্তের মধ্যে এক প্রলয়কাণ্ড হইয়া গেল! একটা বিশাল গণ্ডার মহাকাল দৈত্যের মত গর্জ্জন করিতে করিতে, নিমেষ মধ্যে বন হইতে বাহির হইয়া, পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিল! গণ্ডার বাঘের চির-শত্রু। কে কোথায় গেল! কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। মনে হইল, যেন একটা পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড কাল মেঘ, বন ভাঙিয়া বাহির হইয়া, চক্ষের পলকে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল! সকলে ভূত-গ্রস্তের মত এই দৃশ্য দেখিলেন মাত্র। তাঁহাদের হাতের বন্দুক হাতেই রহিয়া গেল, ব্যবহার করিবার সুযোগ মিলিল না।

বিপদ্ কাটিয়া গেলে, দেখা গেল, গণ্ডারের বিপুল দেহের এক আঘাতেই খাঁচা চুরমার্ হইয়া পনর হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। বাঘটা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, রক্তাক্ত-দেহে অতি কষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে নিশ্বাস ফেলিতেছে। লোকজনের মধ্যে একজন নিহত ও দুইজন গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে।

"গণ্ডারের বিপুল দেহের এক আঘাতেই খাঁচা চুরমার্।"

মেয়ার আর কি করিবেন! বাঘটাকে মৃত্যুযন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য, গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। তার পর ভাঙা খাঁচার কাঠ দিয়া খাটিয়া বানাইয়া, আহত লোক দুইটিকে চিকিৎসার জন্য লইয়া চলিলেন। এ যাত্রা তাঁহাকে শুধু বাঘের চামড়াটি তুলিয়া লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

বাঘিনী—না—রাক্ষুসী!

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। তখনও আমাদের দেশে রেল হয় নাই। এখন যে-সকল জায়গায় বড় বড় সহর, কারখানা, হাটবাজার দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই তখন গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং এই সকল জঙ্গলে নানা হিংস্র জানোয়ার মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইত।

সেই সময় এক গোরা কাপ্তেন সাহেব ও তাঁহার আর একটি গোরা বন্ধু রাজপুতানা ও বম্বে প্রদেশের মাঝামাঝি জায়গায় শিকার করিয়া বেড়াইতেন। একবার ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, 'জাট্' নামে একটি গিরি-সঙ্কুল বন-বহুল জায়গায়। একটি ছোট গ্রামের কাছে, একটি পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকা-ভূমিতে তাঁহাদের তাঁবু পড়িয়াছিল। সারাদিন পথশ্রমের পর, তাঁহারা ডেক্-চেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু অন্ধকার হয় নাই। এমন সময়ে—কিন্তু এবার বোধ হয় কাপ্তেন সাহেবের নিজের মুখে শোনাই ভাল। তাঁহার ডায়েরিতে তিনি লিখিয়াছেন:—

"এমন সময়ে এক বিকট আওয়াজ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। লিট্‌ল্ (কাপ্তেনের বন্ধু) এতটা অভিভূত হইয়া পড়িল যে, তাহার হাত হইতে গেলাস পড়িয়া চুর্‌মার্ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই দু'জনে সামলাইয়া লইয়া তাঁবুর বাহিরে আসিলাম। চারিদিকে বিষম সোরগোল,—আমাদের এই ছোট্ট উপনিবেশটি হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আমাদের সঙ্গে শিকার তাড়াইবার জন্য যে একদল কুলী আসিয়াছিল, তাহাদেরই সর্দ্দারের ছেলেকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। ছেলেটির বয়স পনর যোলর বেশী হইবে না। সবে সে-ও তাহার বাবার সঙ্গে জানোয়ার তাড়ানোর কাজে আসিয়া জুটিয়াছিল। তাঁবু ফেলিবার পর সকলেই বিশ্রাম করিতেছিল, কেবল ঐ ছেলেটি কয়েকজন সঙ্গী লইয়া নদীর ধারে ঘুরিয়া দেখিতে গিয়াছিল। সঙ্গীরা একটু পিছনে, সে আগে আগে চলিতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ পাশের বন হইতে ভীষণ গর্জ্জন শোনা গেল। ঠিক তাহার পরই প্রকাণ্ড এক বাঘ লাফাইয়া ছেলেটির উপর আসিয়া পড়িল এবং এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। সঙ্গীরা এই ব্যাপারে একেবারে মূর্চ্ছা যাইবার যোগাড়! তাহারা কোনও মতে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া, এলোমেলো ভাষায় সঙ্গীর দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা

করিল। ছেলেটির বাবা ত ক্ষিপ্তপ্রায়! সে খালি হাতেই বাঘের পিছন পিছন তাড়া করিতে উদ্যত। অনেক চেষ্টায় তাহাকে থামাইয়া, মশাল জ্বালিবার হুকুম দিলাম। তার পর প্রায় পঞ্চাশ জন কুলী লইয়া আমরা দুইজনে চতুর্দ্দিকের জঙ্গল ও পাহাড় তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করিলাম, কিন্তু সে রাত্রে কিছুতেই বাঘের বা ছেলেটির কোনও সন্ধান মিলিল না।

সর্দ্দারের এই ছেলেটিকে সকলেই ভালবাসিত; আমারও সে বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। সারারাত তাহার মুখ ও বাঘের বিকট গর্জ্জন ক্রমাগত মনে পড়াতে আমার নিদ্রা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালে দেখি, ভোর না হইতেই কুলীরা সব উঠিয়া জটলা পাকাইতেছে। গ্রামের লোকেরাও পাঁচ সাত জন আসিয়া জুটিয়াছে। তাহাদের কাছে এই বাঘ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেল। এটি একটি প্রকাণ্ড বাঘিনী। কিছু দিন হইল, এই অঞ্চলে ইনি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছেন! গরু-বাছুরের উপর ইঁহার বিশেষ নজর নাই, মানুষ ছাড়া আর কিছু রোচে না। স্থানটিতে ভূগর্ভে প্রচুর লোহা পাওয়া যায়; তাই বিস্তর লোহার খাদে জায়গাটি ভরা। এই সকল খাদের মধ্যে অনেকগুলি অতি পুরাতন: নিঃশেষে লোহা জোগাইবার পর, এখন সেগুলির কাজ ফুরাইয়াছে। এই পরিত্যক্ত জঙ্গল-ভরা খাদগুলিতেই না কি বাঘিনী বিশ্রাম করিতেন। এই সকল সংবাদ সংগ্রহের পর, সেদিন আবার অন্বেষণ আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরেই বনের মধ্যে একটি নীচু খোলা জায়গায় ছেলেটির মৃতদেহ পাওয়া গেল। মুখের বেশীর ভাগ এবং হাত ও পায়ের তেলো নাই, বাদ্‌বাকি সব যেমন তেমনি আছে। কুলীরা এই মৃতদেহটি সযত্নে বহিয়া আনিয়া সমারোহের সহিত নদীর ধারে তাহার সৎকার করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়াই হউক, তাহাদের প্রিয় সঙ্গীর এই দশা যে করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত সাজা দিবেই। কিন্তু সেদিনও অনেক খুঁজিয়া বাঘিনীর সন্ধান মিলিল না। তার পর আরও দুইদিন ঐখানে ছিলাম, কিছু শিকারও করিয়াছিলাম, কিন্তু সর্দ্দারের ছেলের অপমৃত্যুর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার কোন সুযোগই পাই নাই। দুই দিন পরে যখন অন্যত্র গেলাম, তখন মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ভার রহিয়া গেল!

এই ঘটনার অল্প দিন পরে আবার আমরা দুইজনে জাটে শিকারের খোঁজে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছিলাম। দুই তিন দিন ছোট ছোট শিকারের পিছনেই গেল, তার পর হঠাৎ একদিন সকালে শিকারে বাহির হইবার সময় খবর আসিল, একটি স্ত্রীলোককে বাঘে লইয়া গিয়াছে। কোন্ বাঘ, বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ভাবিলাম,

এবার যেমন করিয়াই হউক তাহাকে পাওয়া চাই। শুনিলাম, স্ত্রীলোকটি সকালে উঠিয়া আরও কয়েকজন সঙ্গিনীর সহিত ঘাস কাটিতে গিয়াছিল, এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘন জঙ্গলের ভিতর হইতে বাঘটা বাহির হইয়া আসিয়া, তাহাকে লইয়া যায়। এই সঙ্গিনীদের মধ্যে কয়েকজন না কি বাঘটাকে আগেই দেখিতে পাইয়াছিল এবং তাহার গতিবিধি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ঐ হতভাগ্য স্ত্রীলোকটিই তাহার লক্ষ্যস্থল। কিন্তু তাহারা ভয়ে এরূপ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, চীৎকার করিয়া সঙ্গিনীকে সাবধান করিবার মত অবস্থা তাহাদের ছিল না। আর করিলেও বিশেষ ফল হইত বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, সংবাদ পাইবামাত্র আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। দলবলের বিশেষ অভাব ছিল না। কেন না, এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা রাষ্ট্র হইবামাত্র সমগ্র জাট্ সহরে এক বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গেল, আর দলে দলে লোক লাঠি-সোটা, ঢাক-ঢোল, বাঁশী-শিঙা যে যাহা পারিল, তাহাই হাতে লইয়া আমাদের সহিত যোগ দিল। সকলেরই প্রতিজ্ঞা, এইবার যেমন করিয়া হউক, বাঘিনী সুন্দরীর একটা কিছু জবরদস্ত রকমের গতি করিতে হইবে। তাহার খাজনার বহরে তাহারা অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

যে পথ দিয়া বাঘ শিকার লইয়া গিয়াছিল, তাহা বাহির করিতে আমাদের কষ্ট পাইতে হয় নাই। কেন না, ঐ পথের দুই ধারে ঝোপে-ঝাড়ে ও জমিতে প্রচুর রক্তের দাগ, ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা, চুলের গোছা প্রভৃতি দেখা যাইতেছিল। সেই পথ ধরিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কাহারও মুখে শব্দ নাই, কিন্তু সকলেরই মনে চরম উত্তেজনা। প্রতি মুহূর্ত্তেই বাঘের সহিত মুখোমুখী হইবার সম্ভাবনায় সকলে হুঁসিয়ার। এই ভাবে দুই মাইল পথ যাইবার পর, একটা পরিত্যক্ত লোহার খাদের ঠিক মুখে স্ত্রীলোকটির মৃতদেহ পাওয়া গেল। তাহার মাথা যে ভাবে থেঁৎলাইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না যে, বাঘে ধরিবামাত্র বেচারির মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

যাহা হউক, এইবার সকলেরই আশা হইল যে, বাঘের দেখা পাইতে আর বিলম্ব হইবে না। কিন্তু এমন সময়ে হঠাৎ পাশের ঘন ঘাসের ভিতর হইতে দুইটি সম্বর ছুটিয়া বাহির হইল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া দুই এক জন 'বাঘ' 'বাঘ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমরা বন্দুক হাতে তৎক্ষণাৎ সেই দিকে দৌড়াইয়া গেলাম, কিন্তু গিয়াই ভুল বুঝিতে পারিলাম। ইতিমধ্যে সঙ্গের লোকজন মৃতদেহটি তুলিয়া লইয়া গ্রামে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। অনেক করিয়া তাহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে, নিকটবর্ত্তী খাদগুলিতে ধোঁয়া দিয়া বাঘটাকে বাহির করিবার

চেষ্টা করাই আমাদের এখন একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে! তাহাদের মত ফিরানো গেল না। বোধ হয়, এই উপায়ে বাঘ-শিকার করার প্রস্তাব তাহাদের নিকট নিতান্তই অসম্ভব মনে হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে আবার একবার জাটে শিকার করিতে গিয়াছিলাম। তখনও এই মানুষ-খাকা বাঘিনীর দৌরাত্ম্যের অবসান হয় নাই। আমরা রাতারাতি এক দল লোক জড় করিয়া, ভোর না হইতেই তাহার খোঁজে রওনা হইলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, বাঘটা নিশীথ-বিহার শেষ করিয়া যে পথে বাসায় ফিরে,
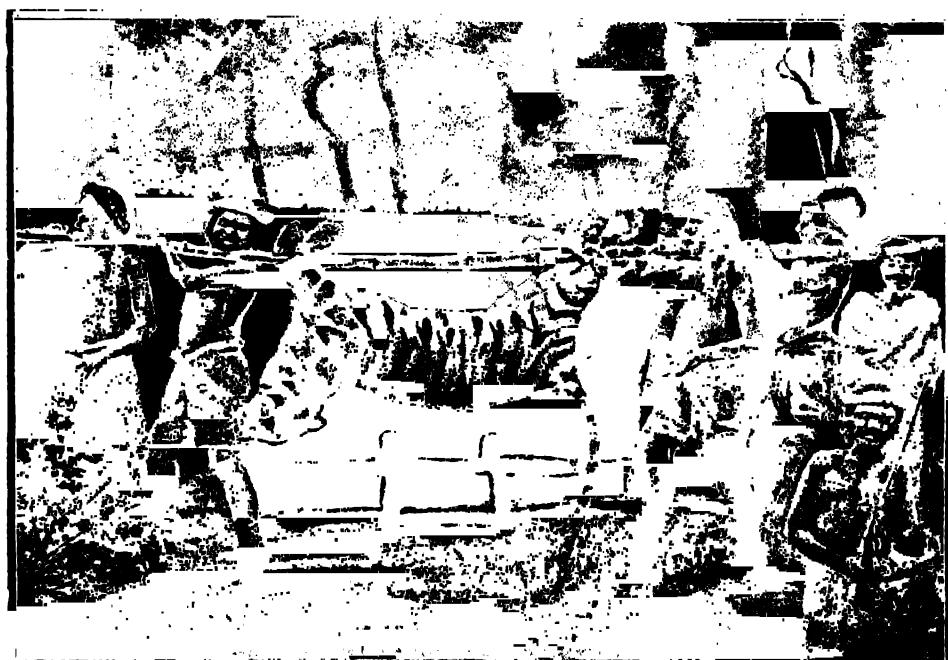
"বিজয়-উল্লাস শেষ হইলে, বাঘিনীটাকে গ্রামের দিকে লইয়া চলিল।"—১০৬ পৃষ্ঠা

সেই পথে ঘাটি আগলাইয়া থাকা। আমরা দুই জনে এই উদ্দেশ্যে পরিত্যক্ত লোহার খাদগুলির কাছে গিয়া, একটা সুবিধামত যায়গা বাছিয়া, বাঘিনীর উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। লোকজনদের বলিয়া দিলাম, যেন বেশ খানিকটা দূরে, খোলা জায়গায় গিয়া তাহারা ছড়াইয়া পড়ে এবং তার পর ধীরে ধীরে বন তাড়াইয়া আমাদের দিকে আসে। আমরা ভাল করিয়াই জানিতাম, এই ভাবে তাড়া খাইলে, মানুষ-খাকী নিশ্চিত বাসার দিকে দৌড়াইয়া আসিবে। আমাদের হিসাব যে সম্পূর্ণ ঠিক হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ একটু পরেই পাইলাম। তখন সবে পিস্তলের,

ঢাকের ও ক্যানেস্তারার আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সকলে হল্লা সুরু করিয়াছে. আমরাও বন্দুক ঠিক করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে মনে হইল, কিছু দূরে ঝোপের আড়ালে ঘন লম্বা ঘাসের বনে কি যেন একটা নড়িতেছে! আমরা ভুল দেখিলাম কি না ভাবিতেছি, হঠাৎ একটা বিকট গর্জ্জন শুনিয়া চম্‌কিয়া উঠিলাম। পর মুহূর্ত্তেই দেখি, বাঘিনী ভীষণ বেগে ঠিক আমাদের পাশের একটা খাদ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে ; কিন্তু তাহাকে আর সে যাত্রা গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে হয় নাই। আমাদের জোড়া বন্দুক একসঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল। বুকে ও মাথায় গুলি খাইয়া বাঘিনী ধরাশায়ী হইল। তারপর একবার সে উঠিবার চেষ্টা করিল, দুই একবার গর্জ্জন করিল, চারিদিকের মাটিতে উন্মত্তভাবে ল্যাজ্ আছ্‌ড়াইতে লাগিল। কিন্তু আর দুইটি গুলি খাইতে সব শেষ হইয়া গেল। সেই বিশাল ডোরা-কাটা বলিষ্ঠ দেহ অসাড় নিস্পন্দ হইয়া চিরদিনের মত গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল!

তখন সঙ্গের লোকদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! বাঘিনীর মৃতদেহ ঘিরিয়া তাহাদের সে কি উল্লসিত নৃত্য! এদিকে গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ-শিশুরা আসিয়াও দলে যোগ দিল। আর একদল রমণী—গ্রামের যত বাছা বাছা সুন্দরী—আমাদের নিকট আসিয়া অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গীসহকারে তাহাদের ভাষায় রচিত নানা ছড়া আওড়াইতে আরম্ভ করিল এবং আবৃত্তির পালা শেষ হইলে, আমাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া ফুলের তোড়া উপহার দিল। ঐ ছড়াগুলি না কি তাহাদের জাতীয় কবিদের রচিত—ব্যাঘ্রহন্তাদের শৌর্য্য ও বীর্য্যের প্রশংসায় পূর্ণ। এই ভাবেই তাহারা বীরপুরুষগণের অভ্যর্থনা করে।

বিজয়-উল্লাস শেষ হইলে, সকলে মিলিয়া বাঘিনীটাকে বাঁশে ঝুলাইয়া গ্রামের দিকে লইয়া চলিল। এমন সময় একটি লোক হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিতে লাগিল। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, তাহার ভাইকে ক'দিন হইল এই রাক্ষুসী খাইয়া ফেলিয়াছে। দু'জনে একসঙ্গে ক্ষেত নিড়াইতে গিয়াছিল, হঠাৎ বাঘিনী আসিয়া তাহার চোখের সম্মুখেই ভাইকে ধরে। ধরিবামাত্র তাহার ভাই হাতের কাস্তে দিয়া প্রাণপণ বলে বাঘিনীর মুখে এক ঘা বসাইয়া দেয় সে দূর হইতে সবই দেখিতে পাইয়াছিল, এমন কি, কাস্তেখানাতে রক্তের দাগ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল। লোকটির কথায় আমরা আগ্রহের সহিত বাঘের মুখ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সত্যই তাহার নাকের উপর মস্ত এক কাটার দাগ। ঘা শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখনও দাগ মিলাইয়া যায় নাই। এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর, এই বাঘিনীই যে সেই মানুষ-খাকী রাক্ষুসী, সে সম্বন্ধে আর কাহারও

কোন সন্দেহ থাকিল না। তার পর উপর্য্যুপরি তিন বৎসর জাটে গিয়াছিলাম, কিন্তু বাঘের অত্যাচারের আর কোন কথাই শুনি নাই।

বাঘিনীটির না কি কয়েকটি পোষ্যও ছিল। ধাড়ী ও বাচ্ছাগুলির উদরপূর্ত্তির জন্য তিন মাসের মধ্যে চল্লিশজন লোককে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। রাক্ষসীর মৃত্যুতে এই শিশু পোষ্যগুলি আপাততঃ নিরন্ন হইল বটে, কিন্তু জাটের লোকেরা আবার স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা সুরু করিল।"

———

বালাঘাটের বাঘ

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের তখন গণ্ডিয়া হইতে বালাঘাট 'সেক্‌সন্' প্রস্তুত হইতেছিল। আমরা তিনজন বাঙ্গালী সেই রেল পাতার তত্ত্বাবধান করিতে বালাঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বালাঘাটের চারিদিকেই ছোট বড় পাহাড় ও গভীর জঙ্গল। বনের মধ্যে কাঠের ঘরে আমাদের থাকিবার আড্ডা হইয়াছিল। আমরা কতকটা দূরে দূরে থাকিতাম বটে, কিন্তু প্রায়ই তিন জনে একত্র হইয়া কাহারও বাসায় একসঙ্গে রাত্রি কাটাইতাম। সেখানকার বাঘের দৌরাত্ম্য আমাদের অবিদিত ছিল না। এমন অনেক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহা মনে করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

একবার কলিকাতা হইতে এক শিকারী বন্ধু শিকারে জোড়্ জোড়্ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। আমাদের তিন জনের কেহই ভাল শিকারী না হইলেও, প্রত্যেকের এক একটা বন্দুক ছিল। বন্ধুর আগ্রহে পর পর দুই রাত্রি অনেক চেষ্টা করিয়াও বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল না। বাঘকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য স্থানে স্থানে যে কয়েকটা ছাগল, গরু বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, সে গুলাকে অক্ষত দেহে পাওয়া গেল। ইহা দেখিয়া বাঘশিকার সম্বন্ধে আমরা তিন জনে নিরাশ হইয়া পড়িলাম। বন্ধুর উৎসাহ কিন্তু কমিবার নহে। পরদিন সকালে বাড়ীর কাছাকাছি ঘাসবন ও জঙ্গল পরীক্ষা করিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার উৎসাহ বরং দশগুণ বাড়িয়া গেল। বাঘ যে বাড়ীর খুব কাছে আসিয়া, অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া ফিরিয়া

গিয়াছে, সে চিহ্ন একেবারে স্পষ্ট। আমাদিগকে ডাকিয়া তাহা দেখাইলেন। কাজেই আমরা তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

কয়েকজন চাকর স্থানে স্থানে আগুন জ্বালিয়া বাহিরে শয়ন করিত। তাহারা সেদেশী লোক। তাহাদের বিশ্বাস, আগুন থাকিলে আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না। এ কথা অনেকটা সত্য বটে, কিন্তু তবু সে রাত্রি তাহাদিগকে ভিতর আঙিনায় শুইতে বলিলাম। তাহারা আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "কিসের ভয়, বাবু? আমরা পালা ক'রে সারা রাত জেগে আগুন জ্বালাবো। বাঘের বাপের সাধ্যি নেই যে, এ দিকে আসে।"

সে দিন সন্ধ্যার পর অবধি বাঘের অভ্যর্থনার জন্য নানা আয়োজন করিয়া বন্ধু প্রস্তুত হইলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা চারিজনে গল্প করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি বারটা বাজিল। চাকরেরা সজাগ আছে, এই বিশ্বাসে এতক্ষণ তাহাদের কোন খোঁজ খবর লই নাই; এখন বাহিরে আসিয়া দেখি, চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন আগুনের খুব কাছে। তাহাদিগকে জাগাইয়া দিয়া আমরা আবার গল্প গুজব আরম্ভ করিলাম।

আমার কলিকাতার বন্ধুটি শিকারে একেবারে ওস্তাদ। শিকারী কুকুরের মত তাঁহার শ্রবণশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ। তিনি মধ্যে মধ্যে বাহিরের দিকে তাকাইয়া কান খাড়া করিয়া কি যেন শুনিতেছিলেন; হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং আমাদিগকে চুপ্ করিতে বলিলেন। একটু পরে বলিলেন "শুকনো পাতার উপর দিয়ে কোন জানোয়ার যেন এলো বোধ হচ্ছে, বেশ বড় জানোয়ার।"

আমরা প্রথমে তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। কিন্তু তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া আমরাও সতর্ক হইলাম। বন্ধু বারান্দায় আসিলেন। যেখানে আগুন জ্বালা ছিল, তাহার বিশ পঁচিশ হাত দূরে লম্বা লম্বা ঘাসের একটা বন ছিল। তিনি সেই দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ বনের একটু ফাঁকে গোল গোল দুইটা জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল। একটু পরেই চোখ দুইটা অদৃশ্য হইল। আবার দুই তিন মিনিট পরে চোখ দুইটা দেখা গেল—সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা বাঘের মাথা! কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মাথাটা আবার বনের মধ্যে লুকাইল।

তার পর তিন চারি মিনিট আর কোন কিছু দেখা গেল না। কোনও আওয়াজ নাই, বনও মোটেই নড়ে না। বন্ধু বোধ হয় ব্যাপারটা কি হইল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি বন্দুক ঠিক করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চাকরেরা ততক্ষণে আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ বনের ভিতর হইতে

বাঘটা উপর দিকে এক লাফ দিল—আগুন হইতে একটু দূরে যে চাকরটা ঘুমাইতেছিল, তাহারই উপর তাহার লক্ষ্য।

বন্ধু গুলি চালাইলেন। বাঘটা যখন শূন্যে, তখনি তাহার পেটে গুলি লাগিল। কিন্তু সে যে বিশেষ আহত হইয়াছে, মনে হইল না। সে চাকরটার উপর পড়িয়া হাতের উপর কামড় দিয়া, তাহাকে টানিতে টানিতে চক্ষের পলকে বনের ভিতর লইয়া গেল। যাইবার সময় বন্ধু বাঘটাকে আর এক গুলি করিলেন, তবু তাহার কিছু হইল না। চাকরটা ঘুমন্ত অবস্থায় আচম্‌কা এই বিপদে পড়িয়া কিরূপ যে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। ক্রমে বনের ভিতর হইতে অতি ক্ষীণ কণ্ঠের ক্রন্দন শুনা যাইতে লাগিল।

"লোকটাকে বনের ভিতর লইয়া গেল।"

তখন লোকজন, সকলকে লইয়া আমরা চারিজন মশাল জ্বালিয়া সশস্ত্র বাহির হইলাম। চারিদিক্ ঘোর অন্ধকার, ভীষণ জঙ্গল। মশালের আলোয় পথ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এতক্ষণ আর্ত্ত-নাদ একটু আধটু শুনা যাইতেছিল, তাহাও বন্ধ হইল। মাটি ও ঘাসের উপর রক্তের দাগ ধরিয়া আমরা বাঘের সন্ধানে চলিলাম। বেশী দূর যাইতে হইল না। আন্দাজ সিকি মাইল গিয়াই বাঘটাকে দেখিতে পাইলাম। চাকরকে তখনও ছিঁড়িয়া খায় নাই, যেমন আনিয়াছিল সেই অবস্থায় সে পড়িয়া আছে। তাহাকে পাশে ফেলিয়া রাখিয়া বাঘটা হাঁপাইতেছিল, গুলি খাইয়া সে-ও যে খুব জখম হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার বুক ও গলা হইতে রক্ত ঝরিয়া চাকরটার গায়ে পড়িতেছিল; এই আঘাতের কষ্টের জন্য সে তখনও লোকটাকে খাইতে পারে নাই।

বন্ধু গুলি চালাইলেন। দুইটা চোখের মাঝখান দিয়া গুলিটা চলিয়া গেল। বিকট গর্জ্জন করিয়া লাফ দিতে গিয়াই বাঘটা পড়িয়া গেল। আর এক গুলি। তার

পরই সব শেষ। তখন আমরা দৌড়িয়া চাকরটার কাছে গেলাম। দেখিলাম, সে মরে নাই ; ভয়ে ও যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিলাম।

কিন্তু ও কি ! বাড়ীর খুব কাছে আসিয়াছি, এমন সময় পাশের একটা ঝোপে আবার খড়্মড়্ শব্দ ! সকলে বলিল, "ওটা নিশ্চয়ই বাঘিনী।" মশাল ধরিয়া দেখা গেল, বাঘিনীই বটে, লাফাইবার যোগাড় করিতেছে। তাড়াতাড়ি মূর্চ্ছিত চাকরটাকে রাখিয়া আমরা বাঘিনীর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কলিকাতার বন্ধুটি কিন্তু খুব ধীর, স্থির। তিনিই আমাদের দলপতি। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে আমরা সব কাজ করিতে লাগিলাম। তখন বাঘিনীকে মারাই প্রথম কাজ। অন্ধকারে তাহাকে লক্ষ্য করা অসম্ভব মনে হইতেছিল। বাঘের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য সে কেবলই এধার-ওধারে আস্ফালন করিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিল।

বন্ধু আর অপেক্ষা করিলেন না। যতদূর সম্ভব লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইলেন। গুলি কিন্তু বাঘিনীর গায়ে ভাল রকম লাগিল না ; তাহার ফল ভীষণ হইল। আমাদের একটা চাকর বর্শা হাতে লইয়া, গুলি মারার পরেই বাঘিনীর দিকে ছুটিল। বোধ হয় ভাবিল, গুলিতে খানিকটা জব্দ হইলে, বর্শা দিয়াই সে তাহাকে শেষ করিয়া দিবে আমরা চীৎকার করিয়া তাহাকে নিষেধ করিলাম। কিন্তু সে ফিরিল না। বাঘিনী গুলি খাইয়া এমন মরিয়া হইয়া উঠিল যে, সোজা আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। খানিক আসিয়া বর্শা হাতে চাকরটাকে সাম্‌নে পাইল। আর যায় কোথা ! বাঘিনীর যত আক্রোশ তাহার উপরেই পড়িল। প্রচণ্ড থাবার আঘাতে ধরাশায়ী করিয়া দাঁত দিয়া তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল।

এই অবসরে বন্ধু আবার বন্দুক ছুড়িলেন। এবার আর গুলি ব্যর্থ হইল না। বাঘিনী উপুড় হইয়া পড়িয়া মাটি কাম্‌ড়াইতে লাগিল। আমরা তখন তাড়াতাড়ি চাকরটার কাছে গিয়া হাজির হইলাম। দেখিলাম, সে একেবারে মরিয়া গিয়াছে। তখন পূর্ব্বের সেই মূর্চ্ছিত চাকরটাকে ধরাধরি করিয়া বাসায় আনিয়া ব্যাণ্ডেজ্ ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম।

এক রাত্রিতে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের উপর দিয়া কি ভীষণ বিপদ্ চলিয়া গেল। একটি চাকর প্রাণ হারাইল, আর একটি মরণাপন্ন। খুব ভাল করিয়া আগুন জ্বালিয়া, আমরা বাকী রাত্রিটা জাগিয়া বসিয়া রহিলাম। মাঝে মাঝে দূরে বাঘের গর্জ্জন শুনা যাইতেছিল। কিন্তু আমাদের কাছে আর কোন বাঘ আসিল না।

পরদিন—সকাল বেলা সর্ব্বাগ্রে মৃত লোকটির সৎকারের ব্যবস্থা করিলাম।

তাহার পর মরা বাঘ ও বাঘিনীকে আনিয়া তাহাদের নখ ও দাঁত কাটিয়া লইলাম। বলা বাহুল্য, চামড়া দুইখানি লইতেও ভুলি নাই। গত রাত্রির ব্যাপারে শিকারী বন্ধুর উৎসাহ খুব বাড়িয়া গেল। তিনি আবার রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বনের খবর

(৬)

আমরা লুশাই পাহাড়ে আসিয়াছি। লুশাই পাহাড়ের যেখানটায় আমাদের কাজ, সে বড় ভয়ানক স্থান। প্রায় সাতশ' বর্গমাইল জায়গা, তাহার মধ্যে পথও নাই, গ্রামও নাই। সঙ্গে ষাটজন লোক আসিয়াছে। খাবার জিনিসও ঢের, তাহা বহিতে দুইটা হাতী আসিয়াছে। বার তের জন লুশাই বন কাটিয়া পথ করিয়া আগে আগে চলে, তবে আর সকলে যাইতে পারে। এত করিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর চার পাঁচ মাইলের বেশী পথ চলা যায় না। সন্ধ্যাবেলায় যখন তাবু পড়ে, তখন যেন কাহারও হাত পা চলিতে চায় না। সেই অবস্থাতেই আবার রাত্রে পাহারা দিতে হয়। সে ঘোর বনে মানুষের নাম গন্ধও নাই, খালি জানোয়ারের কিলিবিলি! সন্ধ্যার পর পা ফেলিতে গেলেই মনে হয়, বুঝি বাঘই মাড়াইতেছি! নয় দশটার আগে সূর্য্য দেখাই যায় না। এক এক জায়গায় এমনি বন যে, আকাশ দেখিবার যো নাই; ঠিক মনে হয়, যেন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আমি সকলের আগে আগে যাই; সঙ্গে একজন বুড়া লুশাই থাকে, সে মস্ত শিকারী। দুইজন খালাসীও সঙ্গে থাকে। তাহাদের মধ্যে শ্যামলালের হাতে আমার দূরবীণ ও টোটার থলি, আর একজনের হাতে আমার খাবার ও জল। এই তিনজনের প্রত্যেকেরই হাতে এক একখানি দা।

আমরা চারি জনে গাছে গাছে দাগ দিয়া আন্দাজ আধমাইল আগে আগে যাই; সেই দাগ দেখিয়া লুশাইরা বন কাটিয়া কাটিয়া আসে। রোজ এমনি হয়। একদিন পনের যোল ফুট চওড়া একটা হাতীর রাস্তা পাওয়া গেল। আজ লোক-জনদের খুব মজা, বন কাটিতে হইতেছে না।

পর দিন আবার চলিয়াছি। যাইতে যাইতে দেখি, পথের উপরে একটা প্রকাণ্ড গাছ পড়িয়া আছে। শুধু গুঁড়িটাই আমার বুকের সমান উঁচু। ভাবিতেছি, আমাদের হাতীগুলা তাহার উপর দিয়া পার হইবে কি করিয়া! ভাবিতে ভাবিতে গাছটার উপর উঠিতে আরম্ভ করিয়াছি, আর অমনি আমার পায়ের নীচে একটা কি যেন ছড়্-মুড়্ করিয়া উঠিল! আমি বলিলাম, "ক্যা হায় রে?" শ্যামলাল বলিল, "হনুমান হোগ, হুজুর।" বলিতে বলিতেই সেটা গাছপালা ভাঙিয়া, কামানের গোলার মত বাহির হইয়া আসিয়াছে! প্রকাণ্ড এক গণ্ডার। সে ত আমাদের দেখিয়াই এক ছুট। আমি পিছনের দিকে হাত বাড়াইয়া রহিয়াছি, শ্যামলাল বন্দুক দিবে; কিন্তু কোথায় শ্যামলাল। সে ততক্ষণে প্রাণ বাঁচাবার সোজা পথ খুঁজিতেছে। আমি লাফাইয়া নামিয়া, তাহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া, টোটা ভরিয়া গণ্ডার মারিতে ছুটিলাম, কিন্তু সেটা সেই অবসরে কোথায় যে গা ঢাকা দিল, বুঝিতে পারিলাম না।

"যমদূতের দাদামশাই!"

তার পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছি। আজিকার পথ নালায় নালায়; সঙ্গে সেই বুড়া লুশাই আর শ্যামলাল। ভোরের বেলায় নানা রকম শিকার মিলে, তাই বন্দুক ভরিয়া লইয়া চলিয়াছি। শিকার সাম্‌নে পড়িয়াছে, কিন্তু মারিতে পারিতেছি না। একে ঘোর বন, তাহাতে কুয়াসা, শিকার দেখিতে না দেখিতে কোথায় মিলাইয়া যায়। হাতী, গণ্ডার, বাঘ প্রায় সকল রকম জানোয়ারেরই তাজা পাঞ্জা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

আমরা পাকোয়া নদীর দিকে চলিয়াছি, লুশাই আগে আগে, আমি পিছনে। নালা পার হইয়া উপরে উঠিতে যাইব, এমন সময় আমাদের সাম্‌নেই ভারি একটা জল-কাদা তোলপাড়ের শব্দ হইল। নিশ্চয় বোঝা গেল যে হাতী, গণ্ডার বা বন্য মহিষ—ইহাদের একটা হইবে। কাদায় পড়িয়া আরাম করিতেছিল, আমাদের গন্ধ পাইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আরো বেশী ব্যস্ত হইয়া দুই লাফে আসিয়া

দেখিলাম, ব্যাপারখানা কি! একটা বিশাল গণ্ডার, যমদূতের দাদামহাশয়ের মত দাঁড়াইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছে। লাল চোখ দু'টা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, কান পিছনে হেলান। নালায় পড়িয়া আর একটা জল তোল-পাড় করিতেছে।

আমার পকেটে তিনটি মাত্র টোটা! মাঝখানে কুড়ি পনের চওড়া নালা—ওপারে দুইটা গণ্ডার। শ্যামলাল পালাইয়াছে। লুশাই খালি বলিতেছে, "মারো সাহেব!" সে দা-খানা লইয়াছে মুখে, পা রাখিয়াছে একটা গাছের গোড়ায়, হাত রাখিয়াছে ডালের উপর। একটু বেগতিক দেখিলে, বানরের মত তড়্‌তড়্ করিয়া গাছে চড়িবে! আমি কি করিব? সেই ছেলে বেলা গাছে চড়িতাম, এখন সে বিদ্যা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি; তাহার উপর আবার বুট পায়। কাজেই আস্তে আস্তে বন্দুকে গুলি ভরিয়া প্রস্তুত রহিলাম। গণ্ডার যদি এ পারে আসিতে চায়, তবেই মারিব, নইলে মারিব না। লুশাই খালি বলিতেছে, "মারো, মারো"—আমি কেন সে কথায় কান দিতে যাইব? তিনটি মাত্র গুলি লইয়া গণ্ডার মারিতে গিয়া প্রাণটি হারাইব, এমন বোকা আমি নই।

যাহা হউক আমারও গুলি মারিতে হইল না, লুশাইএরও গাছে চড়িতে হইল না। গণ্ডার দুইটা মিনিট খানেক পাথরের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে হুঙ্কার দিয়া পাহাড়ে গিয়া উঠিল। সাম্‌নে যত বাঁশ পড়িয়াছিল, পাকাটির মত পট্‌পট্ ভাঙিয়া গেল।

তখন আমরা ধীরে ধীরে আবার চলিতে লাগিলাম। আধ মাইলও যাই নাই, অমনি আবার সম্মুখে বিষম হুড়াহুড়ি। তার পর মড়্‌মড়্ করিয়া বাঁশ ভাঙার শব্দ; তার পর উঃ! কী ভীষণ গর্জ্জন! সারাটি বন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এবারে লুশাইএর আশে পাশে গাছ নাই, কিসে উঠিবে? বড়ই বিপদ্! শ্যামলাল ইহার আগেই আসিয়া জুটিয়াছিল। আমি তাহার নিকট হইতে আট দশটা টোটা চাহিয়া লইলাম।

এবার আমি পথ ছাড়িয়া একটা ঝোপের ভিতর গিয়া বন্দুক বাগাইয়া দাঁড়াইলাম। দাঁতওয়ালা হাতার গর্জ্জন! সেটা হয় ক্ষ্যাপা, না হয়, অন্য কোন জানোয়ার দেখিয়াছে। লুশাই বলিল, "বোধ হয়, সেই গণ্ডার ওর সাম্‌নে পড়েছে।"

হাতাটা কিন্তু আমাদের দিকে আসিল না। কয়েকটা ডাক দিয়া আস্তে আস্তে বাঁশ ভাঙিতে ভাঙিতে পাহাড়ে উঠিয়া গেল। আমরাও আবার চলিতে লাগিলাম।

———

(৭)

আমরা পাকোয়া নদীর ধারে আসিয়াছি। নদীটি সত্তর, আশী হাত চওড়া হইবে, তাহাতে এক কোমর জল। নদীর ধারে হাতীর পায়ের তাজা দাগ; একটির পিছনে আর একটি, তার পিছনে আরো একটি, এমনি করিয়া একদল হাতী চলিয়া গিয়াছে।

সারাদিন জলে জলে চলিয়া আমার কাপড়-চোপড় সব ভিজিয়া গিয়াছিল। আমি নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে ঠেসান দিয়া বসিয়া জুতা মোজা খুলিতে লাগিলাম। লুশাইকে বলিলাম, "পারে গিয়ে, তাঁবুর জায়গা দেখ!" সে ওপারে চলিয়া গেল। শ্যামলাল আর খালাসী বন্দুক লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। একটু পরে আমি "হুঁ—উ—উ—" করিয়া চেঁচাইয়া পিছনের লোকদের ডাকিতে লাগিলাম। খাবার ওয়ালা খালাসী তাহাদের সঙ্গে, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

বার দুই 'হুঁ—উ—উ—' করিয়া চেঁচাইয়াছি, অমনি ঠিক আমার মাথার উপরের পাহাড় হইতে একটা হাতী "হুঁ—উ—উ—" করিয়া উঠিল। আর হাত পঞ্চাশ ষাট দূর হইতে দলের অন্যগুলা গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ করিয়া তাহার জবাব দিতে লাগিল! আমি আবার চেঁচাইলাম, সেগুলা আবার ঠিক তেমনি করিতে লাগিল। আবার চেঁচাইলাম, আবার ঠিক তাহাই। পাহাড়ের উপর হইতে একটা 'হুঁ—উ—উ—, করিয়া উঠে, অন্যগুলা নালার নিকট হইতে তাহার জবাব দিতে থাকে।

এমন সময় পাহাড়ের উপর হইতে বাঁশ ভাঙার মড়্‌মড়্‌ শব্দ আমার কাছে আসিতে লাগিল। শ্যামলাল ও লুশাই-বুড়ো ব্যস্ত হইয়া আমাকে ডাকিয়া বলিল, "চলে এস! চলে এস!" আমি চেঁচাইয়া বলিলাম, "ভয় নেই!" আমার আওয়াজ শুনিয়া তিন চারিটা হাতী দেখিতে আসিয়াছে, এটা কি রকম জানোয়ারের ডাক! আমি তাড়াতাড়ি নদীর এপারে আসিয়া, শ্যামলালের হাত হইতে বন্দুক লইয়া, নদীর কিনারায় গিয়া দাঁড়াইলাম! শ্যামলাল আর লুশাই বুড়ো খুব চেঁচামেচি করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া হাতীগুলা দৌড়াইয়া গিয়া আবার পাহাড়ে উঠিল। তার পর অনেকক্ষণ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু আর হাতী দেখিতে পাইলাম না। তাহাদের আওয়াজ কিন্তু ক্রমাগতই শুনা যাইতেছিল।

চারটা সাড়ে চারটার সময় পিছনের লোকজন আসিলে, নদীর ওপারে বন কাটিয়া তাঁবু খাটান হইল; খুব বড় বড় ধুনী আর পাহারারও বন্দোবস্ত হইল! আমাদের সঙ্গে দুইটা পোষা হাতী ছিল। চরিয়া খাইবার জন্য মাহুতেরা রোজ তাহাদিগকে বনে ছাড়িয়া দিত, আজ আমাদের কাছেই বাঁধিয়া রাখিল। ছাড়িয়া দিলে বুনো হাতী তাহাদের ভুলাইয়া লইয়া যাইবে, না হয়, মারিয়া ফেলিবে। লুশাইরা

শুকনো বাঁশের মশাল বানাইয়া, লম্বা লম্বা কাঁচা বাঁশের আগায় বাঁধিয়া লইল। রাত্রে হাতী আসিলে মশাল জ্বালাইয়া বাঁশের বাঁট ধরিয়া ঘুরাইয়া তাহাদের তাড়াইবে। এমনি করিয়া লুশাই দেশে ক্ষেত হইতে হাতী তাড়ায়।

সে রাত্রে হাতীর জ্বালায় কাহারও ঘুম হয় নাই! অন্ধকার হইতেই তাহারা আমাদের কাছে আসিল, আর বোধ হয় ধুনীর আলোতে পোষা হাতী দুইটাকে দেখিয়া, তাহাদের ভারি খট্‌কা লাগিল যে, ও দুইটা আবার ওখানে কি করিতেছে! পাঁচ, সাতটা হাতী মিলিয়া এপারে আসিবার জন্য এক একবার জলে নামে। আর নদীর মাঝামাঝি আসিতে না আসিতেই আমাদের হাতী দুইটা ভয়ে ছট্‌ফট্‌ করিতে ও চেঁচাইতে থাকে। অমনি আমাদের লোকেরা প্রাণপণে মশাল ঘুরাইয়া, বিকট চীৎকার করিতে করিতে তাড়া করিয়া যায়। সারাটা রাত এই ভাবে কাটিল। ভোরের বেলা কতকগুলা হাতী পূবের পাহাড়ে, আর কতকগুলা পশ্চিমের পাহাড়ে উঠিয়া গেল।

সকালে উঠিয়া, চা খাইয়া, জিনিস-পত্র বাঁধিয়া আমরাও বাহির হইয়া পড়িয়াছি। সেই পূবের পাহাড়েই আমাদেরও যাইতে হইবে। যেমন রোজ যাই, তেমনি চলিয়াছি। লুশাই বুড়ো আগে আগে, তাহার পিছনে আমি, আমার পিছনে শ্যামলাল, খাবার-ওয়ালা ও আমার চাকর গঙ্গারাম।

খানিক দূরে আসিয়া একটা ঝিল পাইলাম; তাহাতে জল নাই, কিন্তু কাদা খুবই। আমরা বলাবলি করিতেছি, কেমন করিয়া কোন্ দিক্ দিয়া পার হইব, আর অমনি সেই ঝিলের মাঝে শরবনের আড়াল হইতে একটা হাতী উঠিয়া, বাঁশবন ভাঙিয়া হুড়্‌মুড়্ করিয়া দে ছুট! পাহাড়-পর্ব্বত যেন সব একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

যাহা হউক, ইহাতে আমাদের এই উপকার হইল যে, কোন্ খান দিয়া ঝিল পার হইতে হইবে, সেটুকু আর বুঝিতে বাকী রহিল না। সেই হাতীর পায়ের দাগ ধরিয়া আমরা ঝিলের ওপারে চলিয়া গেলাম। তখন লুশাই জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে যাব?" আমি বলিলাম, "যে দিকে হাতীটা গিয়াছে, সেই দিকে।" সেই দিকেই হাতীর পায়ের দাগ আর ভাঙা বাঁশ দেখিয়া চলিতে লাগিলাম।

লুশাই বুড়ো আগে গিয়া পাহাড়ের উপরে পৌঁছিয়াছে। আমরা সবে আট, দশ হাত উঠিয়াছি, এমন সময় সম্মুখে ভয়ঙ্কর একটা গোলমাল!---বাঁশ ভাঙার হুড়্‌মুড়্ শব্দ, জানোয়ারের গর্জ্জন, আর লুশাইএর চীৎকার। আমি বলিলাম, "ক্যা হায় রে?" শ্যামলাল পিছন হইতে বলিল, "গণ্ডা (গণ্ডার) হোগা হুজুর।" উপর দিকে চাহিয়া দেখি, বুড়ো উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া নামিতেছে, আর তাহার পিছনে প্রকাণ্ড হাতী শুঁড় তুলিয়া কামানের গোলার মত বেগে আসিতেছে।

তাহা দেখিয়া আমি ছুই লাফে শ্যামলালের হাত হইতে বন্দুক লইয়া উপরের দিকে ছুটিলাম। ছুটিতেছি আর টোটা বদ্‌লাইতেছি। তাড়াতাড়িতে বদ্‌লান কি যায়? এক সেকেণ্ডের কাজ পাঁচ মিনিটেও হইতে চায় না।

যাহা হউক, কোন মতে গুলি ত ভরা হইল। দৌড়াইতেছি তখনও, তাহাতে আবার উপরে উঠিতে হইতেছে—মাটির দিকে চাহিয়া, নহিলে পড়িয়া মরিবার ভয়। হঠাৎ উপরের দিকে চাহিলাম। সর্ব্বনাশ! লুশাইবুড়ো দাঁড়াইয়া গিয়াছে। হাতে দা ছিল, হাতীর সম্মুখে তাহাতে কোন কাজ দিবে না বলিয়া, সেটা ফেলিয়া দিয়াছে, দিয়া রাস্তার মাঝখানে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হাতী তাহার নিকট হইতে আট দশ হাত মাত্র দূরে—এই ধরিল!

সেখানে রাস্তার ছুইটা মোড় ছিল। আমার চোখের সম্মুখেই হাতীর কপালটা। আর কথা নাই, বন্দুক তুলিয়াই সেই কপালে গুড়ুম করিয়া ছাড়িয়া দিলাম। হাতী কিন্তু থামে নাই, একপা আরও চলিয়া আসিয়াছে। এবারে তাহার পাঁজর আমার সম্মুখে; বন্দুকের ঘোড়া তোলাই ছিল, গুড়ুম করিয়া দিলাম সেই পাঁজরে আর এক গুলি ছাড়িয়া। এবারে ওষুধে বেশ কাজ হইল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হাতীর যা চীৎকার! পাহাড় বন সব থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; তার পর হাতীটা সেখান হইতে ঘুরিয়া কয়েক পা ছুটিয়া গিয়াই কুড়ঙ্গের ভিতর হুড়্‌মুড়্ করিয়া পড়িল।

আমি ছুইগুলি মারিয়াই তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া, আর ছুইটা গুলি ভরিয়া লইয়াছি, আর হাতীর পিছনে আবার একটা মারিয়াছি। কিন্তু সেটা বাঁশে আট্‌কাইয়া গিয়া তাহার গায়ে লাগে নাই।

বিপদ্ ত কাটিয়া গেল। তখন তাকাইয়া দেখিলাম, লুশাই বেচারা সেইখানেই কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার নিকট হইতে সে ছয় ধাপ মাত্র দূরে, আর যেখানে হাতীটাকে গুলি মারিয়াছিলাম, সে জায়গাটা লুশাইএর নিকট হইতে মোটে তিন ধাপ। হাতীর শুঁড়্‌টা আমার মনে হইতেছিল, যেন লুশাইএর ঠিক মাথার উপরেই ছিল। পিছনে চাহিয়া দেখি কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে দাঁড়াইয়া, গঙ্গারাম, শ্যামলাল ও খালাসীটা ঠক্‌ঠক্ করিরা কাঁপিতেছে, আর খালি বলিতেছে, "বাবারে বাবা! ওরে বাবা রে! ওরে বাবা!" তাহারা অগ্রসরও হয় না, পলায়নও করে না। গঙ্গারামের বড়ই ছুর্দ্দশা! বেচারার মুখে যেন আর কথা বাহির হইতেছে না—ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া মধ্যে মধ্যে বলিতেছে, "বাবা রে বাবা! এত্তো বড়া কপাল!" হাতীর ঐ কপালটাই খালি তাহার চোখে পড়িয়াছে!

আমি লুশাইএর কাছে গেলাম। বেচারা প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। আমি কাছে যাইতেই, আমার পা জড়াইয়া ধরিল,—মুখে তাহার কথাটি নাই!

তখনও হাতীটার চীৎকারে বনজঙ্গল কাঁপিতেছে: আর যে দিক্ দিয়া সে গিয়াছিল, তাহাতে খালি রক্ত আর রক্ত!

খানিক পরেই আবার আমার লোকজন সব চ্যাচামেচি সুরু করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে দলের কয়েকজন ছুটিয়া আসিয়া হাজির। বলিল, "শীগ্‌গির এসো! শীগ্‌গির এসো! হাতীর বাচ্চা!"

ছোট একটা বাচ্চা, যেখান দিয়া বড় হাতীটা কুড়ুঙ্গের মধ্যে নামিয়াছিল, সেইখান দিয়া নামিতেছে। বাচ্চার এক পায়ে চোট্ লাগিয়া থাকিবে, তাই খোঁড়াইতেছে।

"দোভাষী দৌড়িয়া গিয়া তাহার শুঁড় ধরিয়াছে।"

দোভাষী দৌড়িয়া গিয়া তাহার শুঁড় ধরিয়াছে, আর ব্যস্ত হইয়া আর সকলকে ধরিবার জন্য ডাকিতেছে, কিন্তু যাইতে কাহারও ভরসা হইতেছে না। বাচ্চা হইলে কি হয়? হাজার হউক, হাতীরই ত বাচ্চা! সে ঢিপ্‌ঢাপ্ করিয়া দোভাষীকে ঢুঁ মারিতে লাগিল —আর তাহার ঐ ছোট্ট ছোট্ট পায়ে লাথি চালাইতে লাগিল। দোভাষী ভয়ে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে খবর দিতে।

আগের বড় হাতীটা বোধ হয় ঐ বাচ্চাটিরই মা। বাচ্চার খাতিরেই সে লুশাই বুড়োকে মারিতে গিয়াছিল: সন্তানের মায়া! বাচ্চাটি চলিতে পারে নাই বলিয়া,

সে তাহাকে লইয়া দলের পিছনে পড়িয়া যায়। তারপর বুড়ো গিয়া হঠাৎ তাহার সম্মুখে পড়িতেই, বোধ হয় বেচারির মনে হইল যে, এই ব্যাটা আমার বাচ্চাকে ধরিয়া লইতে আসিয়াছে ; তাহাতেই বুড়োর উপর তাহার এত রাগ !

(৮)

একে ত বিশ্রী রাস্তা, তাহাতে আবার বৃষ্টি হইয়াছে—গোদের উপর যেন বিষফোঁড়া ! আমি কাজে গিয়াছি, লোকজনদের বলিয়া দিয়াছি, একটা জায়গায় গিয়া তাঁবু ফেলিতে। তিনটার সময় কাজ শেষ করিয়া ফিরিলাম। যেখানে তাঁবু ফেলিবার কথা, লোকজনেরা ততদূর যাইতে পারে নাই। একটা পোষা হাতীর পায়ে চোট্ লাগিয়াছিল বলিয়া, দুই-আড়াই মাইল আগে তাঁবু ফেলিয়াছে। কাছেই একটা ছোট নদী, নদীর উপর বাঁশের পোল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করিয়া সকলে শুইয়াছি। এপ্রিল মাস, বেজায় গরম, তাই তাঁবুর দরজা বন্ধ করি নাই। ডম্মর আর সোধন নামে দুইজন খালাসী, নদীর ধারে বালির উপরে রান্না করিয়া খাইয়া, সেইখানেই শুইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের ডাকা হইল, কিছুতেই আসিল না।

প্রায় সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আমারও একটু একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় শুনিলাম, গঙ্গারাম দোভাষীকে বলিতেছে, "দোভাষী ভাই, ওটা কি ? ঐ দেখ, পোলের উপর দিয়ে আস্ছে !" আমি কান খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিলাম—বাঁশের পোলটার উপর দিয়া একটা বেশ বড় আর ভারী জানোয়ার আসিতেছে ; পোলটা তাহাতে ক্যাঁচ্ম্যাচ্ করিতেছে। পাশেই বন্দুক আর টোটা ছিল, হাতে লইয়া চুপি চুপি বাহির হইলাম। পোলের মাঝামাঝি এক জায়গায়, গাছের ফাঁক দিয়া একটু চাঁদের আলো পড়িয়াছিল। জানোয়ারটা সেখানে আসিতেই দেখি, মস্ত বাঘ ! সেটা কিন্তু তখনি আবার অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গেল। তারপর দুইটা আওয়াজ করিতেই, দুই লাফে জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল।

বন্দুকের আওয়াজে সকলেরই ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। সোধন ত উঠিয়াই এক দৌড়ে তাঁবুর মধ্যে ! ডম্মর কিন্তু আসিল না। মাহুত ডাকিয়া বলিল, "ভাগ্ ডোমরা, ভাগ। শের আয়া !" ডম্মের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। তখন দুই তিন জন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিল। সে জাগিয়াই ছিল, ঠেলা খাইয়া চটিয়া বলিল, "কেঁও দিক্ কর্তা ? শের আয়া তো ক্যা হুয়া ? খায়েগা তো হাম্কো খায়েগা,

তুমলোক্‌কা ক্যা হৈ ? হাম নেহি যায়েগা।” সমস্ত রাত সে সেইখানেই কাটাইল। পোলটা তাহার নিকট হইতে পনর যোল হাত মাত্র দূরে ছিল।

লুশাই পাহাড়ে বাঘ মারার এক মজার ফন্দী দেখিয়াছিলাম। বনের ভিতর বাঘ, ভালুক চলিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। সেই সব পথের কোন্ কোন্‌টা দিয়া বাঘ বেশী যাওয়া আসা করে, লুশাইরা আগে তাহার খোঁজ লয়। তার পর সেই সব পথের ধারে ধারে যে যে খানে পাহাড়ের গা বড্ড ঢালু, সেখানে আরো বেশী ঢালু আর গর্ত্ত করিয়া দেয়। তার পর পাহাড়ের গায় রাস্তার সমান উঁচু মস্ত মাচা বাঁধিয়া, তাহাতে মাটি ফেলিয়া, ঘাস লাগাইয়া ঠিক সমান জমির মত বেমালুম করিয়া রাখে। মাচার তলায় থাকে ফাঁক, আর তাহার ঠিক নীচে, মাটিতে থাকে বড় বড় ‘বল্লম’ পোতা। সেগুলাকে ডাল-পালা দিয়া ঢাকিয়া এমনি ঝোপের মত করিয়া দেওয়া হয় যে, হঠাৎ দেখিয়া বাঘ মারা ফাঁদ বলিয়া বুঝিবার যো নাই। আর মাচার উপরে একটি কুকুর বা শূয়রের বাচ্চা এমনি ভাবে বাঁধিয়া রাখা হয় যে, মাচায় না উঠিয়া তাহাকে পাওয়া অসম্ভব।

“আকাশ ফাটিল চ্যাঁচানির চোটে”।

বাঘ মশাই ভুলিতে ভুলিতে পথ দিয়া আসেন, আর দেখিতে পান, ফলার তৈরি! বাস্! ‘হাল্লুম’ বলিয়া দে লাফ্! আর হুড়্মুড়্ করিয়া মাচা শুদ্ধ পড়্ সেই বল্লমগুলার উপরে! ফলার রহিল মাথায়, বল্লম ঢুকিল পেটে, আর আকাশ ফাটিল চ্যাঁচানির চোটে! তার পর যত ছট্‌ফটানি চলিল, ততই আরো বল্লম গায়ে বিঁধিতে লাগিল। এমনি করিয়া ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সব শেষ।

বনের ভিতরে জরিপের কাজ করিতে হইলে, সম্মুখে পিছনে দুজন লোকে নিশান ধরে, আর ঐ নিশান দেখিয়া ফিতা দিয়া মাপিয়া যায়। অনেক সময়ই কিন্তু নিশানও দেখা যায় না। তখন একখানা ছোট আয়না লইয়া চমক্ দিতে হয়।

তাহার ঝিকিমিকি তিন চার জরীপ দূরে থাকিয়াও দেখিতে পাওয়া যায়। আয়নার চমক্ দিবার সময় সম্মুখের লোকটি সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে থাকে, তাহাতে ঠিক তাহার সোজাসুজি ফিতা দিয়া মাপিয়া যাইবার সুবিধা হয়।

'ফুট্‌কিয়া' নূতন লোক; সম্মুখ হইতে চমক্ দিবার কাজটি তাহার হাতে। চমক্ দিয়াছে ঠিক, কিন্তু আওয়াজ আর দেয় না! ব্যাপার কি? সে পথে বাঘের ভয় আছে,—লোকেরা আগেই আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছিল। কাজেই আমার একটু সন্দেহ হইল, আমি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া আগে চলিলাম।

খানিকদূর গিয়াই দেখি, কাদার উপরে ফুট্‌কিয়ার পায়ের দাগ, তাহার পাশেই প্রকাণ্ড বাঘের পাঞ্জা! বাঘটা এই মাত্র গিয়াছে, তখনো চারিদিকের জল গড়াইয়া আসিয়া সেই দাগে জমিতেছে। আমি খুব চীৎকার করিয়া হাঁক দিলাম, 'ফুট্‌কিয়া!' হাত কুড়ি সম্মুখ হইতে ভাঙা গলায় আওয়াজ আসিল, 'হুজুর!' তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, যেন একটা কি জানোয়ার জঙ্গলে গা ঢাকা দিল। দৌড়িয়া ফুট্‌কিয়ার কাছে গেলাম। বেচারা রাস্তার মাঝখানে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মুখে কথাটি নাই!

"কি রে! কি হয়েছে?"

"এক্‌ঠো কোন্ জানোয়ার হামারা পিছু পিছু আতাথা। আপ্ বোলায়া ঔর, ও জঙ্গল্‌মে ভাগ গেয়া।"

"কেমন জানোয়ার ছিল রে?"

"তানি মটুকে তো থা! (বলিয়া হাত দিয়া মাটি হইতে ফুট দুই উঁচু দেখাইল)। লাল লাল ঔর কালা ভি থা। এৎনা বড়া উস্‌কা শির থা, ঔর দুম্ হিলাতা থা!"

"আরে, শের থা রে?"

"নেহি হুজুর! শের হোতা তো হাম্‌কো খা ডাল্‌তা নেহি?"

ভাল! যে প্রকাণ্ড পায়ের দাগ, আর মিনিট খানেক আমার দেরী হইলেই 'খা ডাল্‌তা' কি না, বুঝিতে পারিত! আসল কথা, ফুট্‌কিয়া কখনো বাঘ দেখে নাই!

———

(৯)

দুই জন সার্ভেয়ার কাছাড়ের বনে কাজ করিতে গিয়াছে। দুই জনই রাজপুত। ১নং সার্ভেয়ার কাজ শেষ করিয়া তাঁবুতে আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া খাইতে বসিয়াছে। চাকরটি তাহার সম্মুখেই বসিয়া খাইতেছে। মাঝখানে হাত দুই তিন মাত্র জায়গা

বেচারারা দুই গ্রাস ভাতও মুখে দেয় নাই, আর অমনি 'হালুম' বলিয়া মস্ত এক বাঘ আসিয়া, একেবারে দুই জনের মাঝখানে লাফাইয়া পড়িয়াছে। বাঘ দেখিয়া ত ভয়ে তাহারা বন্দুকের গুলির মত ছিট্‌কাইয়া পড়িল। তার পর বাপ্‌রে বাপ্‌! খাওয়া-দাওয়া সব কোথায় রহিল, দে জিনিস পত্র লইয়া পিটান।

হাতীর রাস্তা ধরিয়া প্রাণপণে তাহারা ছুটিতে লাগিল। দুই তিন মাইল গিয়াই

মান্দো ও বাঘ

তাহারা দেখিল যে, ২নং সার্ভেয়ার তাহার কাজ শেষ করিয়া তাঁবুতে ফিরিতেছে। সে তাহাদের দেখিয়া ভাবিল, বুঝি তাহাদেরও কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। তার পর যখন শুনিল, তাহারা বাঘের ভয়ে কাজ ফেলিয়া পলাইতেছে, তখন বলিল, "দেখ, এতে বড় বদ্‌নাম হবে। জঙ্গলের কাজ, জানোয়ার ত হামেশাই পাওয়া যায়। আমার কাজ শেষ হয়েছে। কাল থেকে চল, দুই জনে মিলে তোমার কাজ করি। দু'তিন দিনেই শেষ হ'য়ে যাবে, তখন সকলে এক সঙ্গে যাব। আমাদের দু'জনের

ডেরা এক জায়গায় থাক্‌লে, আমরা কুড়ি বাইশ জন লোক হব, তা হ'লে আর কোন জানোয়ার আমাদের কাছে আস্‌বে না।"

এ কথায় ১নং সার্ভেয়ার রাজী হইয়া ১নম্বরের সঙ্গে তাহার তাঁবুতে গেল। সেখানেও ভাত তৈরি; দুই দলে মিলিয়া তাহাই ভাগ করিয়া লইয়া খাইতে বসিয়াছে। এক জন খালাসীর খাওয়া হইয়া গিয়াছে; সে বেচারা ডেরার পাশেই একটা নালায় গিয়াছে, তাহার থালাখান ধুইতে,—অমনি বাঘ আসিয়া লাফাইয়া পড়িয়াছে, তাহার ঘাড়ে! কাহারও মনে হয় নাই যে, সে বেটা এই তিন চার মাইল পথ তাহাদের পিছনে পিছনে আসিবে। বাঘে ধরিতেই লোকটা চেঁচাইয়া উঠিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও এমনি চাৎকার জুড়িয়াছে, যে কি বলিব।

১নং সার্ভেয়ারের সর্দ্দার নান্দো খুব বাহাদুর লোক। ইহার আগে বর্ম্মায় দুই একবার বাঘের সঙ্গে তাহার হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। সে তখনি ধুনা হইতে একটা জ্বলন্ত বাঁশ লইয়া ছুটিয়া গিয়া, ধাঁই করিয়া বসাইয়াছে একেবারে বাঘের মাথা বরাবর এক ঘা! বাঘও সেই লোকটাকে ছাড়িয়া নান্দোকে ধরিয়া বসিতে তিলমাত্র দেরী করিল না।

নান্দো কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহার বাঁ হাত রহিল বাঘের মুখে, আর ডান হাতে সেই বাঁশ দিয়া সে দিল, বেটার নাক মুখ থ্যাঁৎলা করিয়া। বাঘ তখন বেগতিক বুঝিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া নালার ওপারে যাইতে পারিলে বাঁচে! সেই সুযোগে নান্দোও সেই লোকটিকে তুলিয়া উপরে লইয়া আসিল।

বাঘ কিন্তু যায় নাই, ওপারে বসিয়া হুম্‌হুম্ করিতেছে। সকলে গিয়া ভয়ে তাঁবুর ভিতর ঢুকিল, আর প্রাণপণে তাঁবুর দরজার ধুনাটা উস্কাইয়া দিতে লাগিল। বাঘ কি তাহাতে মানে! তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, সে সহজে ছাড়িবে কেন? নালা ডিঙাইয়া আসিয়া সে তাঁবুর চারিধারে ঘুরিতে লাগিল। এক একবার বিষম রাগে তাঁবুতে থাবা মারে, আর কি ভীষণ তাহার গর্জ্জন।

এদিকে তাঁবুর ভিতরে সবাই মিলিয়া প্রাণপণে চেঁচাইতেছে আর থালা, ঘটি, কেরাসিনের টিন যাহা পাইতেছে, তাহাই লইয়া খুব করিয়া পিটাইতেছে। এমনি করিয়া করিয়া ঢের রাত হইয়া গেল, বাঘটাও তখন একটু চুপ্ করিল। ধুনাটা ততক্ষণে নিবু নিবু হইয়া আসিয়াছে। বাঘের সাড়া শব্দ নাই; হয় ত চলিয়া গিয়া থাকিবে, এই ভাবিয়া একজন সাহসে বুক বাঁধিয়া সেই ধুনা উস্কাইয়া দিতে বাহিরে আসিল; অমনি আর যাইবে কোথায়? শয়তান বাঘ ধুনার পিছনেই বসিয়াছিল, লাফাইয়া আসিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল।

তখন সে বেচারাকে কে ছাড়ায়? কে আর ছাড়াইবে! নান্দোর হাত দিয়া তখনও দর্‌দর্‌ করিয়া রক্ত পড়িতেছে! কিন্তু তাহাতেও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই! আবার ধুনী হইতে একটা জ্বলন্ত কাঠ লইয়া, সে কসিয়া বাঘের মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিল। বাঘ নান্দোকে বেশ চিনিয়া লইয়াছে, তাই এক ঘা খাইয়া আর দুই ঘা খাইবার জন্য দাঁড়াইল না। সে বোধ হয় ভাবিল, এবার লেজ গুটাইয়া সরিয়া পড়াই ভাল।

তখন সেই লোকটিকে তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভিতরে আনিয়া, সকলে মিলিয়া চেঁচাইয়া আর থালা ঘটি বাজাইয়া রাত কাটাইল। সকালে উঠিয়াই, জিনিস-পত্র সব ফেলিয়া শুধু নক্সাগুলা লইয়া দে চম্পট! দুইদিন পরে সেখানে গিয়া দেখিল যে, বাঘ রাগে তাঁবুটা কামড়াইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়াছে। এক বস্তা চাল আর একটা 'তেপাই' ছিল, সেগুলা চিবাইয়া আর কিছু রাখে নাই। প্রথমে যে লোকটিকে বাঘে ধরিয়াছিল, সে তিন দিন পরে মারা গেল। নান্দো আর অন্য লোকটি তিন মাস ভুগিয়া ভাল হইল।

নাগপাশে বাঘ ধরা

আজকাল কোন কোন শিকারীকে বড় বড় জন্তু ধরিবার জন্য ল্যাসো (Lasso) বা দড়ির ফাঁস ব্যবহার করিতে দেখা যায়। খুব লম্বা দড়ির ডগায় এই ফাঁস তৈরি করিয়া তাঁহারা দড়ি গাছি হাতের মধ্যে গুটাইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। কাছে কোন জানোয়ার দেখিলে, দড়িটা এমন ভাবে ছুড়িয়া মারেন যে, উহার ফাঁস গিয়া তাহার গলায় আট্‌কাইবেই আট্‌কাইবে। তার পর টানাটানিতে ক্রমাগতই ফাঁস গলায় আঁটিয়া যায় আর জন্তুটাও কাবু হয়।

মেজর এলান্‌ ল্যাসো-ছোড়া বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। তিনি ল্যাসো এবং শিকলের সাহায্যে বড় বড় হিংস্র জন্তুকেও বন হইতে জীবন্ত ধরিয়া আনিয়া, পৃথিবীর নানা জায়গার চিড়িয়াখানায় চালান করেন। নিতান্ত প্রাণের দায়ে না পড়িলে কখনও বন্দুক ব্যবহার করেন না। মেজর সাহেব লিখিয়াছেন :—

"আমি যখন ক্যানাডায় ছিলাম, তখন ফ্রাঙ্ক নামে এক আনাড়ি কিছুদিন আমার সঙ্গী ছিল। একদিন স্থির করিলাম, ফাঁদ পাতিয়া নেক্‌ড়ে বাঘ ধরিতে হইবে। নেক্‌ড়ে বাঘ দেখিতে ছোট হইলেও বেজায় হিংস্র, বিশেষতঃ যখন পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে।

বনের ধারে মাটিতে খুব মজবুত করিয়া একটা খোঁটা পুতিলাম। কাছেই একটা

বেশ শক্ত চারা গাছ ছিল। তাহার ডগায় ল্যাসো লাগাইয়া ডগাটা জোর করিয়া টানিয়া নোয়াইয়া আনিয়া খোঁটার সঙ্গে বাঁধিলাম। নেক্‌ড়ের খুব প্রিয় খাদ্য—যাহার গন্ধ পাইলে সে পাগল হইয়া যায়—সেই খোঁটায় বাঁধিয়া, গাছের ডগাটির সঙ্গে এমন ভাবে একটা ফাঁস খাটাইয়া রাখিলাম যে, তাহার ভিতর দিয়া গলা বাড়াইয়া তাহাকে খাদ্য ধরিতে হইবে, আর খাদ্য ধরিয়া টানিবামাত্র চারা গাছের ডগাটি আল্‌গা হইয়া ঠিক্‌রাইয়া উপর দিকে উঠিবে।

ফাঁদ পাতিয়া আমি খুব কাছেই একটা ঘন ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর দেখিলাম, নেক্‌ড়েটা বন হইতে বাহির হইয়াছে, আর খাবারের গন্ধ পাইয়া, আস্তে আস্তে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। তার পর ক্রমে যাই একটু ভরসা হইল, অমনি একলাফে একেবারে খাবারের উপর পড়িল।

তখন ব্যাপারটা কি হইল, বুঝিতেই পার। খাদ্যে টান পড়ামাত্র গাছের ডগা আল্‌গা হইয়া একেবারে সটান সোজা! চাহিয়া দেখি, নেক্‌ড়ে মহাশয় গলায় ফাঁস পরিয়া ঐ শূন্যে ঝুলিতেছেন তখন তাহার কি ভীষণ টানাটানি আর কি রাগ!

আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া, একটা ল্যাসো ছুড়িয়া মারিলাম একেবারে নেক্‌ড়ের গায়ে। তার পর কয়েকটা মোচড়্ আর পাক দিবার পর, ল্যাসোটা তাহার গায়ে ও পায়ে এমন ভাবে জড়াইয়া গেল যে, তাহার আর নড়িবার চড়িবারও শক্তি রহিল না। তখন গাছের ডগা হইতে নামাইয়া তাহাকে মাটিতে রাখিলাম রাগে কট্‌মট্ করিয়া সে আমার দিকে চাহিতে লাগিল কিন্তু হায়, বেচারি এমনি নাগপাশের বাঁধনে পড়িয়াছে যে, কিছু করিবার যো নাই। তার পর তাহাকে কাঁধে ঝুলাইয়া তাঁবুতে লইয়া চলিলাম।

নাগপাশে নেকড়ে ধরা

যাইতে যাইতে ভাবিতেছি, এত হাঙ্গামা হইয়া গেল, কিন্তু বন্ধু ফ্রাঙ্ক তবু আসিল না কেন? বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। নেক্‌ড়ের ফাঁদ পাতিবার কি আগে,ছু

তাঁবুর কাছেই আর এক রকমের ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছিলাম—ভালুক টালুক আসিয়া সেখানে যদি পাইচারি করিয়া বেড়ায়, তবে হয় ত সেই ফাঁদে তাহাদের পা আটকাইয়া যাইতে পারে। হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদ শুনিয়া অগ্রসর হইয়া দেখি কি, ফ্রাঙ্ক বেচারি ভালুকের ফাঁদে আট্‌কা পড়িয়া চেঁচাইতেছে। নেকড়ের গর্জ্জন শুনিয়া সে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, আর সহসা ভালুকের ফাঁদে পড়িয়া বিষম আটকাইয়া গিয়াছে। কাজেই সে আর নেকড়ে ধরার মজাটি ভোগ করিতে পারে নাই।

নাগপাশে জাগুয়ার ধরা

জাগুয়ারের মত এমন হিংস্র ও ভীষণ জন্তু আমেরিকায় খুবই কম আছে। আমার এক শিকারী বন্ধু একবার ক্যালিফর্ণিয়া সহরে জাগুয়ারের হাতে এমনি নাকাল হইয়াছিলেন যে, তিনি আমাকে খুব স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেন, "ল্যাসো দিয়ে হয় ত সব জন্তুই জ্যান্ত ধ'র্‌তে পার্‌বে, কিন্তু জাগুয়ার ধরা অসম্ভব।" বন্ধুর কথা শুনিয়া আমারও জেদ চড়িয়া গেল, ল্যাসো দিয়াই জাগুয়ার ধরিতে হইবে।

একদিন কয়েকটা কুকুর ও লোকজন লইয়া জাগুয়ার ধরিতে গেলাম। অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষটা এক জায়গায় কুকুরগুলার মাথা নীচু করিয়া মাটি শুঁকিবার রকম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাহারা শিকারের গন্ধ পাইয়াছে। একটু পরেই দেখি, একটা জাগুয়ার গুঁড়ি মারিয়া মারিয়া গাছের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। অমনি সকলে চারিদিক্ ঘেরাও করিয়া কুকুর লেলাইয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ চীৎকার আর আকাশপানে বন্দুকের কয়েকটা আওয়াজ করিলাম। আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, তার পর ঠিক তাহাই হইল—জাগুয়ার তীরের মত বেগে একটা গাছে গিয়া চড়িল। আর উঁচুতে হামা দিয়া বসিয়া, আমাদের দিকে চাহিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।

আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করিলাম না; একটা ল্যাসো লইয়া ছুঁড়িয়া মারিলাম

তাহার দিকে। ল্যাসোর ফাঁসটি গিয়া পড়িল, একেবারে জাগুয়ারের গলায়! তখন দড়ির মাথাটা ধরিয়া টানিয়া, খুব মজবুত্ করিয়া একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিলাম। তার পর আর একটা ল্যাসো লইয়া জাগুয়ারটার গলায় আরও একটা ফাঁস লাগাইয়া, দড়ির মাথাটা অন্য একটা গাছে বাঁধিয়া দিলাম। দেখিতে দেখিতে তৃতীয় ল্যাসোর ফাঁসও গিয়া তাহার গলায় পড়িল। আর সেই দড়িটা ধরিয়া প্রাণপণে ক্রমাগত খালি টানের উপর টান।

ততক্ষণে জাগুয়ারটা একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। ফাঁস ছাড়াইবার চেষ্টায় একবার এ ডালে একবার সে ডালে উলট্ পালট্—কত রকমই করিতে লাগিল। শেষে এই রাগই হইল তাহার জব্দ হইবার কারণ। অবসর বুঝিয়া দড়ি ধরিয়া এমন হ্যাঁচ্কা টান মারিলাম যে, সে গাছ হইতে একেবারে ধপাস্ করিয়া আসিয়া মাটিতে পড়িল। মাটিতে পড়িয়াই গড়াগড়ি, লাফালাফি, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গর্জ্জন। ভয় হইল, বুঝি বা দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলে। হঠাৎ সুযোগ পাইয়া একটা মোটা ডাল লইয়া, একেবারে তাহার মুখের মধ্যে এড়োভাবে গুঁজিয়া দিলাম। তখন তাহার সমস্ত রাগ পড়িল, সেই ডালটার উপর। যেন সেটাকে কাম্ড়াইয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিবে! ততক্ষণে দড়িগুলা তাহার গায়ে বেশ করিয়া জড়াইয়া গিয়াছে। তাহার উপর আবার আমি করিলাম কি, চট্ করিয়া লেজটা ধরিয়া ফেলিয়া, তাহার সমস্ত শরীরটাকে ঘুরপাক্ খাওয়াইয়া আরো ভাল করিয়া দড়ির সঙ্গে জড়াইয়া দিলাম। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার তেজ সমান ভাবেই ছিল, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে দড়ির বাঁধন পড়িয়াছে—বেচারি কাবু না হইয়া করে কি!

যখন ভারতবর্ষে ছিলাম, তখন একটা চিতা বাঘ ধরিয়াছিলাম। চিতাবাঘের শরীরে বাঘের চাইতে শক্তি কম হইলেও, সে বেশী চালাক ও চট্পটে এবং জাগুয়ারের মত গাছে চড়া বিদ্যায় ওস্তাদ্। সুতরাং তাহার সঙ্গে কারবার করা বড় সাংঘাতিক।

যে চিতাবাঘের কথা বলিতে যাইতেছি, সেটা কিছুদিন হইতে একটা গ্রামে ভারি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। গ্রামের গরু ছাগল মারিয়া আর কিছু রাখে নাই। সেই গ্রামের মোড়ল, কিছু দিন আগে, বাঘের একটা ছানাকে প্রায় বাঘিনীর চোখের সম্মুখ হইতে কাড়িয়া আনিয়াছিল। আমি সেই গ্রামে গেলে পর মোড়ল আসিয়া বাঘ মারিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিল। আমি রাজি হইলাম। এ কথা প্রচার হইবামাত্র, গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া আমার কাছে হাজির।

সেই দিনই একটি লোক মহা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আসিয়া খবর দিল যে, বাঘটা কাছেই একটা বনে গাছে চড়িয়া বসিয়া আছে। এ কথা শুনিয়া আমি

আর আমার বন্ধু ব্রাড্‌লি তখনি হাতী চড়িয়া যাত্রা করিলাম; সেই লোকটি আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। যাইতে যাইতে আমাদের চোখ রহিল সব গাছের উপর—কে জানে, কোন্ গাছ হইতে বাঘটা হঠাৎ আমাদের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। একটু পরেই সে ফিরিয়া আসিয়া সম্মুখের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইল। চাহিয়া দেখি, সত্য-সত্যই বাঘ একটা গাছের দুইটা ডালের মাঝখানে বসিয়া আছে, আর আমাদের দেখিতে পাইয়াই দাঁত মুখ খিঁচাইয়া রাগে ভেংচি কাটিতেছে।

নাগপাশে চিতাবাঘ ধরা

এমন অবস্থায় চট্‌পট্ কাজ সারাই ভাল। হাতীটাকে গাছের তলায় লইয়া যাইতে বলিয়া, হাওদায় দাঁড়াইয়া আমার 'নাগপাশ' হাতে লইলাম। এটা ছিল লোহার তার আর পাট দিয়া পাকানো শক্ত একটা দড়ি। তাহার ডগায় তারের একটা ফাঁস দেওয়া—শত কামড়েও বাঘ তাহার কিছু করিতে পারিবে না। এই দড়িটা বাড়াইয়া হঠাৎ ফাঁসটা বাঘের গলায় লাগাইয়া ফেলিলাম। তার পর দুই হাতে দড়ি ধরিয়া খালি টানের উপর টান। বাঘের সঙ্গে লাগিয়া গেল আমার 'টাগ্-অব-ওয়ার'। খানিক টানাটানির পর হঠাৎ কি যে একটা ব্যাপার হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমিই জিতিলাম, কি বাঘটাই লাফাইয়া পড়িল, তাহা বলিবার যো নাই, কিন্তু চাহিয়া দেখি, বাঘ একেবারে হাওদার উপর পড়িয়াছে। ব্রাড্‌লি হাওদার এক পাশ দিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, অন্য পাশ দিয়া আমি ও বাঘ গড়াইয়া একেবারে মাটিতে!

মাটিতে পড়িয়া হঠাৎ আমার মাথাটা ঘুরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখনি লাফাইয়া উঠিয়া দেখিলাম, ফাঁসটা বাঘের গলা হইতে খুলিয়া যায় নাই, বরং আরও মজবুত্ হইয়া বসিয়াছে। আমার ভাগ্য ভাল, বাঘটা এই ঘটনায় বেজায় ভয় পাইয়া কি রকম থতমত খাইয়া গিয়াছিল। সে আমাকে শুদ্ধ হিড়্‌হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া

উর্দ্ধশ্বাসে বনের দিকে ছুটিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তখন তখনই একটা কিছু না করিতে পারিলে, বাঘ ফাঁকি দিবে। তখন দৌড়ের উপরেই একটা গাছের চারিদিকে দড়ির মাথাটা জড়াইয়া ফেলিলাম। হঠাৎ গলায় ভীষণ হ্যাঁচ্‌কা টান পড়ায় সে দাঁড়াইল। এদিকে আমিও দড়ির মাথা গাছের সঙ্গে খুব মজবুত্‌ করিয়া বাঁধিলাম।

এখন আর কি! এখন ত বাঘ আমার হাতের মুঠার মধ্যে। তার পর ল্যাসোর পর ল্যাসো ছুঁড়িয়া তাহাকে নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিলাম।

এদিকে ব্রাড্‌লির যা দুরবস্থা! বেচারি হাওদা হইতে ছিট্‌কাইয়া একটা নালায় গিয়া পড়িয়াছিল। নালায় জলের লেশমাত্র ছিল না,—শুধু কাদা। সেই কাদায় ব্রাড্‌লি এমন বসিয়া গিয়াছে যে, তাহাকে উদ্ধার করিতে আমাদের রীতিমত নাকাল হইতে হইয়াছিল। তার পর ল্যাসো বাঁধা জীয়ন্ত চিতা বাঘটাকে লইয়া যখন গ্রামে ফিরিয়া গেলাম, তখন গ্রামবাসীরা একেবারে অবাক্! আমার প্রশংসা তাহাদের মুখে আর ধরে না।

এইবার আসল বাঘ ধরার একটা ঘটনা বলিতেছি। এটা ঘটিয়াছিল অন্য এক গ্রামে। এ বাঘটা ছিল ভারী জোয়ান, আর চমৎকার দেখিতে বড়ও ছিল খুবই। বাঘটার কথা আমি ও ব্রাড্‌লি আগেই শুনিয়াছিলাম, আর শুনিয়াই স্থির করিয়াছিলাম, এটাকে যেরূপে হউক জীয়ন্ত ধরিতে হইবে।

গ্রামে গিয়া লোকেদের কাছে বাঘ ধরার প্রস্তাব করিতেই তাহারা মহা উৎসাহে আমাদের সাহায্য করিতে আসিল। বনে গিয়া একটা ভাল জায়গা দেখিয়া সকলকে লাগাইয়া দিলাম—গাছের মোটা মোটা ডাল পুঁতিয়া একটা খোঁয়াড় বানাইতে। খোঁয়াড়ের একপাশে, বাঘটা সহজেই ঢুকিতে পারে এমন একটা দরজা রাখা হইল। এই দরজার চারিদিক্ ঘুরাইয়া একটা লোহার শিকলের ফাঁস_ঠিক মালার মত করিয়া ঝুলাইয়া দিলাম। বাহিরে দরজার মুখের পাশে ঠিক মুখোমুখি দুইটা গাছে ফাঁসের দুই মাথা বেশ করিয়া বাঁধা হইল। কথা রহিল, আমি ও ব্রাড্‌লি এক এক গাছে চড়িয়া শিকল ধরিয়া বসিয়া থাকিব। খোঁয়াড়ের ভিতরে একটা ছাগল এমন ভাবে বাঁধা থাকিবে যে, ভিতরে না ঢুকিয়া বাঘ সেটাকে ধরিতে পারিবে না। তার পর বাঘ আসিয়া দরজার ভিতরে মাথাটি ঢুকাইবামাত্র, আমরা দুই দিক্ হইতে শিকল টানিয়া ধরিব! ফাঁসটা এমন ভাবে সাজান যে, বাঘ যত টানাটানি করিবে, ততই সেটা আঁট হইয়া তাহার গলায় বসিয়া যাইবে, আর তাহার গায়ে জড়াইয়া যাইবে।

খোঁয়াড় তৈরি হইলে, তাহার ভিতরে একটা ছাগল বাঁধিয়া দিলাম। তার পর অন্ধকারে কালো ওভার্‌কোট মুড়ি দিয়া, আমি ও ব্রাড্‌লি দুই গাছে চড়িয়া বসিয়া

রহিলাম। ঘটা দুই কাটিয়া গেল, তবু বাঘের সাড়া শব্দ নাই। খানিক পরেই শুনিতে পাইলাম, ছাগলটা ভয়ে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর বাঁধনের দড়িটা টানাটানি করিতেছে। কান খাড়া করিয়া, চোখ বড় করিয়া, খোঁয়াড়ের দরজার দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু বাঘ হাঁটিবার সময় কি তাহার পায়ের শব্দ হয় ?

হঠাৎ দেখি, বাঘ একেবারে খোঁয়াড়ের দরজায়—তাহার চোখ দুইটা জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে, আর সে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে। ঠিক একসঙ্গে আমি ও ব্রাড্‌লি শিকল ধরিয়া টান দিলাম। শিকলের ফাঁস গলায় লাগিতেই, বাঘটা এমনি ভয়ঙ্কর এক লাফ দিল যে, গাছ দুইটা থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহাতেই শিকলটাই বরং আরো বেশী করিয়া আঁটিয়া গেল। তারপর বাঘটা খালি লাফের উপর লাফ—টানের উপর টান! কিন্তু শিকল তবু ছিঁড়িল না; ক্রমাগত বাঁধন আঁটিতে লাগিল। আমরা প্রাণপণে শিকল ধরিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু এক একবার হাতে

নাগপাশে বড় বাঘ ধরা

এমনি টান পড়িতেছিল যে, কাহার সাধ্য ধরিয়া রাখে! একটা টানের চোটে ব্রাড্‌লি গাছ হইতে ছিট্‌কাইয়া গিয়া শিকল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। আমার ত চক্ষুস্থির! এইবার বুঝি বাঘটা ব্রাড্‌লিকে ধরিয়া ফেলে। তখন আমি আর করি কি, আমার দিকটা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া টানিতে লাগিলাম।

বাঘটার ছুটোপাটিতে খোঁয়াড়ের খানিকটা চুর্‌মার্‌ হইয়া পড়িয়া গেল। ভয় হইল, বুঝি বা এইবার শিকার পলায়ন করে! কিন্তু দেখিলাম, নাগপাশের বাঁধন ঠিকই আছে। যাহা হউক, বাঘেরও বলের সীমা আছে। ভায়া একটু কাহিল হইতেই, অমনি চট্‌ করিয়া গাছ হইতে নামিয়া, ল্যাসোর উপর ল্যাসো ছুড়িয়া, আচ্ছা করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ফেলিলাম।

তার পর আর কি, গ্রামের লোকেরা আসিয়া বাঘটাকে একটা কাঠের ডাণ্ডায় ঝুলাইয়া, মহা উল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে গ্রামে লইয়া গেল।

সুন্দরবনের গল্প

(শেষার্দ্ধ)

অজগর

সুন্দরবনের বড় বড় অজগরকে শূয়র, হরিণ, এমন কি, বাঘ পর্য্যন্ত ধরিয়া খাইতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ একটা শিকার গিলিয়া ইহারা সহজে নড়িতে চড়িতে পারে না। পাঁচ সাত দিন একই স্থানে মড়ার মত পড়িয়া থাকে। সেই সময় ইহাদিগকে সহজেই মারা যায়।

একবার কয়েকটি লোক জঙ্গলে কাঠ কাটিতে গিয়াছিল। দুপুর বেলা তাহারা একটা গাছের শিকড়ের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিল। তামাক খাইয়া কল্কে হইতে আগুন ঢালিয়া সেই শিকড়ের উপর রাখিল। কিছুক্ষণ পরে শিকড় মনে করিয়া যাহার উপর তাহারা বসিয়াছিল, তাহা হঠাৎ নড়িয়া উঠায়, তাহারা চমকিয়া উঠিল। তাহার পর একটু মনোযোগ করিয়া যখন দেখিল, তখন বুঝিল, সেটা গাছের শিকড় নহে—কোন জীবিত প্রাণী! তাহারা ভয় পাইয়া দলের আরও কয়েক জনকে ডাকিয়া আনিল। কিন্তু সকলে মিলিয়া টানাটানি করিয়াও কিছুতেই সেটাকে সরাইতে পারিল না। তখন তাহার নীচে দিয়া মোটা একটা রশি চালাইয়া খুব কসিয়া বাঁধিল এবং সেই রশির অন্য দিক্ গাছের ডালে আট্কাইয়া দিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে লাগিল: সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বালিয়া তাহার গায়ে ছেঁকা দিবারও ব্যবস্থা করিল! এইবার তড়্‌বড়্‌ করিয়া নড়িয়া উঠায়, সেটাকে টানিয়া তুলিতে তেমন বেগ পাইতে হইল না। যখন গাছের ডালে ঝুলিতে লাগিল, তখন সকলে দেখিল, সেটা একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ। শরীরে কাদা লাগিয়া শুকাইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তাহাকে সাপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই।

পেট চিরিয়া দেখা গেল, সাপটা একটা বড় শূয়র ও

দুইটা শূয়রের বাচ্ছা গিলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পেট ফুলিয়া একেবারে আইঢাই সাপের পেটের ফোলা অংশ গর্ত্তে আটকাইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তাহাকে সহজে বাহির করিতে পারা যায় নাই।

(২)

একবার সুন্দরবনের কয়েক জন সাপুড়ে ঢোলারহাটে একটা অজগর দেখাইতে আনে; সেরূপ প্রকাণ্ড সাপের কথা খুবই কম শুনিতে পাওয়া যায়। সাপটাকে একটা বড় সিন্দুকে ভরিয়া নৌকাতে করিয়া আনা হইয়াছিল। নদীর তীরেই হাট। যখন সিন্দুক হইতে তাহাকে বাহির করা হইল, তখন দেখা গেল, সাপের সর্ব্বাঙ্গে এক হাত অন্তর একটা করিয়া বেতের বাঁধন দেওয়া রহিয়াছে। তাহার তেজ কমাইবার জন্যই না কি এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সেই মূর্ত্তিমান যমকে দেখিবার জন্য হাট ভাঙ্গিয়া লোকজন আসিয়া জড় হইল। সাপুড়িয়াগণ দু'পয়সা রোজগারের আশায় সাপকে চেতাইয়া তুলিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু প্রথমটা কোন মতেই তাহার জড়তা দূর করিতে পারিল না। শেষে অনেক খোঁচাখুঁচি করায় এবং গায়ে জ্বলন্ত কাঠ চাপিয়া ধরায়, সে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া শরীর ফুলাইতে আরম্ভ করিল। এক একবার শরীর ফুলায় আর মট্ মট্ করিয়া বেতের বাঁধন ছিঁড়িতে থাকে। এতক্ষণ যেটা মড়ার মত পড়িয়াছিল, বন্ধনমুক্ত হইয়া সে ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার শরীর দুলাইবার আর লেজ আছড়াইবার রীতি দেখিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দর্শকগণের বেশীর ভাগই প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইল; সাপুড়িয়াগণও নিতান্ত কম ভয় পায় নাই। তাহাকে আবার সিন্দুকে বন্দী করিবার জন্য তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সাপটা কোন বাধা-বিঘ্ন না মানিয়া যে লোকটি নদীর ধারে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল, বিদ্যুদ্বেগে তাহার উপর গিয়া পড়িল এবং তাহাকে মুখে লইয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইল, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না; নদীতে পড়িয়া সাপটা কিছু দূরে গিয়া একবার গা ভাসাইয়াছিল, কিন্তু বন্দুক আনিতে না আনিতে সে আবার অদৃশ্য হইল।

(৩)

কোন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন:—"মহিষ শিকার করিয়া একদিন আমরা তাঁবুতে ফিরিতেছি, এমন সময় একজন লোক দৌড়াইয়া আসিয়া খবর দিল, নিকটেই নদীর

ধারে দুই শিং ওয়ালা একটা অজগর পড়িয়া রহিয়াছে। লোকটার কথায় আমাদের বিশ্বাস হইল না, তবু তাহার সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধার পর্য্যন্ত গেলাম। গিয়া দেখি, সত্য সত্যই সেখানে প্রকাণ্ড একটা 'পাহাড়ে বোড়া' কুণ্ডলি পাকাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মাথার দুই পাশে প্রায় দুই হাত লম্বা দুইটা শিং দেখা যাইতেছে!

দুই শিং-ওয়ালা সাপ

ব্যাপারখানা কি? অনেক চেষ্টার পর বুঝিতে পারিলাম, ব্যাপারখানা কি। সাপটা একটা মস্ত হরিণ গিলিয়াছিল, কিন্তু তাহার শিং গিলিতে পারে নাই। সেই শিং দুইটা মুখের দুই পাশ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্যই, দূর হইতে তাহাকে শিং-ওয়ালা সাপ বলিয়া ভ্রম হইতেছিল।"

রাতের সুন্দরবন

আমি নিজে কখনও বন্দুক ধরি নাই; কিন্তু একটি শিকারী বন্ধুর সহিত ঘুরি নাই, সুন্দরবনে এমন স্থান খুবই কম আছে। দিনের বেলা বাঘ-ভালুক মারিয়া বন্ধুটির

সখ্ মিটিত না; রাত্রিকালে গাছে চড়িয়া, অনেক সময় তিনি বড় বড় জন্তু শিকার করিতেন। একবার তাঁহার খেয়াল হইল, কোন্ প্রাণী কি ভাবে রাত্রিযাপন করে, গর্ত্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিবেন। এই উদ্দেশ্যে এমন একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া গহ্বর প্রস্তুত করাইলেন, যাহার দুই দিকে জঙ্গল, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড মাঠ এবং পশ্চাতে একটি ছোট নদী। মাঠটা এত বড় যে, মনে হইতে লাগিল, উহা যেন ঠিক আকাশে গিয়া মিশিয়াছে!

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা গিয়া গর্ত্তের মধ্যে বসিলাম। কাঁটা ডাল-পালার দ্বারা স্থানটি এমন করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল যে, সহজে কোন জন্তু যেন কাছে আসিতে বা আমাদিগকে দেখিতে না পায়, অথচ আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বত্রই চলে।

মেটে মেটে জ্যোৎস্নাতে বসিয়া আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইতে লাগিলাম। ক্রমে দশটা বাজিল; এগারটাও বাজিয়া গেল, তথাপি কোন জন্তুর দেখা নাই। ঝিঁঝিঁপোকা ডাকিতেছে, মাঝে মাঝে দুই একটা গাছের পাতা খসিয়া পড়িতেছে, সেই শব্দই কত না ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল। কোথাও একটা পাতা খড়্ খড়্ করিতেছে, আর আমরা ভাবিতেছি, এইবার না জানি কোন্ মূর্ত্তির সাক্ষাৎ মিলিবে! কিন্তু সাক্ষাৎ মিলিল না।

হঠাৎ পিছনের নদীতে ভীষণ তোলপাড়্ আরম্ভ হইল। আমরা ভাবিলাম, বুঝি বুনো মহিষের দল নদী পার হইতেছে। মহিষের ঊর্দ্ধপুচ্ছ শিংবাগান রুদ্রমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আমরা একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম! কিন্তু পিছনের দিকে ফিরিয়াই সে ভ্রম দূর হইল। কতকগুলা হরিণ জলপান করিতে আসিয়াছিল। হঠাৎ তাহাদের একটাকে ধরিয়া দুই কুমীরের লড়াই বাধিয়াছে; তাই এই ভয়ঙ্কর ঝাপ্ঝাপ্ শব্দ। উঃ! সে কি ভীষণ লড়াই! যাহাকে লইয়া এত মারামারি কাম্ড়াকাম্ড়ি, সে বেচারার সকল কষ্ট-যন্ত্রণা অনেক পূর্ব্বেই ফুরাইয়াছে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যখন যুদ্ধের অবসান হইল, তখন দেখা গেল, একটা কুমীর মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে একবার ভাসিতেছে, আবার ডুবিতেছে!

ঘাস, পাতা, শাক-সবজী খাইয়া যাহারা জীবনধারণ করে, সে সব জন্তু সাধারণতঃ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জলপান শেষ করিয়া নিজ নিজ বাসায় গিয়া আশ্রয় লয়। এই হরিণের দল বোধ হয় কোন কারণে ভয় পাইয়া এতক্ষণ নদীর ধারে আসিতে পারে নাই।

ভয়ের কারণ সেখানে নাই কখন্? কুমীরের লড়াই দেখিয়া আমরা ফিরিয়া বসিলাম। সহসা মাঠের দিক্ হইতে একটা ডুপ্‌দাপ্ শব্দ আমাদের কানে আসিল।

চাহিয়া দেখি, মাঠের এ পাশ দিয়া একদল হরিণ ছুটিয়াছে, আর একটা কি জানোয়ার তাহাদের পিছু লইয়াছে। জন্তুটা যে রকম মাটির সঙ্গে মিশিয়া গুঁড়ি মারিয়া চলিতেছে তাহাতে বাঘ কিংবা চিতা বলিয়া সন্দেহ হইল। অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। শিকারী ঘড়ি খুলিয়া দেখেন তখন রাত্রি প্রায় একটা।

এই সময় দুইটা পেঁচার ক্যাচ্‌ক্যাচানি সমস্ত বনটা যেন জাগাইয়া তুলিল। পেঁচার ডাক কোন অমঙ্গলের পূর্ব্বাভাস কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু সেটা যে ভয়ানক কর্কশ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিনটার পর কিছু দূরে একটা বাঘের ডাক শুনা গেল। বন্দুকটা এতক্ষণ গহ্বরের দেওয়ালের গায় দাঁড় করান ছিল, বন্ধু উহা হাতে তুলিয়া লইলেন। সে রাত্রে সখ্ মিটাইবার জন্য প্রাণিবধ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; তবে আত্মরক্ষার্থ কোন আয়োজনেরই তিনি ত্রুটি করেন নাই। বাঘটা কোন গতিকে সন্ধান পাইয়া যদি আমাদের ঘাড়ে পড়িবার উপক্রম করিত, তাহা হইলে তিনিও তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়া ছাড়িতেন না।

এই বার কাছেই একটা খড়্ খড়্ শব্দ হইল। আমরা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সাপ নয় ত? কিছু পরে সেই স্থান হইতে একটা সজারুকে বাহির হইতে দেখিয়া আমাদের সাপের ভয় ঘুচিয়া গেল।

আমরা বসিয়াই আছি—মনে হইল, দূরে আকাশের গা ঘেঁসিয়া ছায়ার মত কি যেন একটা জন্তু ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। বেশ বড় জন্তু। মহিষ হইলেও হইতে পারে, গণ্ডার হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ঠিক কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

আরও কিছুক্ষণ কাটিল; আমরা এক দৃষ্টে চাহিতে চাহিতে দেখিলাম, একটা কি জানোয়ার মাঠের দিক্ হইতে আমাদের দিকে আসিতেছে। শূয়র নয়ত? না, সে রকম মনে হয় না। তবে কি বাঘ? না, বাঘও নয়। এ যে দেখি একটা ভালুক। খুব বড় ভালুক নয়, এখনও মায়ের সাথে সাথে ফিরে। ভালুক বড় নকুলে জন্তু। খুব স্ফূর্ত্তিবাজ! সে বেশ নাচিতে নাচিতে বুড়ো খোকাটির মত আসিতেছে। আর মাঝে মাঝে থামিয়া, পিছনে চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিতেছে।

একটা বাঘ যে লুকাইয়া এতক্ষণ তাহার অনুসরণ করিতেছিল, বেচারা তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে যখন আমাদের নিকট হইতে আন্দাজ ত্রিশ হাত দূরে, তখন ডান দিকের একটা ঝুপি সহসা আন্দোলিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বাঘটা ঝপাং করিয়া লাফাইয়া ভালুকের ঘাড়ে পড়িল। এ অত্যাচার সে সহ্য করিবে কেন?

হাজার হউক, সে ত ভালুকেরই ছানা! চীৎকারে বন কাঁপাইয়া সে-ও আপনার নখ ও দাঁতের সদ্ব্যবহার করিতে ছাড়িল না।

যুদ্ধ চলিয়াছে, এমন সময় 'গাঁক্' 'গাঁক্' শব্দে হুঙ্কার ছাড়িয়া প্রকাণ্ড এক ভালুক আসিয়া উপস্থিত। বোধ হয়, ঐ ছানাটিরই মা। এইবার বাঘের ভালুক-ছানা খাইবার সাধ মিটিবে।

বাঘও ছানাটাকে ছাড়িয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাগে ভালুকেরও সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে! তার পরই যুদ্ধ। সে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড। বাঘের প্রধান অস্ত্র—দাঁত ও নখ, ভালুকও এই দুই মহাস্ত্রে বঞ্চিত নহে; অধিকন্তু বুকে চাপিয়া শ্বাস-রোধ করিয়া শত্রুবিনাশ করিতে সে অদ্বিতীয়। বাঘের প্রত্যেক আক্রমণ ভালুকের গুচ্ছ গুচ্ছ লম্বা লোমে আট্‌কাইয়া প্রতিহত হইতেছে অথচ ভালুকের একটি আক্রমণও ব্যর্থ যাইতেছে না। সে বাঘের সর্ব্বাঙ্গ চিরিয়া ছিঁড়িয়া 'ফাঁই' 'ফাঁই' করিতেছে। বাঘ রুখিয়া গর্জ্জিয়া ভালুকের মাথায় কামড় বসাইতে চায়। ভালুক চীৎকারে আকাশ ফাটাইয়া বাঘকে বুকে চাপিয়া ধরে। একবার বাগে পাইয়া বাঘ এক লাফে ভালুকের পিঠের উপর চড়িয়া বসিল। আমরা ভাবিলাম, এইবার তাহার দফা সারা। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই দেখা গেল, ভালুক চিৎ হইয়া পড়িয়া বাঘকে মাটিতে চাপিয়া মারিবার উপক্রম করিতেছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত হার-জিত দুই পক্ষেই সমান।

যুদ্ধের শেষ দিকটায় গর্জ্জন আর আস্ফালন যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল! একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য দুইটাতেই ক্ষেপিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তখন আর কোনটার সামর্থ্যে কুলাইতেছে না। রক্তের কাদাতে মাঝে মাঝে তাহারা পিছ্‌লাইয়া পড়িতে লাগিল।

ক্রমে পূর্ব্বদিক্ পরিস্কার হইতেছে দেখিয়া, ভালুক নেংচাইতে নেংচাইতে জঙ্গলে ঢুকিল। আর বাঘ মাটিতে লুটাইয়া যন্ত্রণায় ধড়্‌ফড়্ করিতে লাগিল। আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া বন্ধুকে বলিলাম, "বেচারার শ্বাসরোধ হ'য়ে আস্‌ছে, এইবার এক গুলিতে শেষ ক'রে দাও!" বন্ধু বলিলেন, "মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন?"

বাঘের গঙ্গাপ্রাপ্তি

কয়েকজন সাহেব জাহাজে চড়িয়া সুন্দরবন দেখিতে গিয়াছেন। জাহাজখানি রায়-মঙ্গল নদীতে নঙ্গর করিয়াছে; সাহেবেরা একখানি ছোট ষ্টীমবোটে করিয়া একটা

খালে ঢুকিয়াছেন! প্রায় সমস্ত দিন নালায় নালায় ঘুরিয়া, বিকাল বেলায় একটি ছোট নদীতে আসিয়া তাঁহাদের বোট্ থামিল।

নদীর অপর পারে 'কয়েকটা শূয়র-ছানা তাহাদের মায়ের সঙ্গে সঙ্গে মাটি খুঁড়িয়া বেড়াইতেছে। জলে অনেকগুলা কুমীর নাক জাগাইয়া রহিয়াছে।

হঠাৎ একটা বাঘ ঝোপের ভিতর হইতে লাফ দিয়া আসিয়া, একটা শূয়র-ছানাকে ধরিয়া লইয়া গেল: তাহাতে অন্য ছানাগুলি চ্যাঁচাইয়া আকাশ ফাটাইতে লাগিল। তাহার পরের মুহূর্ত্তেই বিশাল এক বরাহ, বন হইতে আসিয়া বাঘের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। বাঘও তখন শূয়র-ছানা রাখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। খানিক

বাঘে ও শূয়রে লড়াই

এ উহার দিকে তাকাইয়া আছে, কোনটাই কিছু বলে না। তার পর বাঘ ঘন ঘন লেজ নাড়িতে নাড়িতে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বরাহও রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া তাহার উত্তর দিল।

বাঘের চেষ্টা, বরাহের পিছনে গিয়া তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে; কিন্তু বরাহ তাহা করিতে দিবে কেন? বাঘ যতই তাহার পিছনের দিকে ঘুরিয়া যাইতে

চায়, সে ততই তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়। এই ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে যেই দুইটাতে কাছাকাছি হইয়াছে অমনি বরাহ তীরের মত ছুটিয়া বাঘকে মারিতে গেল। বাঘও তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভয়ঙ্কর এক থাবা মারিল। সে চাপড় পিঠে পড়িলে, তাহার পিঠই ভাঙিয়া যাইত, কিন্তু বরাহ তাহা কাঁধ পাতিয়া লওয়াতে তাহার কিছুই হইল না; কেন না, তাহার সে জায়গাটা লোহার মত মজবুত্। এই গোলমালে বাঘ একটু অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছিল; সেই হইল বরাহের সুযোগ। সে আর বাঘকে সাম্‌লাইতে না দিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার পেটে দাঁত বসাইয়া দিল। সেই যে দাঁত বসাইল, বাঘ আর কিছুতেই তাহা ছাড়াইতে পারিল না। সে প্রাণপণে বরাহকে আঁচড় কামড় দিতে লাগিল বটে, কিন্তু বরাহ তবুও তাহার সমস্ত শরীর ছিঁড়িয়া ফালি ফালি না করিয়া ছাড়িল না। বাঘ মরিয়া গিয়াছে তথাপি তাহাকে ছাড়ে না; শেষে বরাহ চলিয়া গেল। তখন দলে দলে কুমীর আসিয়া বাঘটাকে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

বেলা শেষ হইয়া আসিল, সাহেবেরাও তাড়াতাড়ি বোট্ ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহারা খানিক দূরে আসিয়াছেন, এমন সময়ে অনেকগুলা শূয়র-ছানা ছুটিয়া আসিয়া প্রাণপণে সাঁত্‌রাইয়া নদী পার হইতে আরম্ভ করিল। অমনি দেখা গেল যে, চারিদিক্ হইতে কুমীরেরা তাহাদিগকে খাইবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। পরের মুহূর্তেই একটা ছানা চ্যাঁচাইয়া উঠিল আর তাহাকে দেখা গেল না। আর একটার পিছনের ঠ্যাং ধরিয়া সাহেবের আর্দ্দালী তাহাকে বোটে তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কুমীরও জলের ভিতর হইতে মাথা ভাসাইয়া হাঁ করিয়া সেটাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু নাগাল পাইল না। লাভের মধ্যে সাহেবদের বন্দুকের গুলিতে তাহার নাক উড়িয়া গেল। ছানাটা যতই চেঁচায়, কুমীরগুলাও ততই ক্ষেপিয়া যায়। শেষে একটা একেবারে বোটের ধারে মাথা তুলিয়া, হাঁ করিয়া একজন খালাসীকে খাইতে আসিল। সাহেবেরা তৎক্ষণাৎ গুলি না মারিলে তাহাকে খাইয়াই ফেলিত। তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া আর সব কুমীরের উপর গুলি চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহারা ভয় পাইল না। একটা ত আসিয়া এক কামড়ে একজনের বন্দুকই কাড়িয়া লইল। বাস্তবিক, সে দিন সাহেবদের একটু বেগতিকই হইয়াছিল; হঠাৎ বুদ্ধি না জোগাইলে শেষে কি হইত, কে জানে! কোন মতেই কুমীরগুলাকে তাড়াইতে না পারিয়া, শেষে তাঁহারা অনেকটা কেরাসিন তেল বোটের চারিদিকের জলে ঢালিয়া দিলেন। কুমীর মহাশয়দের চোখ দুটি থাকে ঠিক জলের সামনে সামনে। কাজেই দেখিতে দেখিতে সেই কেরাসিন তেল তাঁহাদের চোখে গিয়া ঢুকিল। এমন ঔষধ আর কখনও

তাঁহারা চোখে দেখেন নাই, এমনি চিড়্‌বিড়ে মজাও বোধ হয় আর জীবনে কখনও পান নাই। শূয়র খাওয়ার সখ ত মিটিলই, তখন তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলাইতে পারিলেই তাঁহারা বাঁচেন। ইহার পর সেদিন সাহেবদের আর কোন বেগ পাইতে হয় নাই, তাঁহারা ভালয় ভালয় জাহাজে আসিয়া পৌঁছিলেন।

সিংহের মুখে

আমার নাম হ্যারি ব্যাঙ্ক্‌স্‌। কেপ্‌-কলোনি হইতে কাইরো পর্য্যন্ত যে টেলিগ্রাফের লাইন খোলা হইতেছে, দশ মাস আগে আমি তাহাতে চাকুরী করিতাম। আমার কাজ কি রকম ছিল বলিতেছি। একদল কাফ্রী কুলী লইয়া দুইজন সাহেব জঙ্গলের বড় বড় গাছগুলি কাটিয়া অগ্রসর হইতেন। দ্বিতীয় আর একদল আসিয়া খুঁটি পুতিয়া তাহাতে তার খাটাইয়া যাইত। আমি আর ড্যান্ এই দুইজন ছিলাম প্রথম দলে।

যে জঙ্গলে আমাদের কাজ করিতে হইত তাহা ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট্‌ নায়েঞ্জা নামক হ্রদদ্বয়ের নিকটবর্ত্তী। সে জঙ্গল পৃথিবীর আদিম জঙ্গল বলিলেই হয়। সৃষ্টির পর হইতে তাহাতে মানুষের পা পড়িয়াছে কি না সন্দেহ।

জঙ্গলের মধ্যে কতকটা জমি পরিষ্কার করা হইয়াছিল। এই ফাঁকা জায়গার একপাশে আমার ঘর, আর এক পাশে ড্যানের ঘর। গাছের কচি কচি ডাল বোনা, তার উপর মাটির লেপা, এই ছিল আমাদের ঘরের দেওয়াল। দরজায় এক একখানি ঝাঁপ থাকিত; হয় বাঁধা থাকিত, না হয়, শুধু হেলান থাকিত। কুলীরা যে যেখানে সুবিধা পাইত, ঝোপে-ঝাপে পড়িয়া রাত্রি কাটাইয়া দিত।

একদিন ড্যান্ আর আমি শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলাম। আমরা সহরের লোক—হাত তেমন ঠিক নয়, তাই শুধু হাতে ফিরিতে হইল। রাত্রে দুই জনে একত্র বসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিলাম, দেশের অনেক গল্প করিলাম, শেষে পরস্পরের কাছে বিদায় লইয়া আমরা আপন আপন ঘরের দিকে চলিলাম।

সেই মাঠ-টুকুর মাঝখান দিয়া যখন আমি নিজের ঘরের দিকে যাইতেছিলাম, তখন কি ভয়ানক অন্ধকার। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহাতে আফ্রিকার সেই জঙ্গল। আমাদের তাঁবুর আগুনটা এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহাতে কুলীদের ঘরগুলি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে—হাত্ড়াইতে হাত্ড়াইতে গিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিলাম। মোমবাতি জ্বালাইয়া একটা বোতলের মুখে বসাইলাম। বোতলটা একটা পিপের উপর রাখিয়া উহা টানিয়া খাটিয়ার কাছে আনিলাম। সেটি ক্যাম্বিসের খাট, মোড়া থাকিত। খুলিয়া বিছানা করিলাম, তখন রাত্রি আন্দাজ সাড়ে এগারটা।

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া মশারির ভিতর ঢুকিলাম। কয়েকদিন আগে 'রাণারের' ডাকে দেশের খবরের কাগজ আসিয়াছিল, শুইয়া শুইয়া তাহাই পড়িতে লাগিলাম। আধ ঘণ্টাখানিক পড়িয়া কাগজখানি পায়ের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। মশারির ভিতর হইতেই ফুঁ দিয়া বাতি নিভাইয়া দিলাম, তৎক্ষণাৎ ঘুম আসিল।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না, ঘুম ভাঙ্গিতেই টের পাইলাম, খাটিয়ার তলায় কি একটা আমার পিঠ ঠেলিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। আমি চিৎ হইয়া শুইয়াছিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, যেই ঘুম ভাঙ্গিল, অমনি বুঝিতে পারিলাম, সেটা সিংহ। আর অমনি ভাবনা আসিল যে, আমার কি দশা হইবে!

তখন আমি বেশ জাগিয়াছি, সকল ইন্দ্রিয় সচেতন হইয়াছে। কিন্তু বাক্শক্তি একেবারে নাই; একটুও সাড়া দিতে, কি কথা কহিতে পারি না। মনে প্রথম চিন্তা এই হইল, 'হায়, আমার মা-বাপ ত জানিবেন না যে, আমার দশা কি হইয়াছে, তাঁহাদের কাছে কি করিয়া খবর যাইবে?'

স্বপ্নের মত মনে পড়িতে লাগিল, পুস্তকে পড়িয়াছিলাম বাঘ বা সিংহের মুখে পড়িলে মানুষের বেদনা অনুভবের শক্তি থাকে না; যখন ছিঁড়িয়া খায়, তখনও না কি লাগে না। আমার মাথাটা কেমন এক রকম ঘোর হইয়া আসিতে লাগিল; যেন ঝিমাইতে ঝিমাইতে ভাবিতে লাগিলাম, এটা কি আমাকে খাইবে? আমার কি তখন লাগিবে? আমার তখনকার মনের অবস্থা কেন্ডর বলা যায় না।

এ সকল বলিতে এতক্ষণ লাগিতেছে, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই, বিছানার যে পাশ ঘেঁসিয়া আমি শুইয়াছিলাম, তাহার অপর পাশে প্রকাণ্ড একটা সিংহ আসিয়া দাঁড়াইল। গভীর অন্ধকারের মধ্যে, খানিকক্ষণ দুইটি বড় বড় জ্বল্জ্বলে চোখ আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। খানিকক্ষণ শুধু তাকাইয়া রহিলাম; দৃষ্টি স্থির, যেন কিছু অভিসন্ধি নাই। তাহার সেই দৃষ্টিতে আমার রক্ত হিম হইয়া যাইতে লাগিল।

আমি বুঝিলাম সেটা মানুষখেকো সিংহ। বুড়ো হইয়া যখন সিংহের দাঁত ভোঁতা হইয়া যায়, পায়ে অস্থি-সন্ধিতে খিল ধরে, ছুটিয়া বনের হরিণ প্রভৃতি ধরিতে পারে না, বেচারা মানুষের উপর তখন তাহার দৃষ্টি পড়ে। তাহা না হইলে এমন করিয়া মানুষের ঘরে সিংহ কোন দিন ঢোকে না।

সেই চোখ দুইটি একবার আমার মশারির এমুড়্ হইতে ওমুড়্ পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল। সর্ সর্ করিয়া তাহার গোঁপ মশারির নেটে' ঠেকিতে লাগিল, তাহাতে সে একবার থমকিয়া গেল, কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ নহে। হঠাৎ একবার ঘোঁ করিয়া উঠিল, আর অমনি মশারি ঠেলিয়া মাথা ঢুকাইয়া দিল। মশারি শুদ্ধ আমার বাঁ কাঁধে কামড় দিয়া টানিয়া আমাকে ঘরের মেঝেতে নামাইল। থাবা দিয়া মশারিটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। আমার উপর চাপিয়া বসিয়া, সাম্‌নের পা দুখানা আমার বুকের উপর রাখিল। উঃ, সিংহটা কি ভীষণ ভারী! সাম্‌নের পা দুখানাই কত ভারী।

সেই অবস্থায় কয়েক সেকেণ্ড চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিলাম। স্বপ্নের মত কত কি কথা মনে আসিতে লাগিল। সিংহটা দুই এক মিনিট কান পাতিয়া কি যেন শুনিল, তার পর গা'টা একটু উঁচু করিল, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। মাথাটা পিছনে একটু হেলাইয়া সে এমন এক গর্জ্জন করিল যে, আমার ঘরখানা কাঁপিতে লাগিল!

বাহিরে তখন গোলমাল হইতেছে; আমি শুনিতে পাইলাম, ড্যান্ কুলীদের নাম ধরিয়া ডাকিল, কাহারও সাড়া পাইল না। তার পর চ্যাঁচাইয়া বলিল, "ওরে আলো আন্।" কেহ আলো আনিল না। তখন সে অন্ধকারে হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে আমার ঘরের দিকে আসিতে লাগিল। চ্যাঁচাইয়া বলিল, "হ্যারি, হ্যারি, দোহাই ঈশ্বরের, একবার কথা কও! কি হ'য়েছে হ্যারি, কি হ'য়েছে?" কিন্তু আমি এক বর্ণও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না।

এতক্ষণ সিংহটা কি করিতেছিল? যাহা করিতেছিল, তাহা সিংহের পক্ষে একটু নূতন ধরণের। মানুষের গোলমাল শুনিলে সিংহ সচরাচর শিকার ছাড়িয়া চলিয়া যায়; এটা কিন্তু তাহা করিল না। খানিকক্ষণ ঘর্ ঘর্ শব্দ করিল, আর তাহার দুর্গন্ধ নিঃশ্বাসটা আমার নাকে মুখে আসিতে লাগিল, আমার নাড়ীশুদ্ধ পাক দিয়া উঠিল; জানই ত সিংহ পচা মাংস খায়।

ঘর্ ঘর্ শব্দটা আহার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বাভাস মাত্র। একটু পরেই সিংহটা আমার ডান পায়ের ডিমে চাপিয়া দাঁত বসাইয়া দিল, আর ভয়ঙ্কর জোরে রক্ত শুষিতে লাগিল। বাঁ পায়ের ডিমেও কামড় দিল। তার পর এমনি করিয়া এক একটি নরম জায়গায় দাঁত বসাইতে ও রক্ত শুষিতে লাগিল। তাহার এক একটা দাঁত দুই ইঞ্চির কম লম্বা নয়। চোয়ালের জোর এমন যে, কড়ি কাঠ চিবাইয়া ভাঙিতে পারে। কিন্তু সে আমার একটি হাড়ও ভাঙিবার চেষ্টা করিল না। আমাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টাও করিল না।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ যে, এমন কামড় খাইয়াও কি আমার একটু লাগিল না? সত্যই, একটুও লাগে নাই। আমার কেমন এক রকম অদ্ভুত অবস্থা হইল—দাঁত ফুটিবার শব্দও শুনিতে পাইতেছিলাম; মাংসের মধ্যে দাঁত ঢুকিতেছিল, তাহাও

"এক লাফে আমাকে লইয়া বাহিরে আসিল।"—১৪২ পৃষ্ঠা

টের পাইতে ছিলাম, তবু একটুও লাগিতেছিল না। ক্লোরোফরম করিলে যেমন লাগে না, ইহা তেমনি। অথচ জাগিয়াছিলাম। বুঝিতেছিলাম, খুব গভীর ক্ষত হইতেছে,

কিন্তু আবার মনে হইতেছিল, তবু আমি মরিব না। আমার রক্ত যতই কমিয়া আসিতে লাগিল, মাথাটা ততই বিকারের রোগীর মত এলোমেলো হইতে লাগিল।

যাহা হউক, ততক্ষণে ড্যান্ আমার ঘরের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সিংহটা তাহার পায়ের শব্দ শুনিয়া একবার মাথা তুলিল। টপ্ টপ্ করিয়া আমারই গরম রক্ত তাহার মুখ বাহিয়া আমার গায়ে পড়িল। তখন ড্যান্ আমার উত্তর না পাইয়া অস্থির হইয়া দরজা হাতড়াইতেছে। হঠাৎ সিংহটা এক হুঙ্কার ছাড়িল। অমনি দেখি, আমি শূন্যে উঠিয়াছি! আমার উরুতে কামড় দিয়া আমাকে মুখে করিয়া সিংহ লাফ দিয়াছে। সাঁ সাঁ করিয়া শূন্যে উড়িয়া চলিলাম! এক লাফে সে আমাকে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। দরজার ঝাঁপখানি টক্কর লাগিয়া ছট্‌কিয়া পড়িল। সিংহের পা যখন মাটি ছুঁইল, তখন আমার খুব ঝাঁকানি লাগিল। মাটিতে পড়িয়াই সে ছুট দিল। জঙ্গলে ঢুকিল না, জঙ্গলের কাছে একটা বড় গাছের তলায় আমাকে ফেলিয়া আবার আমার বুকে সামনের পা দিয়া বসিল। যেন দেখাইতে চায়, আমি নিতান্তই তাহার সম্পত্তি।

এতক্ষণে ড্যানের চেষ্টায় কতকগুলি, কুলী মশাল লইয়া আসিতেছে। এই প্রথম অন্য আলো আমার চক্ষে পড়িল। এতক্ষণ কেবল সিংহের উজ্জ্বল চোখ দুইটিই জ্বলিতেছিল, তাহার তেজ কখনও কমিতেছিল, কখনও বাড়িতেছিল।

ড্যান্ তখন পাগলের মত অস্থির। কি জানি কেন, একবার আমার ঘরে ঢুকিল; তার পর চীৎকার করিতে করিতে আমার দিকে দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কুলীদের আলোগুলি ভূতের মতন নাচিয়া নাচিয়া আসিতে লাগিল।

সিংহটা তখনও দ্বিতীয়বার আমার রক্তপান করিতে আরম্ভ করে নাই। এই সব ব্যাপার দেখিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া আছে। ড্যান্ যখন আমার কাছে আসিয়া পৌঁছিল, শুনিয়াছি, তখন নাকি আমার কথা ফুটিল; আমি না কি কাতরস্বরে বলিলাম, "ড্যান্ ভাই! আমায় বাঁচাও! আমায় বাঁচাও!" ড্যান্ আমার স্বর শুনিয়া প্রাণের মায়া ছাড়িল। বন্দুকের নল প্রায় সিংহের গায়ে ঠেকাইয়া, ঘোড়া টানিল। কি সর্ব্বনাশ! বন্দুকে আওয়াজ হইল না। ড্যান্ তখন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, বন্দুকের নল দুই হাতে ধরিয়া, প্রাণপণ শক্তিতে সিংহের মাথায় বাঁটের এক ঘা মারিল। বন্দুক ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। সিংহের বোধ হয়, মশার কামড়ের সমানও লাগিল না।

তখন সে ছুটিয়া আমার ঘরে গেল। আমার ভরা বন্দুক লইয়া হরিণের মত ছুটিয়া আসিল। সিংহটা তখন কুলীদের দিকে তাকাইয়া রাগে গোঁ গোঁ করিতেছে।

ড্যান্ খুব কাছে আসিয়া, সিংহের কানের গোড়াতে বন্দুক ধরিয়া আওয়াজ করিল। তাহার মাথার খুলি উড়িয়া গেল! কাত্ হইয়া সে ধুপ্ করিয়া আমার উপর পড়িয়া গেল! শুনিয়াছি, আমিও না কি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সেই রক্তাক্ত শরীরে এক শ' গজ আন্দাজ দৌড়িয়া গেলাম; পরে অচেতন হইয়া ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেলাম!

ড্যান্ আমাকে তুলিয়া লইল; একটা বড় রবারের টবে গরম জল রাখিয়া, তাহাতে আমাকে ফেলিল। উঃ, কি বিষম যন্ত্রণা! আমার গায়ের মাংস ঝুলিয়া খসিয়া পড়িতেছিল; তাহাতে গরম জল লাগিবামাত্র যে যন্ত্রণা হইতে লাগিল, বোধ হয়, নরকের আগুনের জ্বালাও তাহার চাইতে কম! যেমন অসহনীয় যাতনা, তেমনি আমার অমানুষিক চীৎকার। আমার বিকট শব্দে কুলীরা ভয়ে পলাইয়া গেল। তাহারা ভাবিল, আমি এখনই মরিব। আমি ভাবিলাম, শীঘ্র মরিলেই বাঁচি! আত্ম-হত্যা করিব বলিয়া হাত্ড়াইয়া পিস্তল খুঁজিতে লাগিলাম, ড্যান্ আমায় ধরিয়া রাখিল।

এই বিপদের সময় ড্যানের মত এমন বিশ্বাসী বন্ধুও কাহারও হয় না, আবার এমন আহাম্মক ও দুইটি দেখা যায় না। সারারাত্রি সে আমার কাছে বসিয়া বসিয়া কাঁদিল। আর আমাকে বোতল বোতল হুইস্কি খাওয়াইল। যেন হুইস্কিই সকল যন্ত্রণার ঔষধ!

আমাদের ওখান হইতে সাত শ' মাইল দূরে একজন মিশনারী ডাক্তার ছিলেন। হ্রদে একখানি ষ্টীমার চলিল; সেই ষ্টীমার ডাক্তারের গ্রামে যায় কিন্তু আমাদের ওখানে আসিতে তখনও চারিদিন বিলম্ব আছে। এদিকে আমার অবস্থা প্রতি ঘণ্টায় অধিক খারাপ হইয়া আসিতেছে। বিষে সমস্ত শরীরের ঘা পচিয়া উঠিতে লাগিল। বলিতে গেলে, আমার সমস্ত গা টাই একখানা ঘা!

কেমন করিয়া সে চারিদিন কাটিল, কেমন করিয়া আমাকে ষ্টীমারে তোলা হইল, কেমন করিয়া সেই ডাক্তারের কাছে গিয়া পৌঁছিলাম, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। আমার চেহারা দেখিয়া ডাক্তার মহাশয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইবার যো হইয়াছিল!

আমার ঘা এমন পচিয়া উঠিল যে, আমাকে গ্রামের বাহিরে একটি কুটীরে রাখা হইল। আশ্চর্য্য এই যে, সেখানকার বাতাসে আমার ঘা শুকাইতে লাগিল। ক্রমে আমি সারিয়া উঠিতে লাগিলাম। এই সময়ে এক একদিন রাত্রিতে সেই রাত্রির সব ব্যাপার স্বপ্নে দেখিতাম, চীৎকার করিয়া উঠিতাম, সর্ব্বশরীর ঘামে ভিজিয়া যাইত, আমাকে বিছানায় চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে হইত।

ভাল হইয়া আমি ইংলণ্ডে চলিয়া আসিলাম। এখানে আসিবার পর হইতে সপ্তাহে তিন পাউণ্ড করিয়া পেন্সন পাইতেছি। আমার বাঁ হাতের আঙুলের মধ্যে

কেবল বুড়ো আঙুলটি আছে, আর গুলি গিয়াছে। সিংহের দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস যখন আসিতেছিল, তখন আমি মুখ ঢাকিব বলিয়া, দুই একবার হাত তুলিয়াছিলাম। সিংহটা তখন কামড়াইয়া আমার আঙুলগুলি কাটিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া আর কোন অঙ্গহানি হয় নাই। সবশুদ্ধ সিংহের মুখে আমি তের মিনিট ছিলাম।

সিংহে মহিষে

হাতীর দাঁতের ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ; কিন্তু তাহা সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে। আমার এক কাকা সেই ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া তাঁহাকে হস্তীদন্ত সংগ্রহ করিতে হইত। এ কার্য্যে তাঁহার তিন চারিজন সহকারী ছিল। একবার দেশে আসিয়া তিনি আমাকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার কয়েক দিন পরে, একদিন কাকা বলিলেন, "চল, সিংহ দেখে আসি। সুবিধা হয় ত শিকার করাও যাবে।"

দুইজনে সাজ্‌গোচ্‌ করিয়া, পাঁচটি চাকর সঙ্গে লইয়া, দুপুর বেলা বাহির হইলাম। চাকরদের মধ্যে একজন, কোন্‌খানে সিংহ থাকার সম্ভাবনা, সব জানিত। সে আমাদের পথপ্রদর্শক হইল। কিন্তু তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়াও সিংহের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ছোট ছোট পাহাড় ও আশ-পাশের বন-জঙ্গল খুঁজিতে খুঁজিতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল। আমরা হতাশ হইয়া পড়িলাম।

চাকরটা দূরে একটা ছোট পাহাড় দেখাইয়া বলিল, "ঐ খানে একটা জলা জায়গা আছে, বুনো মোষ সেই জলায় প্রায়ই থাকে, কাছাকাছি সিংহও থাক্‌তে পারে; চলুন, দেখা যাক্‌।"

পাহাড়ের কাছে আসিয়া তাহার নীচে দিয়া আমরা চলিতেছিলাম, কিন্তু চাকরটা নিষেধ করিল, কেন না সেই দিকে বন্য মহিষের ভয়। সুতরাং তাহার কথামত আমরা পাহাড়ের উপরে উঠিয়া, জলার দিকে যাইতে লাগিলাম। ক্রমে জলাটা আমাদের দৃষ্টিতে পড়িল। দেখিলাম, কাদায় গা ডুবাইয়া দুইটা মহিষ শুইয়া আছে। আর একটা কাদা মাখিয়া পাহাড়ের গা দিয়া দিয়া বনের দিকে যাইতেছে। হঠাৎ পাশের বন হইতে মস্ত একটা সিংহ বাহির হইল এবং একেবারে মহিষটার সাম্‌নাসাম্‌নি আসিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। সিংহ বোধ হয় পিপাসা দূর করিবার জন্য

জলার দিকে আসিতেছিল; আর বিকাল হইয়াছে, তাহার ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়া থাকিবে। সুতরাং সম্মুখেই হৃষ্টপুষ্ট রসাল খাদ্য দেখিয়া সে যে উৎসাহে কেশর ফুলাইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

মহিষটা একমনে গোঁ হইয়া চলিতেছিল। সিংহকে সামনে দেখিয়া সে কিছুমাত্র ভয় পাইল না, বরং ভোঁস্ ভোঁস্ করিয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবার ইঙ্গিত করিতে

একেবারে 'রণং দেহি' মূর্ত্তি!

লাগিল। সিংহ নড়িল না। বিকট আওয়াজ করিয়া সে দাঁত মুখ খিঁচাইতেছে দেখিয়া, মহিষ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং নাক দিয়া আরও জোরে জোরে শব্দ করিতে লাগিল। সিংহের তর্জ্জন-গর্জ্জন খুবই বেশী, কিন্তু আসলে একটু যেন লেজ গুটান ভাব! মহিষের একেবারে 'রণং দেহি' মূর্ত্তি!

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিল। সিংহ অগ্রসরও হয় না, পথও ছাড়ে না। মহিষের আর সহ্য হইল না। সে কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া গোঁ ভরে মাথা নীচু করিয়া সিংহের দিকে ছুটিল। সিংহও তখন হুঙ্কার ছাড়িয়া, মহিষকে লক্ষ্য করিয়া লাফ দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। কিন্তু এমনি তাহার কপাল, মহিষের পিঠে না পড়িয়া, সে পড়িল ঠিক তাহার শিংএর ডগায়! তার পর যাহা ঘটিল, বুঝিতেই পার। সিংহ সামলাইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই, মহিষের প্রবল এক গুঁতায় একেবারে চিৎপাৎ! মহিষটা অমনি ছুটিয়া গিয়া এমন ভীষণ জোরে সিংহকে মাটিতে চাপিয়া ধরিল যে, তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। আমরা ভাবিলাম, লড়াই বুঝি ফুরায়। কিন্তু হঠাৎ কি যে একটা ব্যাপার ঘটিল, কিছু বুঝিলাম না। চক্ষের পলকে সিংহ একেবারে মহিষের পিঠের উপর! এইবার মনের ঝাল মিটাইয়া, পশুরাজ তাহার দন্ত ও থাবার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল বটে, কিন্তু মহিষ একটুও দমিল না। উভয়ের দেহে তখন রক্তের ধারা বহিতেছিল। সেই রক্ত দেখিয়া মহিষের গায়ের রক্ত দশ-গুণ গরম হইয়া উঠিল! তখন তাহার কি ভয়ানক লাফালাফি—দাপাদাপি! সেই তাণ্ডব নৃত্যে সিংহ ছিট্‌কাইয়া পড়িবামাত্র মহিষ এমন প্রচণ্ড বলে তাহাকে আক্রমণ করিল যে, সিংহের সব জারিজুরিই ফুরাইয়া আসিল। তাহাকে মাটিতে হুমড়িয়া পড়িতে দেখিয়া, মহিষ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আবার জলার দিকে চলিয়া গেল।

আমরা পাহাড়ের মাথা হইতে মৃতপ্রায় সিংহের উপর দুইটা গুলি মারিলাম। সে নিস্পন্দ হইয়া গেল। বন্দুকের আওয়াজে মহিষ আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র, কিন্তু কিছুই বলিল না। আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাকেও দুই এক গুলিতে মারিয়া ফেলিতে পারিতাম, কিন্তু এমন বিজয়ী বীরকে মারিতে সহজে কি হাত উঠে।

পাহাড় হইতে যখন নামিলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ীর রাস্তা ধরিলাম।

গর্ডন্ কামিং এর প্রথম সিংহ

শিকার ও শিকারী সম্বন্ধে সামান্য খবরও যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা বিখ্যাত শিকারী গর্ডন্ কামিংএর নামের সহিত নিশ্চয়ই পরিচিত। ইনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায়, নানাবিধ হিংস্র জন্তু শিকার করিতে গিয়া, ভয়াবহ বিপদ্ ও সাক্ষাৎ মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া যে সকল বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট উপকথার মত চমকপ্রদ মনে হয়। পশুরাজ সিংহের সহিত যেদিন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়, সেই স্মরণীয় দিনের যে বর্ণনা তিনি তাঁহার "দক্ষিণ আফ্রিকার শিকার-কাহিনী" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ সংকলিত হইল।

"সমস্ত দিন জঙ্গলে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁবুতে ফিরিয়া ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে বিশ্রাম করিতে যাইতেছি, এমন সময়, কেমন যেন একটা অপরিচিত অস্বস্তিকর আওয়াজ শুনিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। তখন চাঁদ উঠিয়াছে, আশ-পাশের প্রান্তরভূমি একটা আবছা আলোকে আলোকিত। সেই আলো-অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইলাম, একদল হিংস্র পশু চঞ্চল হইয়া এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি লক্ষ্য স্থির করিয়া গুলি ছুড়িলাম, তাহাতেই একটি শত্রু নিপাত হইল। আবার গুলি করিলাম, একটি বৃহৎকায় চিত্রিত হায়েনা সেই আঘাতে ধরাশায়ী হইল এবং নিমেষমধ্যে সেই হিংস্র হায়েনার দল চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল। আমি কিয়ৎকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া বন্দুকটা হাতের কাছে রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

বেশীক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। সেই তন্দ্রার ঘোরে যেন স্বপ্নের মধ্যেই একটা অদ্ভুত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। স্বপ্নঘোরে মনে হইল, যেন সিংহেরা আমার পাছু লইয়াছে—গর্জ্জন বাড়িয়াই চলিয়াছে। হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিলাম এবং একটু পরেই অতি নিকটে অত্যন্ত লঘুপদক্ষেপ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, একদল রক্তলোলুপ নেকড়ে বাঘ আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া হর্যধ্বনি করিতেছে। ব্যাপার কি? স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সভয়ে দেখিলাম, একদল বন্য কুকুর অদ্ভুত আওয়াজ করিতে করিতে উন্মত্তের মত আমার চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। আমার ডাইনে বামে, সাম্নে পিছনে এই ভয়ঙ্কর কুকুরদল কানখাড়া করিয়া গলা বাড়াইয়া যেন আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে! একদল আমার গুলিতে হত হায়েনা দুটাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া পৈশাচিক তাণ্ডব সুরু করিয়াছে।

আমার ভয় হইল, অবিলম্বে এই রক্তলোলুপ কুকুরের দল আমাকেই ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিবে। এই কথা ভাবিতেই আমার রক্ত যেন ভিতরে জমাট বাঁধিয়া গেল! কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি উপস্থিত-বুদ্ধি হারাই নাই। আমি জানিতাম যে, মানুষের গম্ভীর গলার আওয়াজকে ইহারা ভয় পায়। এই কথা মনে হইতেই, আমি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, আমার কম্বলটি দুই হাত দিয়া সবেগে নাড়িতে নাড়িতে, চীৎকার আরম্ভ করিলাম। ইহাতে কাজ হইল। হিংস্র কুকুরদল ভয় পাইয়া খানিকটা দূরে সরিয়া গিয়া, আমাকে লক্ষ্য করিয়া খেউ খেউ করিতে লাগিল। আমি নিমেষ-মধ্যে বন্দুক হাতে লইয়া গুলি ছুড়িবার উপক্রম করিতেই, তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল আর ফিরিল না।

কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই, একটা গুরুগম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও সিংহ-নিনাদ শুনি নাই, কোন্ জন্তুর আওয়াজ শুনিতেছি, তাহাও আমাকে কেহ বলিয়া দেয় নাই, তবুও ঠিক বুঝিতে পারিলাম যে, সিংহগর্জ্জন শুনিতেছি। সেই গম্ভীর রব সমস্ত প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া দূরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। মনে কেমন যেন একটা সম্ভ্রমের ভাব উদিত হইল। আমার ভুল হইবার কোন কারণ ছিল না, সেই গর্জ্জনধ্বনি একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া মনে হইল যেন আশৈশব তাহার সহিত আমি পরিচিত! আওয়াজ শুনিয়া বুঝিলাম, পশুরাজ সিংহ সদলবলে আমার আধ মাইলের মধ্যে কোথাও বিহার করিতেছেন। মাঝে মাঝে মৃদু আর্ত্তকান্নার মত ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল এবং তাহা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের মত মিলাইয়া গেল! ক্ষণকাল পরে, পর পর পাঁচ ছয় বার ক্রমোচ্চমান গভীর গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হইয়া, প্রান্তর ও অরণ্যব্যাপী একটা শান্ত গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি করিতে লাগিল। মনে হইল, যেন সুদূর আকাশ-প্রান্তে মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছে। সঙ্গীতের আসরে গায়কের মত প্রথমে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা গর্জ্জন করিয়া যেন তারস্বরে ঐক্যতান-বাদন সুরু করিল। সে কি গর্জ্জন! যে শিকারীর এই অপূর্ব্ব ধ্বনি শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই, সে সত্যই হতভাগ্য! রজনীর অন্ধকারে জনহীন প্রান্তর বা অরণ্যের মধ্যে এই অপরূপ গর্জ্জন, নির্ভীক শিকারীর কাছে ঠিক সঙ্গীতের মত শুনায়—বিশেষ করিয়া শিকারী যদি অসহায় অবস্থায় আত্মনির্ভর করিয়া সিংহের অদূরে দণ্ডায়মান থাকে! তখন তাহার শিকারবৃত্তি সত্যই সার্থক।

সেই রাত্রে আমার আর কোন বিপদ্ ঘটে নাই। সিংহের দল দূরে দূরে থাকিয়াই ফিরিয়া গিয়াছিল। সুতরাং আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তখনও লাভ করিতে পারি নাই। আশৈশব কল্পনা করিতাম, বন্দুক হস্তে একাকী

পশুরাজ সিংহের সম্মুখীন হইয়া, তাহার সহিত একবার বোঝা-পড়া করিব; সে রাত্রে সিংহকে চোখেই দেখিতে পাইলাম না! একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইলাম।

কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হইতে বেশী দিন লাগিল না। এই ঘটনার চার পাঁচদিন পরেই, দুই জন অনুচর-সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে বাহির হইলাম। শান্ত দ্বিপ্রহর। অতি মৃদু বাতাস বহিতেছিল। আমরা একদল বন্য হরিণের পিছনে তাড়া করিয়া, একটি ছোট পাহাড়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িলাম। এই পাহাড়ের একশত গজের মধ্যে একটা মৃত ও অর্দ্ধভুক্ত বন্যপশু পড়িয়া আছে দেখিয়া, ঘোড়া হইতে নামিয়া স্থানটি পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। সিংহের সদ্যঃ পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলাম, কোনও পশুরাজ জন্তুটিকে শিকার করিয়া মধ্যাহ্ন আহার সারিতেছিলেন, এমন অবস্থায় আমরা তাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছি; তিনি কাছাকাছি কোথাও আছেন। কারণ, মৃত জানোয়ারের কাছে তখনও পর্য্যন্ত শকুনি প্রভৃতি আসিতে সাহস করে নাই। আমরা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত পর্ব্বত-গাত্রের গুহা ও প্রান্তরের ঝোপগুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিলাম, কিন্তু পশুরাজের সাক্ষাৎ পাইলাম না। নিষ্ফল হইয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আহারাদির পর আমি সিংহ-শিকারে বদ্ধপরিকর হইলাম এবং ঠিক সন্ধ্যার পরেই সদলবলে অশ্বারোহণে পাহাড়টার কাছে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, সেই রাত্রে বিজন পার্ব্বত্যপ্রদেশে আমার কষ্টের অবধি ছিল না। আমরা সেখানে উপস্থিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই, চারিদিক্ গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। বাতাসের নিশ্চল-নিস্তব্ধতা দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, শীঘ্রই ঝড় উঠিবে। এক ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে, আমার অনুমান সত্য হইল। অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক মেঘগর্জ্জন ও বজ্রপাত হইতে লাগিল। বাতাসের বেগ ভীষণভাবে বর্দ্ধিত হইল, অরণ্যভূমি ও বাতাসে মাতামাতি সুরু হইল এবং কয়েক মিনিট পরেই প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হইয়া, আমাদিগকে একেবারে ধারাস্নান করাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম, প্রান্তরভূমি এক বিস্তীর্ণ জলখণ্ডের আকার ধরিয়াছে। আমার বন্দুক তিনটিকে অত্যন্ত সাবধানে চামড়া দিয়া ঢাকিয়া বাঁচাইতে লাগিলাম। দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া প্রবলভাবে ঝড়-বৃষ্টি চলিতে লাগিল। দুর্য্যোগ কাটিয়া যাইতেই, আমরা মাইল খানেকের মধ্যে সিংহগর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। ভোর হইবার কিছু পূর্ব্বে মনে হইল, যেন মৃত জানোয়ারটার নিকট হইতেই সিংহের গর্জ্জন-ধ্বনি আসিতেছে। আমরা ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। আমাদের সমস্ত পরিচ্ছদ ভিজিয়া ভারী হইয়া গিয়াছিল! কোট্-প্যাণ্টালুন খুলিয়া ফেলিয়া, কম্বল নিংড়াইয়া কোন রকমে তাহাদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া, আমি ও আমার দুই

অনুচর ঘোড়ায় চড়িয়া, সিংহ-পাহাড়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িলাম। তখন ধীরে ধীরে অন্ধকার সরিয়া যাইতেছিল; আমরা সন্তর্পণে সেই মৃত পশুর দিকে অগ্রসর হইলাম। পথের আশে পাশে বহুবিধ হিংস্র ও বন্য পশু দেখিতে পাইলাম। তাহাদিগকে শশকের মত নিরীহ বোধ হইতেছিল। সাধারণতঃ ঝড় বৃষ্টির পর তাহাদের এইরূপ অবস্থা হয়। আকাশে তখনও মেঘ ছিল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে মেঘখণ্ডগুলি শান্তভাবে লাগিয়াছিল। আমরা মৃত জন্তুটার নিকট আসিতেই কতকগুলি শৃগাল কোলাহল করিতে করিতে পলাইল, শকুনি গৃধিনীর পালও উড়িয়া গেল। কিন্তু পশুরাজের কোনও চিহ্নই লক্ষিত হইল না। তখন সকাল হইয়াছে। তাহার পদচিহ্ন-অনুসন্ধানে আমরা আরও অৰ্দ্ধঘণ্টাকাল ব্যাপৃত রহিলাম; দুঃখের বিষয়, প্রান্তরটি প্রায় চষিয়া ফেলিয়াও কোন ফল হইল না। শীতে ও ক্ষুধায় তখন আমরা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, ফিরিবার উপক্রম করিয়া তাঁবুর দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরাইলাম।

সহসা প্রায় দুইশত গজ দূরে কতকগুলি শকুনির দিকে নজর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, এক বিপুলকায় সিংহী একটা বন্যজন্তুর মৃতদেহের উপর থাবা পাতিয়া বসিয়া দাঁত দিয়া তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। একদল শৃগালও এই কার্য্যে তাহাকে সাহায্য করিতেছে। আমি আমার দেশী অনুচরদিগের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিয়া বলিলাম, "ঐ দেখ, সিংহ!" তাহারা চকিত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কই, কোথায়?" এবং সঙ্গে সঙ্গে "বাপ রে! সত্যিই তো!" বলিয়া ঘোড়ার পেটে পদাঘাত করিয়া পলায়নপর হইল। আমি বলিলাম, "তোমাদের মতলব কি?" তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া ফেলিল, "আমাদের বন্দুকে সে টোটা পোরা নেই!" কথাটা সত্য। কিন্তু আমাদের এই সামান্য দুই একটা কথাবার্ত্তার মধ্যেই সিংহীর দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়িল। বৃহৎ গোলাকার মুখখানা উঁচু করিয়া সে কয়েক সেকেণ্ডমাত্র আমাদের দেখিল এবং পরমুহূর্ত্তে উত্তরের পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। শৃগালেরাও কোলাহল করিতে করিতে অন্য দিকে পলাইল। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য, সিংহকে আমাদের দিকে ফেরান, কাজেই আর একমিনিট সময়ও নষ্ট করিলে চলিবে না। ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া ও তাহাকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিয়া আমি আমার অনুচর দুইজনকেও আমার পিছনে আসিতে বলিলাম। শিক্ষিত ঘোড়া বিদ্যুদ্বেগে প্রান্তরের উপর দিয়া ছুটিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি সিংহীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। এই কয়েক সেকেণ্ডের আনন্দ আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। আমার যেন নেশা চাপিয়াছিল। মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলাম, এই হিংস্র পশুকে হত্যা করিব, না হয়, নিজে প্রাণ দিব।

সিংহী পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, তাই তাহাকে ধরিতে আমাকে প্রান্তরের বহুদূর অতিক্রম করিতে হইল। সিংহী যখন দেখিল যে, আমি তাহাকে প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছি, তখন সে তাহার গতি কমাইয়া দিল। তাহার সুন্দর লেজটি একদিকে একটু হেলাইয়া সে এবার কদম-তালে চলিতে লাগিল। আমি একটা হুঙ্কার দিয়া তাহাকে থামিতে বলিলাম। আমার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সে থামিয়া গেল এবং আমার দিকে পিছন করিয়া চুপ করিয়া বসিল। একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। সিংহী এই ভাবে আধ মিনিট কাল বসিয়া থাকিয়া, হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া, আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তাহার লেজটি তাহার দেহের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে আঘাত করিতে লাগিল এবং আমার দিকে চাহিয়া সে দাঁত খিঁচাইয়া গম্ভীর গর্জ্জন সুরু করিল। পর মুহূর্ত্তেই

"সিংহটি ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল।"—১৫২ পৃষ্ঠা

সে বেগে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া, বজ্রের মত ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কিন্তু যখন দেখিল, আমি ইহাতেও ভীত না হইয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছি, তখন শান্তভাবে ঘাসের উপর চার-পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। আমার হটেন্‌টট্ অনুচর দুইটি তখন কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা তিন জনেই ঘোড়া

হইতে নামিয়া, পরস্পরের বন্দুক পরীক্ষা করিলাম। যখন আমরা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছি, তখন সিংহীটা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বিশেষ বিরক্তির ভাব দেখাইতে লাগিল। প্রথমে সে আমাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, পরে পিছনে চাহিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল, পলাইবার পথ পরিষ্কার আছে কি না। তার পর একটা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল। আমরা ঘোড়া তিনটির লাগাম ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, যেন আমরা নিরীহ ভাবে চলিয়াছি আমাদের কোনই উদ্দেশ্য নাই! আসলে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, সিংহীর পার্শ্বদেশের সম্মুখীন হওয়া। কিন্তু সে-ও অত্যন্ত সাবধান হইয়া চলিতে লাগিল—তাহার পার্শ্বদেশ বরাবরই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রহিয়া গেল। আমি আমার অনুচরদিগকে যথাকর্ত্তব্য করিবার জন্য উপদেশ দিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাদের মুখের বিবর্ণ অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, তাহাদের উপর নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।

এই-ই উপযুক্ত অবসর—আর দেরী করিলে চলিবে না। সিংহীটা আমাদের ষাট গজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে এবং আরও অগ্রসর হইতেছে। আমার সঙ্গীরা তাহার দিকে ঘোড়ার পিছন ফিরাইল। আমি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঠিক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম—সিংহীর কাঁধ জখম হইয়া গেল। আহত হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে সেই ক্রোধোন্মত্ত জানোয়ার বিদ্যুৎগতিতে একেবারে আমাদের ভিতর আসিয়া পড়িল। ভয়ে আমার এক অনুচরের বন্দুক তাহার হাতেই আওয়াজ হইয়া গেল, অন্যজন কাঁপিতে লাগিল। সিংহী আমার ঘোড়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার পাঁজর ভাঙ্গিয়া ফেলিল আর তাহার পেট চিরিয়া নাড়ি ভুঁড়ি বাহির করিয়া দিল; রক্তের প্রবাহ বহিতে লাগিল। ইহাতেও কিন্তু আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া দ্বিতীয়বার গুলি ছুড়িবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই সুবিধা শীঘ্রই জুটিল। তাহাকে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া কয়েক পা পিছু হঠিয়া, নূতন আক্রমণের চেষ্টা করিতে দেখিয়া, আমি দ্বিতীয়বার গুলি ছুড়িলাম! এবার আর তাহাকে অগ্রসর হইতে হইল না। গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ প্রাণহীন হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নাই। কিন্তু সিংহীর দেহ ভূতলশায়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার বিপদের পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। আমার প্রভুভক্ত ঘোড়ার এই দুর্দ্দশার জন্যও আমার কষ্টের অবধি রহিল না। এই আমার প্রথম সিংহ-শিকার, কিন্তু ইহাই শেষ নহে।

নির্ভীক শিকারী

কামিং সাহেব লিখিয়াছেন:—"দক্ষিণ আফ্রিকার 'লেপ্‌বি' নামক স্থান ছাড়িয়া আমরা 'সুবি'র দিকে অগ্রসর হইলাম। সুবিতে উপস্থিত হইয়াই একটা প্রকাণ্ড সিংহের মাথার খুলি দেখিলাম। স্থানীয় অধিবাসীরা বলিল যে, হতভাগ্য সিংহটা স্বজাতীয়ের হস্তে নিহত হইয়াছে। রাত্রে আমি এবং আমার অনুচর শিকারের লোভে এক জলাশয়ের নিকটে গিয়া আড্ডা গাড়িলাম। দলে দলে বন্য পশু জলপানের জন্য সেখানে আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিলেও, দারুণ অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া গুলি করিতে পারিলাম না। মধ্যরাত্রে একটা সিংহ তাহার সঙ্গিনীর সহিত আমাদের ঠিক দশ গজ দূর দিয়া চলিয়া গেল। আমার চোখে তখন তন্দ্রার ঘোর, কিন্তু আমার সঙ্গী অত্যন্ত তৎপরতার সহিত একেবারে সিংহের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া গুলি চালাইল। সিংহটা করুণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এক লম্ফে বহুদূর সম্মুখে গিয়া পড়িল, আর উঠিল না। তাহার আর্ত্তনাদ ক্ষীণ হইতে হইতে একেবারে মিলাইয়া গেল। সিংহী এতক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া ছিল; সিংহকে পড়িতে দেখিয়া ও তাহাকে শৃগাল, হায়েনা প্রভৃতি পশুতে মিলিয়া টানাটানি করিতেছে বুঝিতে পারিয়া, সে কাছে আসিয়া ভীষণভাবে গর্জ্জাইতে লাগিল। সেই গর্জ্জনে অতি বড় সাহসী লোকেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমার সঙ্গী তখন ভয়ে প্রায় অর্দ্ধমৃত, আমারও ভয় করিতে লাগিল। সহসা আরও কয়েকটা সিংহ-সিংহী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ও গর্জ্জনে যোগদান করিল। এই বিপদের মুখে অন্ধকারে থাকাটা যুক্তিযুক্ত নয় বিবেচনা করিয়া, আমরা গন্‌গনে আগুন জ্বালাইয়া, জলাশয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বসিয়া রহিলাম। সে রাত্রে আর কোনও বিপদ্ ঘটিল না।

দিন কয়েক পরে আমার মল্লি নামক অনুচর আসিয়া খবর দিল যে, একদল সিংহ কয়েকটা জন্তু মারিয়া নিকটেই ফেলিয়া রাখিয়াছে। আমি অবিলম্বে মার্টিন ও বুশ্‌ম্যান্‌কে সঙ্গে লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম। আমার প্রভু-ভক্ত কুকুরের দলকেও সঙ্গে লইতে ভুলিলাম না। কুকুরগুলা সেখানে পৌঁছিয়াই সিংহের গন্ধ পাইল এবং আকাশের দিকে চাহিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল। তার পর সিংহকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এদিক্ সেদিক্ ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল। দুইটি কুকুর আমার দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল। উল্‌ফ নামক কুকুরটিকে বিদ্যুৎ-

গতিতে দক্ষিণে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, এক বা একাধিক সিংহের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে অন্য কুকুরগুলাও সেখানে হাজির হইয়া গর্জ্জাইতে লাগিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া আমি ঘোড়া ছুটাইলাম এবং একটা ঘন ঝোপের ধারে আসিয়া থামিলাম। বুঝিতে পারিলাম, সিংহের দল সেই ঝোপে আশ্রয় লইয়াছে। ইতিমধ্যে দেখি, উল্‌ক একলা এক স্থানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে। তাহার নিকটে গিয়া, সেই স্থানে মাটি লক্ষ্য করিয়া সিংহ ও কুকুরের পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলাম, কাছের ঝোপেও তাহাদের দুই একটা আছে। পদচিহ্ন ধরিয়া কিছু দূর যাইতে না যাইতে, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল—একটা বিপুলদেহ সিংহীর সহিত মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। ঝোপের অন্তরাল হইতে তাহার গোল কালো মুখের খানিকটা ও খাড়া কান দুইটি দেখা যাইতেছিল। সে কিছুতেই আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইল না। এদিকে কুকুরগুলা তাহার আশে পাশে ঘেৌ ঘেৌ জুড়িয়া দিল। এই ভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে থাকিতে, হঠাৎ একবার সিংহীটা পাশ ফিরিয়া কি দেখিতে লাগিল। অমনি গুলি ছুড়িলাম। তাহার কাঁধে গুলি লাগিতেই সে কুকুরের দলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের কাহারও দেহে আঘাত লাগিল না। দ্বিতীয় গুলিতে সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল; তৃতীয়বার গুলি খাইয়া সে লম্বা হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং চতুর্থ গুলির সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া গেল! আমি তাহার মাথাটি ও নখগুলি কাটিয়া লইয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। সে রাত্রি অত্যন্ত ঠাণ্ডা ছিল এবং বেগে বাতাস বহিতেছিল বলিয়া, জলাশয়ের দিকে আর নজর রাখিতে পারিলাম না। আমাদের তাঁবুর চারিদিকে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সিংহগর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল।"

[২]

"দুইদিন পরের কথা—আবার নিয়মিত সেই জলাশয় পাহারা দিতেছি। সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে ছয়টা জেব্রা জল খাইতে আসিল। আমি শান্তভাবে তাহাদের পানকার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, শেষে একটাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম। জেব্রাটা গড়াইয়া পড়িল; গুলির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। আমি আমার লোকদের জেব্রার মৃতদেহটা জলের ধারে রাখিয়া দিতে আদেশ করিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, লোভে লোভে সিংহরা আসিয়া পড়িবে। ইহার পর আমি কফি খাইতে ভিতরে গেলাম। মল্লি ও ক্লিনবয়ের সঙ্গে যখন আবার পাহারার ঘাটিতে উপস্থিত হইলাম, তখন চাঁদের আলোতে চারিদিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা

আসিয়া বসিতে না বসিতেই আমাদের ঠিক ডান দিকে কিছু দূরে সিংহের ডাক শুনা গেল। এমন সময়ে, আমার উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্য একদল জেব্রা শুক্‌নো মাটিতে খুরের আওয়াজ করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইল এবং নিহত জেব্রাটা ভক্ষণ করিবার জন্য ধূর্ত্ত হায়েনা ও শৃগালেরাও আসিয়া পড়িল। ইহাদিগকে না

"তাহার কাল কেশররাজি যেন মাটি ছুইয়া যাইতেছিল।" ১৫৬ পৃষ্ঠা

তাড়াইলে সিংহশিকার করা যাইবে না ভাবিয়া, জেব্রার দল লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম। তাহারা প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। একটা প্রায় ষাট সত্তর গজ পর্য্যন্ত গিয়া ধরাশায়ী হইল। বুঝিলাম, আমার গুলি ব্যর্থ হয় নাই। এদিকে হায়েনা ও শৃগালের দল গুলির শব্দে চকিত হইয়া জলাশয় ত্যাগ করিয়া, সদ্যমৃত জেব্রাটার

কাছে উপস্থিত হইল। আবার ভয়ানক সিংহগর্জ্জন শুনিলাম। শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিবিষ্টভাবে চাহিয়া দেখিলাম, জলাশয়ের ঠিক অপর প্রান্তে একটি উচ্চ ঝোপের ভিতরে পশুরাজ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার চীৎকারে সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে কেমন একটা অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। আমি তখন বন্দুকটি বাগইয়া ধরিয়া, ঝোপের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, এই বুঝি পশুরাজ অগ্রসর হইতেছে! কিন্তু সে তখন অত্যন্ত ধূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে; অন্যান্য জন্তুদের পলায়ন দেখিয়া সে-ও আর সাহস করিল না, ঝোপ হইতে বাহির হইয়া ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিল।

পনর মিনিট এইভাবে কাটিলে, হঠাৎ আবার শৃগাল ও হায়েনাগুলাকে মৃতদেহ ছাড়িয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া বুঝিলাম, আমার আশা বুঝি পূর্ণ হয়—হইলও তাই। একটি বিরাট গম্ভীরদর্শন সিংহ আমার দৃষ্টিপথে পড়িল। তাহার কাল কেশররাজি যেন মাটি ছুঁইয়া যাইতেছিল। সে আসিয়া জেব্রার মৃতদেহটির উপর দাঁড়াইল। মনে হইল, সে আমার অস্তিত্বের বিষয় অবগত আছে; কারণ, সে আসিয়াই মাথা নীচু করিয়া জেব্রাটাকে কামড়াইয়া ধরিল এবং পাহাড়ের দিকে খানিকটা গিয়া, তাহাকে মাটিতে নামাইয়া দম লইতে লাগিল। আবার খানিকটা লইয়া গিয়া দম লইতে লাগিল। শেষে সেটা পাশের এক ঝোপের ভিতর রাখিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। এইবার সে তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব আমার দিকে রাখিয়া একটু তির্য্যক্‌ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। আমি তখনই গুলি ছুড়িলাম। লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হই নাই। গুলির সঙ্গে সঙ্গে সে হুমড়ি খাইয়া পড়িল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সব নিস্তব্ধ। তার পর সে একটা তীব্র আওয়াজ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ও করুণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, একটা ঝোপ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে লাগিল। ঝোপের ভিতর গিয়া সে থামিল বলিয়া মনে হইল। তখন তাহার একটানা গর্জ্জনই শুনা যাইতে লাগিল। আমার বিশ্বাস জন্মিল যে, সে নিশ্চয়—এখনই হউক, কি একটু পরেই হউক—এই আঘাতেই মারা পড়িবে। তাহার গর্জ্জন থামিতেই এ বিশ্বাস দৃঢ় হইল। এখন আমাদের কর্ত্তব্য, অবিলম্বে গিয়া তাহার মৃতদেহ তাঁবুতে লইয়া আসা। কারণ, একটু দেরি করিলেই হায়েনা ও শৃগালেরা মৃতদেহের আর কিছুই রাখিবে না। এই ভাবিয়া আমি ও মার্টিন ঘোড়ায় চাপিয়া, কুকুরের দল সঙ্গে লইয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলাম। কুকুর লেলাইয়া দিয়া শৃগাল ও হায়েনাগুলাকে দূর করিলাম। তার পর সন্তর্পণে ঝোপের নিকট গিয়া, সেই বিপুল-

কায় কাল কেশরধারী সিংহকে ভূতলশায়ী দেখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গুলি তাহার পেটে লাগিয়াছিল। সেই অপূর্ব্ব-শ্রী গম্ভীরদর্শন জন্তুর বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যায়ত্ব নহে। আমি বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দীর্ঘ কেশর, প্রকাণ্ড থাবা ও দেহের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, পৃথিবীর কোন শিকারীর ভাগ্যে ইহা অপেক্ষা মূল্যবান পুরস্কার জোটে নাই। সিংহটাকে তাঁবুতে লইয়া যাওয়া হইল।"

সিংহের শোভাযাত্রা

গডন্ কামিংএর যে কি অপরিসীম সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধি ছিল, তাহা নিম্নের ঘটনা হইতেই প্রতীত হইবে। কামিং সাহেব লিখিয়াছেন:—"আমি ও আমার অনুচর ক্লিনবয় তাঁবুর এক ছিদ্রপথ দিয়া জলাশয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বসিয়াছিলাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, একটা মিশ্ কাল স্ত্রী-গণ্ডার হেলিতে দুলিতে জলপান করিতে আসিল। আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দুই বার গুলি ছুড়িলাম, কিন্তু সে ইহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। একটু পরেই দুইটা বৃহৎকায় গণ্ডার আসিয়া হাজির। দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা আমাদের বন্দুকের আওয়াজ শুনেই নাই। তাহারা নিশ্চিন্তমনে জল খাইতে লাগিল। আমি ও ক্লিনবয় একসঙ্গে তাহাদের একটিকে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিলাম। গজ তিনেক ছুটিয়া গিয়া সে পড়িয়া গেল এবং কিঞ্চিৎ পা ছুড়িয়া নিশ্চল হইল। বন্ধুর এই বিপদ্ দেখিয়া অন্য গণ্ডারটা হতভম্ব হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, পলায়নের চেষ্টা মাত্র করিল না। এই সুযোগ আমি ছাড়িলাম না। আমার গুলিতে আহত হইয়া সে প্রায় দুই শত হাত দৌড়িয়া গিয়া ভূমিশায়ী হইল। সাফল্যে প্রীত হইয়া আমরা সেই রাত্রির মত নিদ্রা দিতে গেলাম।

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই স্থানীয় লোকেরা একটা গণ্ডারের মৃতদেহ সেখান হইতে সরাইয়া, দ্বিতীয়টাও সরাইতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় আমি গিয়া বাধা দিলাম। কারণ, আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেখানে মৃতদেহ থাকিলে, জলাশয়ের নিকট রাত্রে নিশ্চয়ই সিংহের শুভাগমন হইবে। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আবার লক্ষ্যস্থলের অভিমুখে চলিলাম; দুইজন দেশী লোককেও আমাদের সঙ্গে লইলাম। শিকারী কুকুর দুইটি আমার পাশে পাশে চলিল।' জলাশয়ের কাছাকাছি

আসিয়া গণ্ডারের মৃতদেহ অনুসন্ধান করিতে গিয়া চমকিয়া উঠিলাম। অন্ধকারে স্পষ্ট কিছুই ঠাহর হইতেছিল না বটে, কিন্তু মনে হইল যেন বড় বড় কয়েকটা জানোয়ার পাহাড় হইতে নামিয়া জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রথমটা জেব্রা বলিয়াই বোধ হইল। ক্লিনবয়ও বলিল, 'মনে হইতেছে, যেন একদল জেব্রা পাহাড়ের উপর মৃতদেহের কাছে দাঁড়াইয়া আছে।' আমি বলিলাম, 'হইতে পারে,' কিন্তু আমি ভাল করিয়াই জানিতাম যে, গণ্ডারের মৃতদেহের নিকট নিশ্চয়ই জেব্রারা আড্ডা গাড়িবে না। আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের গোপন পাহারার স্থানে আসিয়া বন্দুক হাতে লইলাম এবং সম্মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। রাত্রির অন্ধকার তখন চন্দ্রালোকে অনেকটা দূর হইয়াছে। ভাল করিয়া দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এক স্থানে ছয়টা সিংহ, চৌদ্দ পনরটা হায়েনা ও ডজন তিনেক শৃগাল মিলিত হইয়া মৃতদেহের সদ্‌গতি করিতেছে। সিংহেরা নিশ্চিন্ত ও শান্তভাবে আহার সমাধা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও, হায়েনা শৃগালেরা যথেষ্ট কাড়াকাড়ি ও কোলাহল করিতেছিল। পরস্পরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া, তাহারা মৃতদেহের চারিপাশে উন্মত্ত নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছিল। গর্জ্জন, হাসি, চীৎকার-কোলাহলে সেই ভূভাগ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। হায়েনা ও শৃগালেরা সিংহগুলাকে দেখিয়া যে বিন্দুমাত্র ভয় পাইতেছে এরূপ বোধ হইল না। এইভাবে এই বিরাট ভোজের দৃশ্য আমরা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া দেখিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আহার সমাধা করিয়া সিংহেরা জলপানের জন্য জলাশয়ে আসিবে। ইতিমধ্যে দুই চারিটা গণ্ডারও কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কাঁচা রক্তমাংসের গন্ধে ভীত-চকিত হইয়া পলায়ন করিল।

পরিশেষে সিংহেরা সন্তুষ্ট হইল বলিয়া বোধ হইল এবং মাথা খাড়া করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল। সম্ভবতঃ তাহারা জলাশয়ের দিকেই আসিতেছিল। দুই মিনিটের মধ্যে তাহাদের একটা আমার দিকে মুখ তুলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল; তাহার পিছনেই আর একটা; এবং পর পর আরো চারিটা আসিল। তাহাদের এই শোভাযাত্রা ক্রমশঃ জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বুঝিতে পারিলাম, অবিলম্বে এই সিংহদল আমারই পনর গজের মধ্যে আসিয়া পড়িবে।

ক্লিনবয়ের অবস্থা দেখিয়া আমার ভয় হইল; সে যেন ভয়ে একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছিল। আমি পূর্ব্বেকার পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ঠিক কোন্‌খানে সিংহেরা জলপান করিতে নামিবে। আমি বন্দুকটা পরীক্ষা করিয়া লইয়া স্থির হইয়া বসিলাম। সিংহ ছয়টা ধীরে ধীরে পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া প্রায় ষাট গজ দূরে একবার মুহূর্ত্তকালের জন্য থামিয়া, যেন চারিদিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইল।

সম্মুখের সিংহটা হঠাৎ সেই খানেই থাবা পাতিয়া বসিয়া পড়িল। অন্য সকলে অগ্রসর হইয়া আসিলে, সে আবার তাহাদের পিছে পিছে চলিতে লাগিল। আমার ধারণামত তাহারা তাহাদের সেই পুরাতন স্থানেই আসিয়া জুটিল এবং জলে মুখ দিয়া চক্ চক্ করিয়া জল পান করিতে আরম্ভ করিল। ক্লিনবয় ইতিমধ্যে ভয়ে তাহার মাথাটা নাড়িতেই, আমি ইঙ্গিতে তাহাকে স্থির হইয়া থাকিতে বলিলাম। আবার সিংহদের দিকে মুখ ফিরাইতেই দেখি যে, তাহারা আমাদের অস্তিত্ব জানিতে পারিয়াছে।

সেইরূপ ভয়াবহ অবস্থা এখন আর কল্পনাও করিতে পারি না। অন্ধকার অরণ্যে ছয় ছয়টা সিংহের সম্মুখীন হইলে, যে কোন অসমসাহসী শিকারীর প্রাণও ভয়ে দুরু দুরু করিবে! আমার তখনকার অবস্থা এখন ভাষায় বলিয়া বুঝাইতে পারিব না।

"তখনো পর্য্যন্ত অন্য পাঁচটা আমাকে দেখিতে পায় নাই।"

একটা বৃদ্ধ সিংহী দলের অগ্রবর্ত্তী ছিল। সেই সর্ব্বপ্রথমে আমাকে লক্ষ্য করে এবং আমার দিকে তাকাইতে তাকাইতে জলাশয়ের ধার ঘেঁসিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। আমি মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া দেখিলাম, সিংহীকে গুলি করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কারণ, তখনও পর্য্যন্ত অন্য পাঁচটা আমাকে দেখিতে পায় নাই। আমি বন্দুক তুলিয়া প্রস্তুত হইলাম। আমাকে নড়িতে দেখিয়া সে চকিতে থামিয়া গেল। তাহার বুক ও পিঠ আমার দৃষ্টির সম্মুখে রহিল। গুলি ছুড়িলাম, গুলি খাইয়াই সে বারবার গর্জ্জন করিতে করিতে সম্মুখে লাফ দিল; তাহার সঙ্গী পাঁচটাও তাহার অনুবর্ত্তী

হইল। বন্দুকের ধোঁয়া ও ধূলিরাশিতে সকলেই তখন এমন আচ্ছন্ন যে, কিছুই ঠাওর হইতেছিল না। আমি আহত সিংহীর আর্ত্তনাদের প্রতীক্ষায় কান পাতিয়া রহিলাম। নিরাশ হইলাম না। মনে হইল, সে এক জায়গায় থাকিয়া আর্ত্তক্রন্দন করিতেছে। সম্ভবতঃ গুলিটা মারাত্মক হইয়াছে। তাহাকে এইভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, অপর পাঁচটা সিংহ কেমন যেন ভয় পাইয়া পাহাড়ের দিকে দ্রুত পলায়ন করিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আমি কুকুর দুইটিকে ছাড়িয়া দিলাম ও নিজে তাহাদের পিছু পিছু গিয়া দেখিলাম, সিংহী মরিয়াছে। এই সিংহীটা দেখিতে সত্যই খুব সুন্দর ছিল। বিপদের অন্তে এইরূপ পুরস্কার পাইয়া আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলাম।"

ধূর্ত্ত সিংহ ও ক্ষিপ্ত শিকারী

কামিং সাহেব একবার রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, একটা সিংহ-শিকার করিতে গিয়া, সৌভাগ্যক্রমে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি তখন আফ্রিকার গভীরতম প্রদেশে শিকার করিয়া ফিরিতেছিলেন। হেন্‌ড্রিক্ ও ষ্টোফোলাস্ নামে দুইজন অনুচর তাঁহার সঙ্গে ছিল। একদিন গভীর রাত্রে কামিং সাহেব তাঁহার তাঁবুর বাহিরে একখানা গাড়ীতে নিদ্রা যাইতেছিলেন; তাঁহার অনুচর দুইজন কিছুদূরে আগুন জ্বালাইয়া, একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। হঠাৎ গাড়ীটানা একটা বলদ কোন রকমে বাঁধন খুলিয়া এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিতে থাকে। শব্দ পাইয়া হেন্‌ড্রিক্ চমকিয়া উঠিল এবং ঝিমাইতে ঝিমাইতে কোন গতিকে বলদটাকে আবার যথাস্থানে বাঁধিয়া, সঙ্গীর পাশে আসিয়া শুইয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরেই এক ভয়ঙ্কর হুঙ্কারধ্বনিতে তাঁবুর সমস্ত লোক সভয়ে জাগিয়া উঠিল। 'সিংহ আসিয়াছে, সিংহ আসিয়াছে' বলিয়া একটা ভীষণ কোলাহল পড়িয়া গেল। ষ্টোফোলাস্ ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে, একটা সিংহ হেন্‌ড্রিকের উপর পড়িয়া তাহাকে এইমাত্র টানিয়া লইয়া গেল। ষ্টোফোলাস্ তাহার হতভাগ্য সঙ্গীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল; জ্বলন্ত কাঠ তুলিয়া সিংহের কপালে আঘাত করিয়াছে, কিন্তু তবু সেই দুর্দ্দান্ত জানোয়ার তাহার শিকার ছাড়ে নাই। সম্ভবতঃ সে কাছাকাছি কোথাও সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বেচারা

হেন্‌ড্রিক্ যখন বলদ বাঁধিবার জন্য উঠিয়া যায় ও ফিরিয়া আসিয়া ঘুমের চেষ্টা দেখিতে থাকে, সেই সময়ে এই ধূর্ত্ত সিংহটা গাছের আড়াল হইতে লাফ দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়ে। এতক্ষণে হয় ত হেন্‌ড্রিক্‌কে গভীর জঙ্গলে লইয়া গিয়াছে।

কামিং সাহেব রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই রাত্রেই ইহার প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু সেই অন্ধকারে নিবিড় জঙ্গলে, সিংহ ও তাহার শিকারকে খুঁজিবার চেষ্টা বৃথা। সাহেব চারিদিকে তাঁহার হটেন্‌টট্ অনুচর-দিগকে পাঠাইয়া, বনটাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিয়া, সকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

"একটা সিংহ হেন্‌ড্রিকের উপর পড়িয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।"—১৬০ পৃষ্ঠা

ভোর হইতে না হইতেই, দুইজন সঙ্গী ও শিকারী কুকুর লইয়া ঘোড়ায় চাপিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন—তাঁহার অনুচরকে মারিবার প্রতিশোধ দিতেই হইবে! ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে হতভাগ্য হেন্‌ড্রিকের হাঁটু অবধি একখানা পা পড়িয়া আছে দেখা গেল! সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সিংহ সেখানে তাহার নৈশ-আহার সমাধা করিয়াছে। এখানে সেখানে হেন্‌ড্রিকের দেহের অংশবিশেষ পড়িয়া আছে। সেই চিহ্ন ধরিয়া তাঁহারা একটা শুষ্ক নদীখাতে আসিয়া পড়িলেন। ভিজা বালির উপর সিংহের পদ-

চিহ্ন দেখা গেল। আহার সমাধা করিয়া সে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও বিশ্রাম করিতেছে। কুকুরগুলাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহারা মাটি শুঁকিতে শুঁকিতে একটা ঝোপের কাছাকাছি গিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল।

বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়াতে, পশুরাজ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া ঝোপের বাহিরে আসিল এবং কুকুরগুলাকে দেখিয়া সভয়ে দৌড় দিল।

কামিং সাহেব দারুণ ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া, প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া তাহার পাছু লইলেন। সিংহ প্রথমে খানিকটা নদীর ধার দিয়া ছুটিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে এক আধ্‌টা ঝোপ দেখিয়া মাথা লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কুকুরেরা ততক্ষণে আবার তাহার কাছাকাছি গিয়া পড়িয়াছে। বেগতিক দেখিয়া সিংহটা ফিরিয়া দাঁড়াইল ও থাবা দিয়া মাটি আঁচ্‌ড়াইতে আঁচ্‌ড়াইতে ভীষণ গর্জ্জন সুরু করিয়া দিল। রাগে তাহার কেশর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সাহেব তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার দিকে বড় বড় চোখ ঘুরাইয়া সিংহ বার বার হাঁ করিতে লাগিল; তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িবে বলিয়া তাহার লেজ ঘন ঘন নাড়িতে লাগিল। তিনি যদি রাগে অন্ধ না হইতেন, তাহা হইলে আর অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন না; কিন্তু প্রতিশোধ-স্পৃহা তখন তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি ঘোড়া ছুটাইয়া সিংহের কাছাকাছি গিয়া পড়িলেন ও বন্দুক তুলিয়া ধরিয়াই বলিলেন, "বাছাধন, এবার ইষ্ট নাম স্মরণ কর!"

সেই ভয়াবহ অবস্থায় কামিং সাহেব সহসা বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছেন। গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুর্দ্দান্ত জানোয়ার লাফ দিয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িবে। সাম্‌নাসাম্‌নি গুলি ছুড়িলে, গুলি ফস্কাইবার সম্ভাবনা; তখন মৃত্যু অনিবার্য্য।

অকস্মাৎ এই সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসাতে সাহেব সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। তিনি বিদ্যুৎগতিতে একটু পাশ কাটাইয়া, সিংহের ঘাড় লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। অব্যর্থ সন্ধান। গভীর হুঙ্কার ছাড়িয়া সিংহ একটি প্রকাণ্ড লাফ মারিল এবং মাটিতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আর এক গুলি খাইয়াই মরিয়া গেল।

কামিং সাহেবের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইল।

নান্দিদের সিংহ-শিকার

বন্দুকের এত যে উন্নতি হইয়াছে, তবু এখনও কত শিকারী সিংহের হাতে প্রাণ হারায়। তিন চারিটা সাংঘাতিক গুলি খাইবার পরেও, এক শ' গজ দৌড়িয়া আসিয়া সিংহ শিকারীকে শিকার করিয়াছে, এমন ঘটনার কথাও শুনা যায়। কখন কখন এমনও ঘটিয়াছে যে, বন্দুকের গুলি সিংহের হৃৎপিণ্ড ফুটা করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, তবু মরিবার আগে সে তাহার মরণ কামড়টি না দিয়া ছাড়ে নাই! তাহা হইলে ভাব, সিংহ কি জিনিস!

এমন যে সিংহ, তাহাকে আফ্রিকার 'মাসাই' ও 'নান্দি' জাতের নিগ্রোরা বল্লম দিয়া শিকার করিয়া থাকে। প্রেসিডেন্ট্ রুজ্‌ভেল্ট্ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি এবং অসাধারণ মনস্বী লোক বলিয়া সকল দেশে পরিচিত, কিন্তু শিকারী হিসাবেও তাঁহার প্রতিপত্তি বড় কম নয়। তিনি 'নান্দি'দের সিংহ-শিকার স্বচক্ষে দেখিয়া, তাহার যে বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে অবাক্ হইতে হয়।

নান্দিদের শিকার দেখিবার জন্য, তিনি একদিন আফ্রিকার জঙ্গলে দলবলে সিংহের খোঁজে বাহির হইয়াছিলেন। কথা ছিল, সিংহ পাওয়া গেলে নান্দিরা শিকার করিবে; সাহেবেরা কেহ সে শিকারে যোগ দিবেন না, কিছু বলিতে পারিবেন না; তাঁহারা কেবল দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিবেন। ঝোপ-জঙ্গল ঘাঁটিয়া অনেক খোঁজা-খুঁজির পর প্রকাণ্ড এক সিংহ পাওয়া গেল। তেমন সিংহ প্রায়ই মিলে না। রুজ্‌ভেল্ট্ লিখিয়াছেন যে, সিংহটাকে দেখিয়া তাঁহাদের শিকার করিবার লোভ হইল, কিন্তু তাহা হইলে ত তাঁহাদের কথা রক্ষা হয় না, আর নান্দিদের শিকারটাও দেখা হয় না! তাই তাঁহারা দলবলে সিংহটাকে ঘিরিয়া, একটু তফাতে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নান্দিরা খানিকটা পিছনে পড়িয়াছিল, ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির হইল। এক হাতে বল্লম, আর এক হাতে ঢাল! তাহাদের বিশাল দেহ যেন কাল পাথরের তৈরি; মুখে দয়া, মায়া, দ্বিধা, ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই। সিংহ পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া, তাহাদের আনন্দ দেখে কে? তাহারা এক এক পা চলে আর এক একটা বিষম লাফ দেয়। দেখিতে দেখিতে সিংহের ঝোপটিকে তাহারা নিঃশব্দে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। সিংহ এতক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়াছিল, আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, কতকগুলা মানুষ তাহার দিকে আসিতেছে। তাহারা সকলে

ঢালের আড়ালে গুঁড়ি মারিয়া বল্লম বাগাইয়া অগ্রসর হইতেছে। এক একটি ঢালের উপর দিয়া এক এক জোড়া কালো চোখ যমের ভ্রূকুটির মত তাহার দিকে তাকাইয়া আছে! সিংহ যখন বুঝিল যে, তাহার জন্যই এত সব আয়োজন, তখন তাহার গর্জ্জনে সারা জঙ্গল কাঁপিতে লাগিল। তাহার ঘাড়ের কেশর খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, মুখখান ভয়ানক বিকৃত হইয়া গেল, আর তাহার লেজ আছড়াইবারই বা কি ঘটা!

"সিংহের শরশয্যা"

সিংহ একবার এপাশ ফিরিল, একবার ওপাশ ফিরিল, ডাইনে তাকাইল, বাঁয়ে তাকাইল—কোন্ দিকে লোক কম! তার পর তীরের মত সেই দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

একটি লোকও সেদিক্ হইতে সরিল না; ঢাল বাগাইয়া বল্লম তুলিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। দুই পাশ হইতে শিকারীরা বল্লম হাতে দৌড়িয়া আসিল। দলের যে সর্দ্দার সে লাফ দিয়া সকলের সাম্‌নে গিয়া পড়িল। তাহার হাত হইতে বল্লমটা বিদ্যুতের মত ছুটিয়া গিয়া সিংহের গায়ে বিঁধিয়া গেল। আঘাত লাগিবামাত্র সিংহটাও সম্মুখে যাহাকে পাইল তাহাকেই আক্রমণ করিল। তবু কেহ এক পা-ও হটিল না। একটা লোক বল্লমের এক ঘায় সিংহকে এপার ওপার ফুঁড়িয়া ফেলিল—বল্লম তাহার ঘাড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পেটের পাশ দিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু

তাহা সত্ত্বেও সিংহ ঢালের উপর দিয়া প্রচণ্ড এক থাবা মারিয়া আর তাহার কাঁধে ও পিঠে দাঁত নখ বসাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাকে ধরাশায়ী করিল। অমনি চারিদিক্ হইতে বল্লমের পর বল্লম আগুনের ঝলকের মত ছুটিয়া আসিয়া সিংহকে একেবারে অস্ত্রে অস্ত্রে গাঁথিয়া ফেলিল। ইহার মধ্যেও কিন্তু সে আরও একটি শিকারীকে জখম না করিয়া ছাড়ে নাই। মরিবার সময় সিংহ একটা বল্লম এমন জোরে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল যে, সেটা উল্টাইয়া মুচ্‌ড়াইয়া বঁড়শীর মত বাঁকিয়া গিয়াছিল। তার পর নান্দিদের উল্লাস দেখে কে! খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত সিংহের চারিদিকে তাহাদের চীৎকার আর বিজয়-নৃত্যের ঘটা চলিল। সুখের বিষয়, আহত শিকারী দুই জনেই বাঁচিয়া উঠিয়াছিল।

সিংহের তাড়া করিয়া আসা হইতে আরম্ভ করিয়া এত কাণ্ড শেষ হওয়া পর্য্যন্ত দশ সেকেণ্ডও সময় লাগে নাই। সে যখন পড়িল, তখন তাহার অবস্থাটি হইয়াছিল, ঠিক ভীষ্মের শরশয্যার মত!

আরবদেশে সিংহ-শিকার

ভিন্ন ভিন্ন দেশে সিংহ-শিকারের ভিন্ন ভিন্ন প্রথা আছে। আরবীয়েরা সাধারণতঃ গুলি-গোলা চালাইয়া সিংহ-শিকার করে না; সিংহের পথে মস্ত মস্ত চোরা গর্ত্ত করিয়া, তাহাতে তাহাদের জীবন্ত কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করে। গ্রীষ্মকালে সিংহেরা বড় একটা পাহাড়ের গুহা ছাড়ে না—ঘরের কাছাকাছি যথেষ্ট খাদ্য পায়; কিন্তু শীতকালে যখন খাবার জোটান তাহাদের পক্ষে ভারি মুস্কিলের ব্যাপার হয়, তখন তাহারা মানুষের আড্ডায় নামিয়া আসে। সেই কয়মাস আরবীয়েরা ভারি সাবধানে থাকে। পাশাপাশি গোল করিয়া তাঁবু খাটাইয়া, তাহার চারিদিকে চার হাত উঁচু বেড়া দিয়া রাখে। তাঁবু আর বেড়ার মধ্যের জায়গায় প্রায় ত্রিশ ফুট গভীর আর পনর ফুট চওড়া গর্ত্ত করিয়া রাখা হয়। তাহাদের গৃহপালিত পশুরা যাহাতে গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া প্রাণ না হারায়, সেই জন্য এই গর্ত্তের চারিদিকে আর একটা ছোট বেড়া দেওয়া হয়; এমনি করিয়া ফাঁদটি তৈরি করে।

সিংহ ক্ষুধার জ্বালায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া গরু ভেড়ার সন্ধানে তাঁবুর কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। পোষা জন্তুগুলাও তাহার গন্ধ পাইয়া প্রাণভয়ে চেঁচাইতে সুরু করে। এই চীৎকার শুনিয়া সিংহের জিবে জল আসে।

মহানন্দে লেজ নাড়িতে নাড়িতে সে তাঁবুর চারিপাশে ঘুরিতে আরম্ভ করে। এই ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার লোভ যখন বাড়িয়া যায়, তখন চার পাঁচ হাত উঁচু বেড়াকে সে বাধাই মনে করে না; খানিকটা পিছু হটিয়া পাল্লা নিয়া, সে একটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া লাফ দেয় এবং অবিলম্বে সেই গভীর গহ্বরের তলায় পড়িয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া যায়। সেখানে সে গড়াগড়ি দিতে থাকে। ইতিমধ্যে তাহার গর্জ্জন শুনিয়া, তাঁবু হইতে ছেলে-বুড়া, মেয়ে-পুরুষ সকলে আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে গর্ত্তের ধারে আসিয়া, বড় বড় পাথর চাপা দিয়া বেচারার জীবন শেষ করিয়া দেয়।

চোরা গর্ত্তে ফেলিয়া মারা ছাড়া অন্য উপায়ও আরব-শিকারীদের জানা আছে; তবে, বন্দুক হাতে একলা সিংহের মুখোমুখি হইতে তাহারা বড় একটা পছন্দ করে না। ডাক শুনিয়া কিংবা গরু ভেড়া মারিতে দেখিয়া যখন তাহারা সিংহের আগমন জানিতে পারে, তখন পঞ্চাশ ষাট জন সশস্ত্র হইয়া, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় জড় হইয়া সিংহ হত্যার উপায় ঠিক করে।

একটা পাহাড়ের তলায় আগুন জ্বালিয়া, তাহার চারিদিকে সবাই বসিয়া তামাক খায় আর দাড়িতে হাত বুলাইয়া নানা উপায় ঠাওরাইতে থাকে। ততক্ষণে দশ বার জন জানা লোককে সিংহের খবর আনিবার জন্য পাঠান হয়। তাহারা সমস্ত সঠিক জানিয়া আসিয়া খবর দিলেই, কাজ আরম্ভ করা হয়; বন্দুক ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করিয়া তাহাতে টোটা ভরিয়া, পাঁচ ছয় জন বাছাই করা লোককে পাহাড়ের চূড়ায় পাঠান হয়। সেখান হইতে তাহারা সিংহের গতিবিধি লক্ষ্য করে, আর আক্রমণের প্রথম হইতে সিংহের মৃত্যু পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়াইয়া, নানা পরিচিত ইসারায় নীচের লোকদের সিংহের খবর দেয়।

সিংহের কান ভারি প্রখর; অনেক সময় শিকারীদের পায়ের প্রায় নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারও তাহারা শুনিতে পায় এবং ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে শিকারীদের লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকে। অমনি পাহাড়ের উপরের চৌকীদারেরা ইসারায় সে কথা জানাইয়া দিয়া, সাবধান হইতে বলে। এই ভাবে উপরের লোকদের নির্দ্দেশমত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সিংহকে হত্যা করা হয়।

সিংহের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার ও হাতাহাতি লড়াইয়ের অনেক গল্প চলিত

আছে। সে সব পড়িতে পড়িতে শরীর শিহরিয়া উঠে! তাহার মধ্যে গর্ডন্ কামিং আর লিভিংষ্টোন্ সাহেবের সঙ্গে সিংহের যুদ্ধের গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিকারীর হস্তে সিংহের নিগ্রহ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কামিং সাহেব ইউরোপের একজন বিখ্যাত সিংহ-শিকারী। একদিন রাত্রিতে তিনি একটা বুনো মহিষ শিকার করিয়া, সকালে তাহার লাস্‌টা আনিবার জন্য চারিজন লোক পাঠান। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে, মহিষের অর্দ্ধেকটা একটা সিংহের পেটে গিয়াছে; সিংহটা তখনো কাছাকাছি লুকাইয়া আছে। মিঃ কামিং অমনি তাঁহার শিকারী কুকুরগুলি আর কতক-গুলি লোক সঙ্গে লইয়া সিংহ-শিকারে বাহির হইলেন। মহিষটা যেখানে ছিল সেখানে উপস্থিত হইয়াই, নদীর ধারে সিংহটাকে দেখা গেল—ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। একবার শান্তভাবে মিঃ কামিংয়ের দলটিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সিংহ নদীর ধারের ঝোপে-ঝাপে লুকাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কামিং সাহেব কুকুরগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে তাড়া করিলেন।

তাড়া পাইয়া সিংহ প্রথমটা থতমত খাইয়া প্রাণভয়ে দৌড় দিল। খানিকটা গিয়াই নিজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সে রুখিয়া দাঁড়াইল। কুকুরগুলি তখন তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ভয়ঙ্কর একটা গর্জ্জন করিয়া সিংহ একটা কুকুরের উপর লাফাইয়া পড়িয়া, এক থাবায় তাহাকে মাটিতে শোয়াইয়া ফেলিল। কামিং সাহেব ততক্ষণে কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। সম্মুখেই নদী, মাটি ভয়ানক পিছল; একটু অসাবধান হইলেই সর্ব্বনাশ। তাঁহার সঙ্গের লোকেরা তখনো অনেক পিছনে। সাহেব আর অগ্রসর হইতে সাহস না করিয়া, সেখান হইতে গুলি ছুড়িলেন। গুলিটা সিংহের গায়ে লাগিল না বটে, কিন্তু সে ভয় পাইয়া জলে ঝাঁপ দিল! এই অল্প সময়ের

মধ্যে সে তিনটা কুকুরকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। বাকি কুকুরগুলাও জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কামিং সাহেব নদীর ধারে আসিয়া, গুলি করিবার মতলবে খুব সাবধানে নামিয়া আসিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে জলের ধারে আসিতেই, পা হড়্কাইয়া একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। সিংহটা তখন তাঁহার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। বেগতিক দেখিয়া তিনি শুইয়া শুইয়াই গুলি ছুড়িলেন—ঠিক কাঁধের নীচে গুলি লাগিল। সিংহ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। রক্তে নদী লাল হইয়া গেল! কামিং সাহেব প্রাণের আশা ছাড়িয়া, একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন! সিংহটাও ততক্ষণে পারে আসিয়া গর্জ্জন করিয়া তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল! তিনি বিদ্যুৎগতিতে একেবারে জলের ভিতর নামিয়া গিয়া গুলি ছুড়িলেন। আর একবার গর্জ্জন হওয়ার পরই সব চুপ্‌চাপ্। সেই বিশালকায় হিংস্র জানোয়ার মাটিতে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল! এই শেষের গুলিটা ফস্কাইলেই, কামিং সাহেবকে আর ফিরিয়া আসিয়া এ সব গল্প শুনাইতে হইত না।

ডাঃ লিভিংষ্টোনের সিংহের গল্প আরও ভয়ানক ও অদ্ভুত। দক্ষিণ আফ্রিকার মাবোতোয়া নামে একটা জায়গায় তিনি তখন তাঁবু ফেলিয়াছেন; সেখানে ভয়ানক সিংহের উপদ্রব। গ্রামবাসীরা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা ভাবিত, এ সব অপদেবতার কীর্ত্তি। তাহারা শেষে লিভিংষ্টোন্ সাহেবকে গিয়া তাহাদের বিপদের কথা জানাইল। লিভিংষ্টোন্ সাহেব জানিতেন যে, যদি দলের একটা সিংহকে মারা যায়, তাহা হইলে অন্য সবগুলা সে স্থান ছাড়িয়া পলায়ন করে। তিনি একটা সিংহ মারিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। তাহাদের সাহস দিবার জন্য তিনি নিজেও সঙ্গে থাকিতে চাহিলেন। মাইল খানেক দূরে একটা ছোট্ট পাহাড় ছিল। সিংহের দল সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। পাহাড়টা ঘিরিয়া ফেলা হইল; আর একটু একটু করিয়া সকলে অগ্রসর হইতে লাগিল। হঠাৎ সাহেবের সঙ্গী—সেই-দেশী একজন লোক একটা সিংহকে দেখিয়া গুলি ছুড়িল; গুলিটা ফস্কাইয়া গিয়া পাহাড়ের গায়ে লাগিল। সিংহটা মুখ ফিরাইয়া, যে জায়গায় গুলি লাগিয়াছিল, সেই জায়গাটায় এক কামড় দিয়া, একটা ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

লিভিংষ্টোন্ অবিলম্বে আর একটা সিংহ দেখিতে পাইলেন—তাঁহার নিকট হইতে হাত পঞ্চাশ-ষাট দূরে বসিয়া আছে—তিনি একসঙ্গে দুই গুলি ছুড়িলেন। গ্রামের লোকেরা মহা উল্লাসে চীৎকার করিয়া সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেই, ডাঃ লিভিংষ্টোন্ তাহাদের থামাইয়া দিলেন। ঝোপের ভিতর দিয়া তিনি দেখিলেন, সিংহটা তখনো মাটিতে পড়িয়া যায় নাই; তাহার চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে—লেজ

খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দোনলা বন্দুকে বারুদ গাদিয়া আবার গুলি ছুড়িবার জন্য তৈরি হইতেছেন, হঠাৎ সঙ্গের লোকগুলার ভয়ার্ত্ত চীৎকারে মাথা তুলিতেই দেখিলেন, আহত সিংহটা লাফ দিয়া ঠিক তাঁহার মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে!

ডাঃ লিভিংষ্টোন্ একটা উঁচু পাথরের উপর দাঁড়াইয়া থাকা সত্ত্বেও সেই দুরন্ত জানোয়ার তাঁহার কাঁধে আসিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে সুদ্ধ মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। সাহেব নিজেই লিখিয়াছেন,—"আমার কানের কাছে ভীষণ গর্জ্জনধ্বনি শুনিলাম। বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নাড়া দেয়, সিংহটা তেমনি আমাকে ঝাঁকানি দিতে লাগিল। এই ঝাঁকানিতে আমার সমস্ত চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা কিছুই অনুভব করিবার শক্তি আমার ছিল না। রোগীকে ক্লোরোফর্ম্ করিলে যেমন হয়, আমারও ঠিক তাহাই হইয়াছিল; আমি সব দেখিতে পাইতেছিলাম বটে, কিন্তু কিছু বুঝিবার ক্ষমতা হারাইয়াছিলাম।"

ডাঃ লিভিংষ্টোনের ঘাড়ে সাম্নের থাবা রাখিয়া, সিংহটা শেষ আঘাত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময়, সাহেব বহুকষ্টে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, সে তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গীদের একজনের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। এই লোকটা সিংহকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িয়াছিল, কিন্তু গুলি ফস্কাইয়া যায়। লোকটার পায়ে এক কামড় দিয়া ঘাড়ে থাবা মারিবার আগেই, আর একজন আসিয়া বর্শার প্রচণ্ড আঘাতে তাহাকে শেষ করিয়া ফেলিল।

সিংহে সিংহে লড়াই

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশের বিখ্যাত শিকারীদের সম্বন্ধে যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহারা সকলেই মেজর্ লেভিসনের নামের সহিত পরিচিত। মাত্র সতের বৎসর বয়সে ইষ্ট্-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর চাকরি লইয়া তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং এখানেই শিকার-সম্বন্ধে প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তখন এখনকার চাইতে অনেক বেশী ছিল। সমস্ত দেশটাই ঘন অরণ্যে সমাবৃত ছিল—হিংস্র শ্বাপদ সর্ব্বত্র নির্ভয়ে বিচরণ করিত। সুতরাং ভারতবর্ষে হাতেখড়ি হওয়াতে শিকার-সম্বন্ধীয় শিক্ষার ভিত্তি তাঁহার পাকা হইয়াছিল। ইহার পর তিনি ইয়োরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশে শিকারের জন্য খ্যাতিলাভ করেন এবং আপনার জীবনের

অভিজ্ঞতা "বিভিন্ন দেশে শিকার" নামক একটি সুবিখ্যাত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। নিম্ন-লিখিত গল্পটি তাঁহার সেই পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল।

"আমরা তখন নেটাল প্রদেশের সন্নিহিত জঙ্গলে হাতী-শিকার করিয়া ফিরিতেছিলাম। আমার সঙ্গে বার জন ওলন্দাজ শিকারী ছিল। ইহারা প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত অশ্বারোহী এবং বন্দুক-পরিচালনায় শিশুকাল হইতেই অভ্যস্ত। ষ্টিভেন্‌সন্ ও আমি ইহাদের সঙ্গে থাকিয়া হাতীর সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। একদিন কাফ্রী-পথপ্রদর্শকেরা এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যস্থলে সিংহের পদচিহ্ন দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল ও সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলাম, অতি অল্পকাল পূর্ব্বে এই প্রান্তরের উপর দিয়া প্রভুরা গমন করিয়াছেন। সেই পদচিহ্ন ধরিয়া আমরা প্রায় এক মাইল গিয়া অরণ্যময় এক ভূখণ্ডে উপস্থিত হইলাম। আমরা যে হাতীর দলকে তাড়া করিতেছিলাম, তাহা তখন বহু মাইল দূরে ছিল, সুতরাং এখানে বন্দুকের শব্দ হইলে, হাতীদের ভয় পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে সিংহ-শিকারের লোভ হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা দুইদলে বিভক্ত হইলাম। একদল কয়েকটা কুকুর লইয়া হাতীর সন্ধানে যাত্রা করিল, অন্যদল সিংহ-শিকারের জন্য রহিয়া গেল। আমি শেষের দলে রহিলাম।

বনের ধারে উপস্থিত হইয়াই, আমরা চাপা গর্জ্জন ও মাঝে মাঝে জোর ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। বুঝিতে পারিলাম, ঝোপের ভিতরে পশুরাজে পশুরাজে যুদ্ধ বাধিয়াছে। আমাদের সঙ্গে যে কুকুরগুলি ছিল, তাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া, দলের কয়েকজন তাহাদের লইয়া আসিবার জন্য ফিরিয়া গেল। রয়টার্, জ্যান্‌সেন্, ষ্টিভেন্‌সন্ ও আমি সেখানে পায়চারি করিতে লাগিলাম। ঝোপের ভিতরকার তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া মনে হইল যেন, যোদ্ধারা কেহ কাহারো নিকট পরাস্ত হইবার কোন লক্ষণ দেখাইতেছে না। সিংহে সিংহে যুদ্ধ দেখিবার ইচ্ছা ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল। ষ্টিভেন্‌সন্ ও আমি অপর দুইজনের নিষেধ সত্ত্বেও, ঘোড়া হইতে নামিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া গেলাম। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইতেই, সেই রণাঙ্গন চক্ষে পড়িল। দেখিলাম, দুইটি বিপুলকায় জোয়ান সিংহ ঘোরতর যুদ্ধে মাতিয়াছে। আর একটা সিংহী দুইটাকেই উৎসাহিত করিবার জন্য তাহাদের চারিদিকে টহল দিতেছে। এই অপরূপ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই হয়। দুইটি যোদ্ধাই প্রকাণ্ড শরীর লইয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে—কেহ যে বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিতেছে, তাহা মনে হইল না। তাহাদের শরীরের আঘাত-চিহ্ন ও রণক্ষেত্রের বিপর্য্যস্ত অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম,

আমরা আসিয়া পড়িবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হইতেই যুদ্ধ সুরু হইয়াছিল। তিনটিতেই এই যুদ্ধব্যাপারে এমন আত্মহারা হইয়াছিল যে, আমাদের উপস্থিতি একেবারেই লক্ষ্য করে নাই। আমরা অতি সন্তর্পণে নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ গুলি করিয়া এইরূপ একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখার সুখ হইতে

"দুইটি বিপুলকায় জোয়ান সিংহ ঘোরতর যুদ্ধে মাতিয়াছে"—১৭০ পৃষ্ঠা।

বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা হইল না। দশ মিনিট কাল ব্যাপিয়া আমরা সবিশেষ আগ্রহের সহিত এই উত্তেজনাপূর্ণ যুদ্ধ দেখিলাম। তাহারা কখন খাড়া হইয়া, কখন বসিয়া, কখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া, পরস্পরকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া এবং ঘন ঘন গর্জ্জন করিয়া সেই বনভূমি কম্পিত করিতেছিল।

সহসা অদূরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা গেল এবং সিংহীটা যেন একটু সন্ত্রস্ত হইল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কান খাড়া রাখিয়া সেই শব্দ শুনিল। তার পর মৃদু মৃদু আওয়াজ করিয়া, সিংহদের সাবধান করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু যোদ্ধারা তখন উন্মত্ত, তাহার সতর্ক-ইঙ্গিতে কোন ফলই হইল না। অবস্থা বুঝিয়া সিংহী 'চাচা, আপনা বাঁচা'—এই নীতির অনুসরণ করিয়া পলাইবার চেষ্টায় যেই আমাদের গাছটির তলদেশে আসিয়াছে, অমনি ষ্টিভেন্‌সন্ তাহাকে গুলি করিল। গুলির সঙ্গে সঙ্গে সে গড়াইয়া কিছু দূর গিয়া একেবারে পাথরের মত নিশ্চল হইয়া গেল। গুলিটা তাহার খুলি ভেদ করিয়া মগজে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্য্য, বন্দুকের শব্দ, সিংহীর কাতর গোঙানি ইত্যাদিতেও সিংহ দুইটি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না,

যেমন মারামারি কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি করিতেছিল, তেমনি করিতে লাগিল। কুকুরগুলি তখন কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি আর চুপ করিয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া, একটা সিংহের কাঁধ লক্ষ্য করিয়া পর পর দুইটি গুলি ছুড়িলাম। অব্যর্থ লক্ষ্য। আহত হইয়া সে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমিশায়ী হইল। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। এই অবসরে ষ্টিভেন্‌সন্‌ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। গুলিটা তাহার পাঁজরে লাগিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া সিংহ এই প্রথম দেখিল যে, তাহার শত্রুরা তাহার হাতের নাগালেই আছে। আমাদের অবস্থা তখন সঙ্কটাপন্ন। আমরা যে গাছটার উপরে ছিলাম, সে এক লাফে তাহার সর্ব্বোচ্চ ডাল পর্য্যন্ত উঠিতে পারে! সব চাইতে বিপদ্‌, আমাদের বন্দুকে তখন টোটা ভরা ছিল না। সেই অবস্থায় টোটা ভরিতে গেলেও রক্ষা নাই। আমরা মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সহসা সিংহ মৃত সিংহীকে দেখিতে পাওয়ায় আমাদের বিপদ্‌ কাটিয়া গেল। সিংহীকে নিশ্চলভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, সে একটা অতি কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার নিকটে গিয়া, তাহার মুখ, ঘাড়, সর্ব্বাঙ্গ চাটিতে সুরু করিল। শত্রুরা যে এত কাছে রহিয়াছে, তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না। সিংহীকে জাগাইবার জন্য সে আপনার বিরাট থাবা দিয়া তাহার গায়ে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে লাগিল। যখন দেখিল যে, সিংহী কিছুতেই উঠিল না, তখন সে চুপ করিয়া থাবা পাতিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল ও করুণভাবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। এবারে সিংহের দৃষ্টি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত দেহের উপর পতিত হইল। তাহাকেই সিংহীর মৃত্যুর কারণ বিবেচনা করিয়া, সে ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে সেই মৃতদেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সৌভাগ্য-ক্রমে ঠিক এই সময়ে কাফ্রীদের কুকুরেরা ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সিংহও বিপদ্‌ বুঝিয়া সেখান হইতে দ্রুত পলায়ন করিল।

আমরা গাছ হইতে নামিয়া, নূতন দলের সঙ্গে কুকুরগুলিকে লইয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই সিংহকে দেখা গেল। সে ফিরিয়া ফিরিয়া আমাদের দেখিতেছিল। তাহাকে তাড়া করিয়া আমরা বন ছাড়িয়া প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। এখানে কাফ্রীরা বর্শা হাতে সম্মুখ দিক্‌ হইতে তাড়া করিল। সিংহ মহা ফাঁপরে পড়িল। উপায়ান্তর না দেখিয়া সে বীরের মত এক জায়গায় থাবা পাতিয়া বসিল। কুকুরেরা ঘেউ ঘেউ করিয়া এক একবার তাহার কাছে যায়, আর সে থাবা উঠাইয়া তাহাদের আঘাত করিতে চেষ্টা করে। দেখিতে দেখিতে কয়েকটি কুকুর হত ও আহত হইল।

ইতিমধ্যে কাফ্রীরা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে এবং ওলন্দাজ শিকারীরাও বন্দুক হাতে উপস্থিত হইয়াছে। জ্যান্‌সেন্ এইবারে গুলি করিল। তাহার গুলি ঠিক সিংহের বক্ষ ভেদ করিল। সে আর উঠিল না।

মৃত সিংহ তিনটির যথোপযুক্ত সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, আমরা হাতীর সন্ধানে পুনরায় যাত্রা করিলাম।"

গল্প নহে—সত্য ঘটনা

দুইটি পার্ব্বত্য সিংহের পাল্লায় পড়িয়া একবার একজন প্রসিদ্ধ শিকারীকে কি পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, নিম্নের ঘটনা হইতে তাহা জানিতে পারা যাইবে। শিকারী ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতেছিলেন—কোন জন্তু দেখিতে পাইলেই গুলি করিবেন। এমন সময় সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিছু দূরে পাহাড়ের আড়াল হইতে একটা সিংহ উঁকি মারিতেছে। সিংহ নীচের ঢালু জমিতে একটা হরিণের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।

উত্তম সুযোগ মিলিয়াছে ভাবিয়া, শিকারী সিংহের কপালে বন্দুক লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু গুলি আর করা হইল না। ঠিক সেই সময় আর একটা সিংহ উপর হইতে তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিল। তিনি ঘোড়া হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া ঢালু জমি দিয়া গড়াইয়া চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটাও পড়িয়া গেল।

"শিকারী ঢালু জমি দিয়া গড়াইয়া চলিলেন।"

ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই দেখিলেন তিনি মাটিতে বরফের উপর

চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া আছেন, আর সিংহটা তাঁহার উপরে! একটা থাবা তাঁহার বুকে রাখিয়া, রাগে গর্জ্জন করিতেছে আর লেজটা এদিক্ ওদিক্ আছ্ড়াইতেছে।

শিকারী মিনিট দুই চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে হাত্ড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার ছুরিটা কোথায়। এই সময় সিংহ একটা বিকট আওয়াজ করিল। শিকারী বুঝিতে পারিলেন, সে অন্য সিংহটাকে ডাকিতেছে। সর্ব্বনাশ! তিনি সিংহের চোখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, হুঁসিয়ারভাবে পিছনের দিকে হাত বাড়াইয়া, বন্দুকটার খোঁজ করিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহার আঙ্গুল একটা বেশ শক্ত জিনিসে ঠেকিল, সেইটাই বন্দুকের বাঁট। ধীরে ধীরে তিনি সেটা টানিয়া কাছে আনিলেন। তার পর চক্ষের পলকে তাহা বাগাইয়া ধরিয়া সিংহের বুকে এক গুলি মারিলেন। গুলি সিংহের বুক ফুটা করিয়া তাহার জীবন-লীলা শেষ করিয়া দিল।

প্রথম সিংহটা এতক্ষণ পাহাড়ের আড়ালেই ছিল। সঙ্গীর দশা দেখিয়া, সে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া শিকারীর উপর লাফাইয়া পড়িল। সৌভাগ্যবশতঃ বেশী জোরে লাফ দেওয়াতে, সিংহ তাঁহার উপর না পড়িয়া, পড়িল গিয়া তাঁহার অন্য পাশে। শিকারীও সেই মুহূর্ত্তে ফিরিয়া, এক গুলিতে তাহার মগজ উড়াইয়া দিলেন! দুইটা সিংহ পরস্পর দশ ফুট ব্যবধানে মরিয়া পড়িয়া রহিল।

---

[২]

দক্ষিণ আফ্রিকার আর একটি শিকারীকে ইহার চাইতেও সাংঘাতিক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। শিকারী একস্থান হইতে বাড়ীতে ফিরিতেছিল। ভাবিয়াছিল, বেশী বেলা হইবার পূর্ব্বেই বাড়ীতে পৌঁছিবে। কিন্তু কিছু দূরে একটা ঝরণার-পথে হরিণের সন্ধানে গিয়া তাহার দেরী হইয়া পড়িল।

তৃষ্ণার্ত্ত শিকারী যখন ঝরণার কাছে পৌঁছিল, তখন রৌদ্র খুব বাড়িয়া গিয়াছে। জলপান করিয়া পিপাসা মিটিল বটে, কিন্তু তাহার শরীরের ক্লান্তি দূর হইল না।

বন্দুকটা পাশে রাখিয়া, একটা ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিয়া সে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

খানিক পরেই রৌদ্রের তেজে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; আর সে জাগিয়াই দেখিল, সম্মুখে প্রকাণ্ড এক সিংহ! ক্ষণকাল শিকারী আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। তার পর খুব ধীরে ধীরে যাই বন্দুকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে, অমনি সিংহ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে শিকারীও যে মুহূর্ত্তমধ্যে হাত টানিয়া লইল, তাহা বলাই বাহুল্য। খানিক পরে আবার চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিল, সিংহ আরও বেশী চটিয়া যায়। শেষে সে বন্দুক লইবার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিল। কি জানি, সিংহ যদি ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে।

ক্রমে সূর্য্য ঠিক মাথার উপর আসিল। শিকারী যে পাথরের উপর বসিয়াছিল, দারুণ রৌদ্রে দেখিতে দেখিতে তাহা আগুন হইয়া উঠিল। তাহার উপর বসিয়া থাকা দূরের কথা, কাহার সাধ্য তাহা স্পর্শ করে! হতভাগ্য শিকারীর কিন্তু নড়িবার যো নাই। পশুরাজ ঠায় সেখানে বসিয়া তাহার উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

কি অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তাহার দিন কাটিতে লাগিল, তাহা কল্পনা করিতেও আমরা অক্ষম। যাহা হউক, দিন শেষ হইল, রাত্রি উপস্থিত—সিংহ তখনও বসিয়া। ক্রমে রাত্রি কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিনও কাটিল, তবু সিংহ এক পা-ও নড়িল না।

তার পর কি হইল? তৃতীয় দিন সকালে সিংহকেই হার মানিতে হইল! পিপাসার কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, সে ধীরে ধীরে ঝরণার দিকে চলিল। জলপানের পর হঠাৎ কি একটা শব্দে আকৃষ্ট হইয়া, জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

বেচারী শিকারীর কথা আর কি বলিব! তাহার দুই পা এবং অন্য কোন কোন অঙ্গ ঝল্সিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থায় কোন রকমে বন্দুকে ভর দিয়া, হামাগুড়ি দিতে দিতে সে ঝরণার কাছে গিয়া দারুণ পিপাসা দূর করিল। তার পর সেই ভাবেই অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল।

---

[৩]

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার 'জীবজন্তু' নামক পুস্তকে ঠিক এইরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন:—"আফ্রিকার কোন সাহেবের এক ভৃত্য বনের ভিতর দিয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতেছিল। পথে হঠাৎ এক সিংহের সম্মুখে পড়ে। অমনি তাড়াতাড়ি নিকটের এক গাছের উপর চড়িয়া পড়িল। চড়িবার সময় সিংহ আসিয়া লাফাইয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করে। অল্পের জন্য লোকটি বাঁচিয়া গেল। সিংহ নাগাল পাইল না। তার পর সিংহটা সেই গাছতলায় বসিয়া রহিল; ক্রমে দুই প্রহর হইল, রৌদ্রের তাপে ও তৃষ্ণায় লোকটির বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল; তার পর সন্ধ্যা হইল, তবুও সিংহ নড়িল না। লোকটি নিরুপায় হইয়া নিজের গায়ের কাপড় দিয়া, গাছের ডালের সঙ্গে আপনার শরীরটাকে বাঁধিয়া ফেলিল—যেন রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে পড়িয়া না যায়। ক্রমে গভীর অন্ধকার হইল, চারিদিক্ নিস্তব্ধ' মাঝে মাঝে দূরে অন্য সিংহের গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল। এ সিংহটা গাছতলাতেই শুইয়া রহিল। প্রভাত হইলে লোকটির মনে আশা হইল, বুঝি রোদ উঠিলেই সিংহ পলাইবে বা অন্য লোকজন তাহার খোঁজে এই পথে আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে। ক্রমে আবার বেলা হইল, পরে সন্ধ্যা হইল। সিংহ জল খাইবার জন্য আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন লোকটি মনে করিল, বুঝি এই সুযোগে পলাইতে পারিবে। সিংহটা কি মনে করিয়া আবার ফিরিল। এইরূপ মাঝে মাঝে তিন চার বার চলিয়া গিয়াই তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল। তার পর আবার রাত্রি হইল। দিনের রৌদ্রের তাপে, ভীষণ তৃষ্ণায় লোকটির ছাতি ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া মাথা ঘুরিতে লাগিল। শরীর বাঁধা না থাকিলে সে পড়িয়াই যাইত। জীবনে নিরাশ হইয়া তাহার অন্তিমকালের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। ক্রমে প্রভাত হইল। তখন দেখিল, দূরে কয়েকজন ঘোড়ায় চড়িয়া এই দিকে আসিতেছে। তখন তাহাদিগকে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "এখানে সিংহ আছে, সাবধান হও।" তাহারা সেই শব্দ শুনিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া দূর হইতে গুলি করিয়া সিংহকে মারিল ও সেই লোকটিকে গাছ হইতে নামাইল। তার পর জল আনিয়া তাহাকে পান করাইয়া অনেকটা সুস্থ করিল।"

---

[৪]

মানুষ-খেকো সিংহ সংখ্যায় খুব বেশী না হইলেও, ইহাদের কোন কোনটার অত্যাচারের কথা শুনিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। আফ্রিকার উগাণ্ডা প্রদেশে যখন রেল-লাইন প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময় সেখানে এই শ্রেণীর কয়েকটা সিংহের উৎপাত আরম্ভ হয়। কুলী-লাইন হইতে খাদ্য-সংগ্রহের জন্য ইহারা কোন বিপদকেই বিপদ্ জ্ঞান করিত না। যাহার উপর ইহাদের লুব্ধদৃষ্টি পড়িত, তাহার মৃত্যু একেবারে অনিবার্য্য! তাঁবুর চারিদিকের বেড়া যথাসম্ভব সুদৃঢ় করিয়া, তাঁবুর দরজা সাধ্যমত দুর্ভেদ্য করিয়া, সারা রাত নানা স্থানে আগুন জ্বালাইয়া, প্রত্যেক তাঁবু হইতে ঘন ঘন বন্দুক ছুড়িয়া এবং কাঁসর-ঘণ্টা-কানাস্তারা প্রভৃতি বাজাইয়া হল্লা করিয়াও, ইহাদিগকে তাড়াইতে অথবা ইহাদের আক্রমণ হইতে হতভাগ্য কুলীদিগকে রক্ষা করিতে পারা যাইত না। চারিদিকে ক্রমে এমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, দলে দলে কুলী কাজ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইল এবং রেলের কাজ-কর্ম্মও কিছুদিনের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির অক্লান্ত চেষ্টায় সিংহগুলা নিহত হইলে পর, আবার কাজকর্ম্ম চলিতে থাকে।

কিন্তু কাজকর্ম্ম চলিলেও, নূতন নূতন মানুষ-খেকো সিংহ আসিয়া আসর গরম রাখিতে ত্রুটি করিত না। একটা সিংহ স্থানীয় রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে আড্ডা গাড়িয়া যে কি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মানুষ খাইতে খাইতে তাহার রক্ত-মাংসের লোভ এতটা বাড়িয়া যায় এবং সে এত দুর্দ্দান্ত ও সাহসী হইয়া উঠে যে, একদিন দেখা গেল, সে ষ্টেশনের ছাদের উপর লাফাইয়া উঠিয়া, ভিতরে ঢুকিবার জন্য 'করোগেটেড' লোহার চাদর ফাঁক করিবার চেষ্টা করিতেছে! সিংহের পা কাটিয়া রক্তারক্তি, তবু তাহার তেজ দেখে কে! ব্যাপার দেখিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার প্রভৃতির অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন পুলিসের এক বড় সাহেব তাঁহার দুইটি বন্ধুর সহিত রেলপথে যাইতে যাইতে খবর পাইলেন, নিকটবর্ত্তী একটা ছোট ষ্টেশনে মানুষ-খেকো সিংহের ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। তিন বন্ধুতে পরামর্শ করিলেন যে, সে রাত্রি সেখানে গাড়ীতে থাকিয়া সেই নর-খাদকের পরলোক প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিবেন।

যথাসময় রেলগাড়ী সেই ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট গাড়ীখানা 'সাইডিং'এ রাখাইয়া, রাত্রে আহারাদির পর তিনজনে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইলেন।

এইরূপ স্থির হইল যে, তিনজনে সারারাত না জাগিয়া, পালাক্রমে একজন করিয়া জাগিবেন আর দুইজন করিয়া ঘুমাইবেন। পুলিস-সাহেব প্রথম রাত্রি জাগিয়া পাহারায় নিযুক্ত রহিলেন। বন্ধুদ্বয়ের একজন 'আপার্ বার্থে', অন্য জন মেঝেতে ঘুমাইলেন।

বড় সাহেব বন্দুক ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন, আর চারিদিকে সতর্ক-দৃষ্টি রাখিয়াছেন। হঠাৎ কোন্ দিক্ দিয়া মানুষ-খেকোর আবির্ভাব হয়, কে বলিতে পারে। তাঁহার পাহারার সময় ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি সিংহের দেখা নাই। বসিয়া বসিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং চারিদিক্ আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া, মাঝখানের অন্য একটা 'বার্থে' চড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। হায়! তখন কে জানিত, সেই নিদ্রাই তাঁহার চিরনিদ্রা হইবে।

সিংহ এতক্ষণ কোথায়, কি ভাবে আত্মগোপন করিয়াছিল বলা কঠিন, কিন্তু যেখানেই থাক, সে যে সাহেবের সমস্ত চাল-চলন, গতি-বিধি লক্ষ্য করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বড় সাহেব নিদ্রা যাইবার কয়েক মিনিট পরেই সে গাড়ীর কাছে উপস্থিত হইল এবং কয়েক ধাপ উচ্চ সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া, গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। 'সাইডিং'এর জমি সমতল ছিল না বলিয়া, গাড়ী একপাশে একটু ঝুঁকিয়াছিল; সিংহ ভিতরে প্রবেশ করিলে পর, দরজা গড়াইয়া আসিয়া বন্ধ হইয়া গেল।

সেদিকে সিংহের লক্ষ্য নাই। গাড়ীর মধ্যে আর যে দুইজন আছেন, তাহাও সে গ্রাহ্য করিল না। নীচের লোকটির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, সে বড় সাহেবকে সক্রোধে আক্রমণ করিল এবং তাঁহাকে লইয়া গাড়ীর একটা জানালা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া গেল।

বন্ধু দুইটি অক্ষত শরীরে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সিংহ সাহেবকে লইয়া এত ব্যস্ত ছিল যে, ইহাদিগের দিকে মনোযোগ দিবার অবসর পায় নাই।

সুখের বিষয়, কয়েকদিন পরে ষ্টেশন-কর্ম্মচারিগণের বিশেষ চেষ্টায় এই দুরন্ত জানোয়ার ধৃত ও নিহত হইয়াছিল।

[৫]

সিংহ রাগিয়া মরিয়া হইয়া উঠিলে, তাহার চেহারা কিরূপ ভয়ঙ্কর হয়, মুখ দিয়া সে কিরূপ সাংঘাতিক শব্দ করিতে থাকে, প্রসিদ্ধ শিকারী 'থিওডর্ রুজ্‌ভেল্ট্' প্রণীত একখানা পুস্তকে তাহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

রুজ্‌ভেল্ট্ লিখিয়াছেন—"একদিন আমি, 'কার্মিট্' আর 'কার্লটন' ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে বাহির হইয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে আরও লোকজন ছিল;

পথে কার্‌মিটের ঘোড়া হঠাৎ খোঁড়া হইয়া যায়। দুইটি লোক দিয়া সেটাকে তাঁবুতে পাঠাইয়া দিলাম। কারমিট্‌ হাঁটিয়াই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

প্রায় এক মাইল পথ গিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম, খোঁড়া ঘোড়ার একজন রক্ষক চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। সে নিকটে আসিয়া বলিল,

"সিংহ বিদ্যুৎবেগে আমাদের তাড়া করিল"—১৮০ পৃষ্ঠা

'হুজুর, প্রকাণ্ড এক সিংহ ঐ মাঠের মধ্যে একটা মরা জেব্রাকে খেতে লাগছে। জেব্রাটাকে বোধ হয় সে কাল রাত্তিরে মেরেছে।'

সিংহের খবর পাইয়া, আমি আর কার্‌লটন্‌ সেইদিকে ঘোড়া ছুটাইলাম। বেচারী কার্‌মিট্‌ও আমাদের পিছনে ছুটিল। কয়েক মিনিট পরেই, কার্‌লটন্‌ আঙ্গুল

দিয়া সিংহটাকে দেখাইল। চমৎকার সিংহ! কাল-হলদে মিশান তাহার কেশর। আমরা তখনই তাহাকে তাড়া করিলাম।

সিংহটা ধীর গম্ভীর চালে খানিকদূর গিয়াই একটা ঝোপের পিছনে থামিল। প্রায় দুই শ' গজ দূর হইতে আমি গুলি করিলাম। গুলি তাহার থাবা পর্য্যন্ত পৌঁছিল বটে, কিন্তু আঘাতটা সাংঘাতিক হইল না। সিংহ রাগে গর্জ্জিয়া উঠিয়া, লেজ আছ্‌ড়াইতে আছ্‌ড়াইতে আবার ছুটিল।

আমরাও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিলাম। খানিক দূর গিয়াই কার্‌লটন্‌ গুলি করিল, কিন্তু দূরত্বের হিসাবে ভুল হওয়ায়, তাহার গুলি ততদূর পৌঁছিল না।

তখন আমি আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গুলি ছাড়িলাম। দূরত্ব-সম্বন্ধে আমারও একটু ভুল হইল। তাহার ফলে সিংহ ভীষণ রাগিয়া গেল। হুঙ্কার ছাড়িতে ছাড়িতে সে মাথা নীচু করিয়া, লেজ উঠাইয়া, বিদ্যুৎবেগে আমাদের তাড়া করিল।

কার্‌লটনের গুলি এবারেও ব্যর্থ হইল। কিন্তু আমি তাহার বুক লক্ষ্য করিয়া ফুস্‌ফুস্‌ একেবারে ফুটা করিয়া দিলাম। সিংহটা মুহূর্ত্তের জন্য সোজা হইয়া উঠিয়াই উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

তবুও সে একেবারে দমিল না। একটু দম লইয়া আবার খাড়া হইয়া আমাদের দিকে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এপাশ ওপাশ টলিয়া পড়িতেছে—ভাল করিয়া দাঁড়াইতে পারে না, তবু তাহার রোক্‌ কত!

এই অবস্থায় কার্‌লটন্‌ সিংহকে আর এক গুলি করিল। গুলি লাগিল ঠিক তাহার কাঁধে। ইহার পর আমি শেষ গুলি মারিয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিলাম।

একটু আগে গুলি খাইয়া, সিংহটা যখন আমাদিগকে তাড়া করিয়া আসিতেছিল, তখনকার দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। কার্‌মিট্‌ তখন পথে। সেই লোমহর্ষণ দৃশ্যটি যদি কেহ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়া থাকে, তবে সে কার্‌মিট্‌।"

চিতাবাঘ-শিকার

ডোরাদার বাঘ অপেক্ষা আকারে ছোট হইলেও, চিতাবাঘকে লোকে বাঘের চাইতে কম ভয় করে না। চিতা ধূর্ত্ততার জন্য প্রসিদ্ধ, গাছে চড়িতেও অদ্বিতীয় এবং ইহার দৌড়িবার শক্তিও অসাধারণ; এই সমস্ত কারণে চিতা-শিকার খুব সহজসাধ্য নহে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বুওর্‌গণের সাহস ও শিকারপটুতা চিরপ্রসিদ্ধ। একবার হেণ্ডরিক্ নামে এক বুওর্-যুবক তাহারই গ্রামের অপর এক ব্যক্তির বাড়ীতে কিছুদিন বাস করিতেছিল। সেই লোকটির মেয়ের সহিত যুবকের বিবাহের সম্বন্ধ হয়। হঠাৎ একদিন সকালে সেই বাড়ীতে হৈ-চৈ শুনা গেল; একটা চিতা রাত্রে আসিয়া কয়েকটা মুর্গী ও হাঁস মারিয়া পলাইয়াছে। বাড়ীর কর্ত্তা ত ভাবিয়া আকুল। হেণ্ডরিকের ভাবী পত্নীরও দুঃখের সীমা নাই। হেণ্ডরিক্ এই সব দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল যে, সে এই চিতাকে না মারিয়া সেখান হইতে নড়িবে না।

প্রতিজ্ঞা করিয়া যুবক মহা ফাঁপরে পড়িল। আশে পাশে চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল, চিতার সন্ধান পাওয়া একরূপ অসম্ভব। অথচ ভাবী পত্নীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেটা না রাখাও ভাল দেখায় না।

কিন্তু হেণ্ডরিকের ভয়ের কোন কারণ ছিল না। চিতামহাশয় একবার যেখানে একটু রসনা-পরিতৃপ্তিকর বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন, সেখানে তিনি পুনরায় ফিরিতে ইতস্ততঃ করিলেও, না ফিরিয়া পারেন না। পরদিন সন্ধ্যা হইতে হেণ্ডরিক্ কান খাড়া করিয়া রহিল, একটু শব্দ পাইলেই হয়! কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে চিতার কোন খবরই নাই। ভোরের দিকে হেণ্ডরিকের যেই একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছে, অমনি হাঁস-ঘরে হাঁসগুলি ভয়ে প্যাঁক্ প্যাঁক্ করিয়া উঠিল। একনলা বন্দুকটি হাতে লইয়া হেণ্ডরিক্ চুপি চুপি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ধূর্ত্ত চিতাকে ঠকান কঠিন, সে হেণ্ডরিকের মনোভাব জানিতে পারিয়া, লেজ গুটাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের দিকে ছুটিল। যুবক তখন চিতা মারিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে; চিন্তামাত্র না করিয়া সেই একনলা বন্দুক লইয়াই, সে তাহার দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়িয়া চিতার অনুসরণ করিল।

তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে। একটা জলাভূমির সম্মুখে আসিয়া ঘোড়া থামিল। হেণ্ডরিক্ নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া, শুধু আপন শৌর্য্য ও বীর্য্যের

পরিচয় দিবার জন্য, ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া, একেলা সেই চিতার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। তাহাকে বেশীদূর যাইতে হইল না; একটা ঝোপের মধ্যে একটি হরিণের মৃতদেহের খানিকটা দেখা গেল। হেণ্ডরিকের মনে হইল, হরিণটি সম্ভবতঃ চিতার দ্বারাই নিহত হইয়াছে। মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে করিতে যুবকের দৃষ্টি সহসা ঠিক উপরের একটা বৃক্ষ-শাখায় পতিত হইল। চিতা সেখানে একটা শাখা অবলম্বন করিয়া গুঁৎ পাতিয়া বসিয়াছিল এবং রক্তাক্ত দন্ত বিকসিত করিয়া ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে হেণ্ডরিক্‌কে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

হেণ্ডরিক্ বন্দুক তুলিল, কিন্তু ঘোড়া টিপিবার পূর্ব্বেই চিতা গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে সুরু করিল; হেণ্ডরিক্ পলায়নপর চিতাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। তাহার লক্ষ্য অব্যর্থ। চিতাটি আহত হইয়া একবার করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া আবার দৌড়াইতে সুরু করিল। যুবক ঘোড়ায় চড়িয়া আবার তাহার পাছু লইল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা এক গভীরতর জঙ্গলের ধারে আসিয়া পৌঁছিল এবং অনতিবিলম্বে জন্তুটা হেণ্ডরিকের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল।

কিন্তু চিতার রক্তের দাগ দেখিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে যুবককে বেগ পাইতে হইল না। বন্দুকটি বাগাইয়া ধরিয়া, সে গাছপালা সরাইতে সরাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। খালের ধারে আসিয়াই হেণ্ডরিক্ চিতাকে দেখিতে পাইল; এবার জন্তুটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। রোষকষায়িত নেত্রে হেণ্ডরিক্‌কে দেখিতে দেখিতে সে রাগে গর্জ্জাইতে লাগিল। হেণ্ডরিক্ দ্বিতীয়বার গুলি ছুড়িল। চিতা একমুহূর্ত্ত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া একেবারে ঝাঁপাইয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িল। এরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া, যুবক একটু থতমত খাইয়া গেল, তাহার হাত হইতে বন্দুক পড়িয়া গেল। সে কোমরে বাঁধা ছোরাখানা বাহির করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই চিতা তাহার কাঁধে এমন ভীষণ কামড় বসাইয়া দিল যে, হেণ্ডরিক্ বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এই চরম বিপদের সময় তাহাকে সাহায্য করিতে পারে, এমন কেহ অন্ততঃ পাঁচ মাইলের মধ্যে ছিল না। যুবক স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সেই আহত ভীষণ প্রতিশোধ-পরায়ণ চিতার সহিত তাহাকে একলাই লড়িতে হইবে—হয় মৃত্যু, নয় বিজয়। হেণ্ডরিকের ডান হাতটি তখনও অক্ষত ছিল। চক্ষের নিমেষে ছোরা বাহির করিয়া, চিতার ঠিক বক্ষস্থলে সে আমূল প্রোথিত করিয়া দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চিতার থাবা শিথিল হইয়া আসিল, সে সশব্দে অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু পড়িবার পূর্ব্বে চিতা নখে ও দন্তে যুবকের ডান উরু একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিল। চিতার ভারে হেণ্ডরিক্‌ও

মাটিতে গড়াইয়া পড়িল, তাহার একটা হাত ভাঙিয়া গেল। সে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আঘাতে ও যন্ত্রণায় এমন কাতর হইয়া পড়িয়াছিল যে, আবার মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত চিতার পাশেই পড়িয়া রহিল।

হেণ্ডরিকের যখন জ্ঞান হইল, তখন প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। সে প্রায় দশ ঘণ্টা মূর্চ্ছিত ছিল, অথচ তখনও পর্য্যন্ত গ্রাম হইতে কেহ তাহার সাহায্যার্থে আসে নাই! বেচারি তৃষ্ণায় ছটফট্ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার এমন শক্তি ছিল না যে, উঠিয়া জলের কাছে যাইতে পারে। মৃত্যু স্থির জানিয়া, যুবক শান্তভাবে পড়িয়া রহিল। তখন তাহার একমাত্র আশা এই যে, ঘোড়াটি বাড়ী ফিরিয়া গিয়া থাকিবে; তাহাকে একা ফিরিতে দেখিয়া, গ্রামের লোকজন নিশ্চয়ই আসিয়া পড়িবে।

দুই একবার সে নড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ এমন অবশ হইয়া পড়িয়াছিল যে, এক ইঞ্চি নড়িবারও সামর্থ্য ছিল না। হঠাৎ যুবকের মনে হইল, তাহার কাঁধের কাছে কি যেন একটা নড়িতেছে! একটা শীতল স্পর্শও যেন সে পাইতেছিল।

সাপটা মাথা তুলে ফোঁস্ ফোঁস্ ক'র্‌ছে।

এইভাবে মৃত্যুর চিন্তা করিতে করিতে, অসহ্য দৈহিক যন্ত্রণা ও তত্যোধিক মানসিক অশান্তিতে তাহার রাত্রি কাটিয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে অন্য কোন বন্যজন্তু সে জায়গায় ছিল না, নতুবা এই গল্প শুনাইবার জন্য হেণ্ডরিক্‌কে বাঁচিয়া থাকিতে হইত না। ভোরের আলোয় একটু একটু করিয়া অন্ধকার দূর হইতে লাগিল। যুবক বহুকষ্টে বন্দুকটা ধরিয়া, তাহাতে ভর দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেই দেখিল, এক ভয়ানক সাপ তাহাকে জড়াইয়া শুইয়া আছে। সম্ভবতঃ তাহার গায়ের স্পর্শে একটু গরম হইবার আশায়, সে তাহার গা ঘেঁসিয়া শুইয়াছিল। সাপটা যেন একটু একটু নড়িতেছিল! হেণ্ডরিকের মনে হইল, সাপটা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহার রক্ত শুষিয়া খাইয়াছে—তাহার আর রক্ষা নাই! এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার এমন দুর্ব্বলতা অনুভব করিল যে, পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

এইবার জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে লোকজনের কোলাহল শুনিতে পাইল। গ্রামের লোক আসিয়া পড়িয়াছিল। গোলমাল শুনিয়া সাপটা হেণ্ডরিক্‌কে ছাড়িয়া, দ্রুতগতিতে জঙ্গলের ভিতর চলিয়া গেল। এইভাবে বেচারার প্রাণ রক্ষা হইল।

নিম্নের গল্পটি নদীয়াজেলা-নিবাসী শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ মৈত্রের লিখিত। শুনিয়াছি, তাঁহার বয়স অল্প। এই বয়সেই শ্রীমান্ পর পর দুইটা চিতাবাঘ শিকার করিয়াছেন জানিয়া, আমরা তাঁহার সাহসের তারিফ না করিয়া পারি না।

বিনয়েন্দ্রনাথ লিখিয়াছেনঃ—"নদীয়ার নানা স্থানে, পল্লীর বনেজঙ্গলে অনেক সময় চিতাবাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আগমন শৃগালের 'ফেউ' ডাকে বুঝিতে পারি। এই ফেউ ডাকের সঙ্গে বাঘের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, ইহার প্রমাণ আমরা অনেকবার পাইয়াছি।

১৯২২ সালের মার্চ্চ মাসে, আমাদের পল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রামে একটা চিতাবাঘ আসিয়াছিল এবং গৃহস্থের কুকুর, ছাগল ইত্যাদি মারিয়া বিশেষ ক্ষতি করিতেছিল। সংবাদ পাইবামাত্র তাহাকে মারিবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, কিন্তু প্রায় এক মাস চেষ্টা করিয়াও আমরা তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না। উপরন্তু গ্রামবাসীদের অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপও হজম করিতে হইল।

একদিন সংবাদ পাইলাম, এক গৃহস্থের বধূ সকাল বেলা উঠান ঝাঁট দিতেছিলেন, হঠাৎ বাঘটা তাঁহার উপর রুখিয়া আসে, কিন্তু সেখানে অন্য লোকজন উপস্থিত থাকায় এবং সকলে মিলিয়া হৈ-চৈ করায়, সে ভয় পাইয়া বাড়ীর নিকটেই এক জঙ্গলে প্রবেশ করে। এই ঘটনার কিছু পরেই বাঘটা সেই গ্রামের অন্য একটি লোককে জখম করিয়াছে।

এই সংবাদ পাইবামাত্র আমরা কয়েক জনে মিলিয়া ঘটনাস্থলে উপাস্থত হইলাম। স্থানটি ছিল আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে। সেখানে গিয়া প্রথমেই আমরা সেই আহত লোকটিকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, বাঘ বেচারার ডান হাতখানাতে কামড় বসাইয়াছে; বেদনায় নিতান্ত অস্থির হইয়া লোকটি কাঁদিতেছে! ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'আমি বাঘকে ঘাঁটাতে যাই নি, সে কোথায় ছিল, তাও জান্‌তাম না। নদী থেকে জলের কলসী মাথায় ক'রে বাড়ী ফিরছিলাম; হঠাৎ রাস্তার পাশের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে বাঘটা আমায় চেপে ধ'র্‌লে। আমি যতই তাকে ঠেলে ফেল্‌তে চেষ্টা করি, সে ততই আমার হাতে কাম্‌ড়াতে থাকে।

আমার মাথা থেকে কলসীটা পড়ে ভেঙে গেল। সেই শব্দেও সে ভয় পেলে না। বরং আরো জোরে কামড়াতে লাগ্‌ল। এই ভাবে কামড়ে কামড়ে, হাতখানা রক্তারক্তি ক'রে, সে কাছেই একটা জঙ্গলে ঢুকে পড়্‌ল।'

আমরা সেই জঙ্গলে গিয়া বাঘের অন্বেষণ আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক আসিয়া খবর দিলেন, বাঘটা সেখান হইতে অন্য একটা জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছে—তিনি নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন। কোন্ বনে গিয়াছে, তাহাও তিনি দেখাইয়া দিলেন। তখন আমরা এই দ্বিতীয় জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম।

আমাদের গ্রামে একটি লোক আছে, সে চিতাবাঘ-শিকার সম্বন্ধে অনেক খবর রাখে। সে নিজে শিকারী নয়; কিন্তু শিকারীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ও তিন চারি বার বাঘের আঁচড় কামড় খাইয়া শিকার সম্বন্ধে তাহার বেশ একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। কোন স্থান হইতে বাঘের সংবাদ আসিলে, অমনি সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয় এবং বাঘশিকারের কৌশল ইত্যাদি সকলকে বলিয়া দেয়। আমরাও তাহাকে সঙ্গে না লইয়া কোথাও শিকার করিতে যাই না।

"সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পুরস্কার!"

এক্ষেত্রেও সেই লোকটি আমার সঙ্গে ছিল। বনের মধ্যে দুই চারি পা অগ্রসর হইতেই, শিস্ দিবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আমার দুইজন বন্দুকধারী সঙ্গী নিকটস্থ একঝাড় বাঁশের উপর বসিয়া, আমাদিগকে সরিয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। বাঘ নিকটেই আছে বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিলাম এবং তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্য একটা বাঁশের ঝাড়ে উঠিয়া পড়িলাম। আমার সঙ্গী নিকটেই অন্য একটা ঝাড়ে উঠিতে

যাইতেছে, এমন সময় তাহার গলার আওয়াজ আমার কানে আসিল। চাহিয়া দেখি বাঘটা গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। লোকটিও সহজ পাত্র নহে। বাঘের উপর গলা চড়াইয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, 'চোপ্ রাও হারামজাদা!' আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঘটা ভয় পাইয়া পলায়ন করিল, লোকটিও সুযোগ বুঝিয়া বাঁশঝাড়ে উঠিয়া পড়িল।

ইহার পর বাঘ সেখান হইতে বাহির হইয়া, ডাকিতে ডাকিতে আমার দিকে চলিয়া আসিল। আমি তখনও স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারি নাই। তবু কোন রকমে এক গুলি করিলাম; কিন্তু গুলি বাঘের গায়ে লাগিল না। বাঘটা আবার প্রথম জঙ্গলটায় গিয়া ঢুকিল।

বন্দুকের শব্দ শুনিয়া গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই তাহারা ইট-পাটকেল, ঢিল, অবিরামধারে বনের মধ্যে বর্ষণ করিতে লাগিল। আমি এবং আমার সেই অভিজ্ঞ সঙ্গী বনের পাশে একটা খোলা যায়গায় দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ বাঘটা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া, দাঁত মুখ খিঁচাইয়া, আমাদিগকে তাড়া করিয়া আসিল। তখন আর কি করি, অন্য উপায় না দেখিয়া খুব জোরে চেঁচাইয়া উঠিলাম। তাহাতেই কাজ হইল—বাঘটা ফিরিয়া আবার জঙ্গলে ঢুকিল। তখন স্থির করিলাম, জঙ্গলে ঢুকিয়া তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে হইবে।

এদিকে বাঘ আমাদিগকে তাড়া করিবার পরই বনের অপর প্রান্তে চলিয়া যায়। সেখানে একটি লোক তাহাকে দেখিতে পাইয়া, আমাকে আসিয়া খবর দিল। তৎ-ক্ষণাৎ সেখানে গিয়া একটু চেষ্টা করিতেই দেখি, বাঘটা শুইয়া আছে এবং দৌড়া-দৌড়িতে ক্লান্ত হইয়া জিভ্ বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলাম না, বন্দুক তুলিয়াই গুলি করিলাম। এক গুলিতেই বাঘটা মারা পড়িল।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বাঘ লইয়া যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম—তখন কি আনন্দ! কি আরাম!

ইহার কিছুদিন পরে মাচায় বসিয়া টর্চের আলোকে আমি আর একটা চিতাবাঘ মারিয়াছি, কিন্তু—সে কথা এখন থাক্।"

এই যুবক শিকারী কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম, সম্প্রতি (এপ্রিল, ১৯২৯) তিনি আর একটা চিতাবাঘ মারিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়, বাঘ-শিকারে শ্রীমানের কিরূপ উৎসাহ। এই

বাঘটা মারিতে তাঁহাকে না কি খুব বেগ পাইতে হইয়াছিল। রাত্রিতে মাচা হইতে গুলি খাইয়া বাঘ জঙ্গলে পলায়ন করে; পরদিন অনেক পরিশ্রমের পর তাহাকে এক আখের ক্ষেতের মধ্যে পাওয়া যায়। সেখানে আহত ক্ষিপ্তপ্রায় ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইয়া মাটিতে দাঁড়াইয়া তাহাকে শিকার করা যে যথেষ্ট সাহস ও স্থিরবুদ্ধির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

শুধু হাতে চিতা শিকার

আমেরিকার 'কার্ল-ই-আ্যাক্‌লি' জীব-জানোয়ার সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ লোক। তিনি নানা দেশের জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার-সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন; সম্প্রতি একদিন আফ্রিকার জঙ্গলে খালি হাতে একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ শিকার করিয়া আশ্চর্য্য বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। একটিমাত্র সঙ্গী লইয়া তিনি সেদিন বৈকালে বাহির হইয়াছিলেন। প্রথমেই একটা হায়েনা শিকার করিয়া খুশী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তার পর আর কোন শিকারই মিলিল না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিতেছেন, এমন সময় একটা ঝোপের ভিতর খস্‌খস্‌ আওয়াজ শুনিয়া সেই ঝোপ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। তিনি জানিতেন না যে, ঝোপের ভিতর কোন জন্তু আছে। সহসা একটা গর্জ্জন শুনিয়া বুঝিলেন, ভীষণ হিংস্র চিতাবাঘের গায়েই গুলি লাগিয়াছে। অন্ধকার ঘনীভূত হওয়াতে তিনি আর সেখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া সঙ্গীসহ নিজের তাঁবুর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে সেই চিতাবাঘের সহিত সাক্ষাৎ। চিতা কুড়ি গজ মাত্র দূরে থাকিতে তিনি আবার গুলি ছুড়িলেন, কিন্তু তাহা ফস্‌কাইয়া গেল। তৃতীয়বার গুলি ছুড়িতেই চিতাবাঘ হুঙ্কার দিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিল। কি তাহার বিদ্যুৎগতি! এত দ্রুত বোধ হয় কোন জন্তুই ছুটিতে পারে না। বাঘ যখন মাত্র ছয় হাত দূরে, অ্যাক্‌লি সাহেব আবার বন্দুক তুলিলেন, কিন্তু হায়—বন্দুকে আর টোটা পোরা ছিল না। তিনি দেখিলেন, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নহে। তিনি ছুটিতে ছুটিতে বন্দুকে টোটা ভরিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বাঘটা ছুটিয়া আসিয়া দুর্জ্জয় বলে তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল। বন্দুকটি তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল; চিতাবাঘ তাঁহার ডান হাত কামড়াইয়া ধরিল। এমন অবস্থায় মনের ভাব কি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু উপস্থিত-বুদ্ধির

গুণে অ্যাক্‌লি সাহেব সে অবস্থাতেও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হ'ন। তিনি বাঁ হাত দিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে বাঘের গলা চাপিয়া ধরিয়া, ক্ষত-বিক্ষত ডান হাতখানি সজোরে তাহার মুখের মধ্যে পুরিয়া দিলেন। বাঘটা তাঁহার টুঁটি কামড়াইয়া

চিতাবাঘের সহিত মল্লযুদ্ধ।

ধরিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনিও নানা কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে মল্লযুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া, বাঘ ও শিকারী একসঙ্গে গড়াইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে চিতা তাঁহার নীচে পড়িয়া যায় ও তাঁহার ডান হাঁটুর চাপে তাহার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যায়। কিছুক্ষণ এরূপ

ধস্তাধস্তির পর বাঘ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়। অ্যাক্‌লি সাহেব একটু দম লইয়া তাঁহার নিগ্রো সঙ্গীর সাহায্যে তাঁবুতে ফিরিয়া আসেন এবং ক্ষতস্থানে বিষ প্রতিষেধক ঔষধ দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করেন। এই ক্ষমতাপন্ন শিকারীর বিস্তৃত জীবন-চরিত পড়িয়া দেখিলে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়।

জাগুয়ার-শিকার

'বেরিল্‌' নামে একজন ইংরাজ-বৈজ্ঞানিক প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল আমেরিকার একটি গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে বাস করেন। বেরিল্‌ সাহেব শিকারীও ছিলেন খুব ভাল। তিনি যে গ্রামটিতে থাকিতেন, তাহার আশে পাশেই ভীষণ বন। এখানেই জাগুয়ারের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয়। শুধু পরিচয় নয়, বার কয়েক অতি কষ্টে এবং নেহাৎ কপাল-জোরে জাগুয়ারের হাত হইতে তাঁহার প্রাণ বাঁচিয়াছিল।

বেরিল্‌ বলেন, "সে দেশের শিকারীদের দেখাদেখি, আমাকেও অনেক সময় 'ম্যাচেট্‌' (খুব বড় ছোরা) লইয়া আহত জাগুয়ারের সঙ্গে লড়াই করিতে হইত। একবার ঘোড়ায় চড়িয়া একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় ভোর হইবার আগেই, এক স্থান হইতে রওনা হইয়াছি, এমন সময় পথে একজন নিগ্রো সঙ্গী পাইলাম। তখনও খুব অন্ধকার, আমরা দুইজনে সারাদিন চলিয়া, সন্ধ্যার সময় এক গ্রামের একটা হোটেলে উপস্থিত হইলাম। হোটেলওয়ালা আমাদের খাইতে দিয়া, পাশে বসিয়া তাহাদের গ্রামের সব গল্প করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার নিকট হইতে জানিতে পারিলাম, তাহাদের গ্রামে একটা প্রকাণ্ড জাগুয়ার আসিয়াছে— গ্রামের গরু বাছুর মারিয়া আর কিছু বাকি রাখিল না। দেখিতে দেখিতে দুই চারি জন করিয়া আরো গ্রাম্য লোক আসিয়া হোটেলে উপস্থিত হইল। তাহাদের কাছেও ঐ জাগুয়ারের কথা শুনিলাম। দিন কয়েক সেই গ্রামে থাকিয়া জাগুয়ারটাকে মারিবার জন্য, তাহারা আমাকে অনুরোধ করিল। ভাবিলাম, রাত্রেই মাচা বাঁধিয়া বসিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। কিন্তু সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছিলাম, তাই রাজি হইলাম না। পরদিন ভোরে রওনা হইবার আগে একটু জলযোগ করিয়া লইতেছি, এমন সময় হোটেলওয়ালা বলিল যে, রাত্রে সেই হতভাগা

জাগুয়ার দুইটা গাই মারিয়াছে আর একটা বক্‌না বাছুর ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তখন আমার দুঃখ হইল, কেন রাত্রে মাচা বাঁধিয়া বসিলাম না।

জলযোগের পর আমরা রওনা হইলাম। প্রায় মাইল খানেক পথ গেলে পর, জাগুয়ার টাগুয়ারের কথা সব ভুলিয়া গেলাম। দুই ধারে চষা ক্ষেত, মাঝখান দিয়া পথ। খানিক দূর গিয়া রাস্তার একধারে দেখিলাম, বেশ উঁচু মাটির পাড় চলিয়াছে, তাহার উপর জঙ্গল। রাস্তার অন্য পাশে মনসা-কাঁটার বেড়া দেওয়া পুরান কলাবাগান। এখানে আসিয়া হঠাৎ আমার ঘোড়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল, থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—আর একটু হইলেই আমি জিন হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িতাম। পর মুহূর্ত্তে পাড়ের একটা ঝোপের মধ্য হইতে মড়্ মড়্ শব্দ শোনা গেল। চাহিয়া দেখি, প্রায় বিশ গজ সম্মুখে রাস্তার ঠিক মাঝখানে, প্রকাণ্ড এক জাগুয়ার লাফাইয়া পড়িয়াছে।

"অমনি দ্‌ড়াম্ ক'রে বন্দুকের আওয়াজ।" ১৯১ পৃষ্ঠা

জাগুয়ারটাকে দেখিবামাত্র, বন্ধু নিগ্রোর খচ্চরটি পিছনবাগে ফিরিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্! আমার ঘোড়া ভয়ে এমনি কাণ্ড আরম্ভ করিল যে, তাহার পিঠ হইতে বন্দুক চালায় কাহার সাধ্য! রাস্তার মাঝখানে তখনও বুটিদার ভীষণ জন্তুটি দাঁড়াইয়া আমার পানে তাকাইয়া লেজ ঘুরাইতেছে, চোখ পাকাইতেছে! যেন বুঝিতে পারিতেছে না—পালাইবে, কি আক্রমণ করিবে। হঠাৎ নীচু হইয়াই এক লাফে কলা-বাগানে পড়িয়া দৌড় দিল! আমি চক্ষের নিমেষে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, বন্দুকটা উরুর উপর রাখিয়াই, পর পর দুইটা গুলি ছাড়িলাম। দ্বিতীয় গুলি মারিতেই, জাগুয়ারটা ফিরিয়া নিজের পাঁজরে দুই তিন কামড় দিয়াই, মাটিতে গড়াগড়ি দিতে

লাগিল। বুঝিতে পারিলাম, তাহার গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। তখন মনসা-কাঁটার বেড়া পার হইয়া ছুটিয়া গেলাম। কাছে যাইতেই জাগুয়ারটা পলাইবার চেষ্টায় অতি কষ্টে খানিকদূর গিয়াই, হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। কেবল তাহাই নয়, থাপ্ পাতিয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল।

তাহার গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে ভাবিয়া, সম্মুখের দিকে খানিকটা অগ্রসর হইয়া খুব ভাল করিয়া তাগ্ করিয়া গুলি ছুড়িলাম। বন্দুকের ঘোড়া টানিবার সময়ই জাগুয়ারটাও লাফ দিল। তখন দেখিলাম, আমার গুলি তাহার পেটের তলা ঘেঁসিয়া যাওয়াতে কেবল কতকগুলা লোম উড়িয়া গেল। চট্ করিয়া এক পাশে সরিয়া গিয়া, আর এক গুলি মারিলাম বটে, কিন্তু শুধু ঠক্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল—ক্যাপ্ ফুটিল না! সঙ্গে পিস্তল ছিল না! কি আর করি, তাড়াতাড়ি কোমর হইতে ম্যাচেট্ খুলিয়া লইয়া, এক পা দুই পা করিয়া পিছাইয়া যাইতে লাগিলাম—যদি জাগুয়ারটা আবার লাফ দেয়, তবে একপাশে সরিয়া গিয়া, ম্যাচেট্ দিয়া এক ঘা বসাইয়া দিব। ছুটিয়া পলাইবার ভরসা হইল না, কারণ পিছন ফিরিলেই সে এক লাফে আমার উপর পড়িবে।

জাগুয়ারটা ক্রমে নীচু হইতে লাগিল। তাহার মাংস-পেশী টান হইতেছে, লেজ নড়িতেছে, চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে—এইবারে বুঝি লাফ দেয়! আমিও প্রস্তুত হইয়া আছি, লাফ দিবামাত্র একপাশে সরিয়া যাইব। এমন সময় আমার কানের কাছে ধড়াম্ করিয়া এক বন্দুকের আওয়াজ! সঙ্গে সঙ্গে জাগুয়ারটা মাটিতে পড়িয়া দুই তিনবার গড়াগড়ি দিয়াই একেবারে নীরব!

তখন চাহিয়া দেখি, আমার পাশেই বন্দুক হাতে বন্ধু নিগ্রোটি! ঠিক বিপদের সময়েই সে উপস্থিত হইয়াছিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, 'যাক্ ভালয় ভালয় বিপদ্ কেটে গেল। কিন্তু মনে রাখবেন—ম্যাচেট্ সাপ-টাপ মারবার সময় বেশ কাজ দিলেও উন্মত্ত জাগুয়ারের সঙ্গে লড়বার উপযুক্ত অস্ত্র নয়।'

এই রকম কয়েকবার আমি জাগুয়ারের হাতে মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। প্রত্যেকবারই জাগুয়ার আহত হইয়া ভীষণ ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, আর আমি দারুণ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম।"

———

নেক্‌ড়ের গল্প

আমরা হিংস্র ও বন্য পশুদের যত গল্প শুনি, তন্মধ্যে, নেক্‌ড়ে সম্বন্ধীয় গল্প সর্ব্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র এই জন্তুটিকে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সাইবিরিয়া ও রুশিয়ার উত্তরাংশে, নরওয়ে ও সুইডেনে ইহাদের অত্যাচার খুব বেশী।

১৮৫২ সালের শীতের প্রারম্ভে সমস্ত সাইবিরিয়া প্রদেশ বরফে আছন্ন হইয়া যায়। এই সময়ে তুরস্কে ও রুশিয়ায় লড়াই চলিতেছিল। তুরস্কের একদল সেনা লুঠ্‌-তরাজের জন্য সাইবিরিয়ায় প্রেরিত হয়, কিন্তু রুশিয়ার হাতে তাহারা পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই ছত্রভঙ্গদলের একটি অংশে এগার জন তুর্কী অশ্বারোহী-সৈন্য, চারিজন রুশীয় পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া, সাইবিরিয়ার প্রান্তর ভেদ করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল। অশ্বারোহী সেনাদলের প্রত্যেকের কাছে বন্দুক, পিস্তল ও তরবারি ছিল। বন্দীরাও প্রত্যেকে এক একটি অশ্বে আরূঢ় ছিল। প্রান্তর-পথে কিছুদূর যাইতে না যাইতেই, তাহারা সাতটি নেক্‌ড়েকে তাহাদের পাছু লইতে দেখিয়া, গুলি করিয়া ছুটিকে হত্যা করে। বাকি পাঁচটি পলাইয়া যায়।

ইহার অল্প কিছুক্ষণ পরেই অশ্বারোহীদল পশ্চাতে এক মহা কলরব শুনিতে পায়। প্রথমে বাতাসের গর্জ্জন মনে করিয়া তাহারা ঝড়ের ভয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া দেয়, কিন্তু অনতিবিলম্বে বহু দূরে তুষারের উপর, অসংখ্য কালো বিন্দুর মত কি যেন নড়িতেছে দেখিয়া, তাহারা ভয়ে শিহরিয়া উঠে। তাহারা বুঝিতে পারে, বহুসংখ্যক নেক্‌ড়ে তাহাদের পাছু লইয়াছে।

ঘোড়াগুলি অনেক পথ অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু নেক্‌ড়ের ভয়ে তাহাদের গতি অদ্ভুত রকম বাড়িয়া গেল। অশ্বারোহীরা জানিত যে, অন্ততঃ সাত মাইলের মধ্যে কোন আশ্রয় তাহাদের মিলিবে না। সাত মাইল পরে পথের ধারে একটি পরিত্যক্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটির মাত্র আছে। সেখানে পৌছিলে, ইহাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। মাঝে মাঝে তুষার অতি গভীর, বিপুলকায় অশ্বগুলির পা তাহাতে ডুবিয়া, তাহাদের গতি কিছু রুদ্ধ হইতেছিল, কিন্তু নেক্‌ড়েরা অমিত বিক্রমে বিনা বাধায় ছুটিতেছে।

এই ভীষণ রক্তলোলুপ জানোয়ারদের চীৎকার উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। তাহারা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িল। তুর্কীসেনারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল,

রক্ষা পাইতে হইলে, এক একজন করিয়া ইহাদের হাতে আত্ম-সমর্পণ না করিলে চলিবে না। প্রথমতঃ বন্দী পাঁচজনের প্রাণ বলি দেওয়াই স্থির হইল। হঠাৎ একজন তুর্কীসেনা বন্দী মহিলাটির ঘোড়াকে আঘাত করিল। অশ্ব ও সওয়ার একসঙ্গে মাটিতে পড়িল। নেক্ড়েদল নিকটে আসিয়া তাহাদের উভয়কেই নিমেষমধ্যে ছিন্নভিন্ন করিয়া উদরস্থ করিল। ইত্যবসরে অন্যান্য অশ্বারোহীদল অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেল।

কিন্তু রক্তের আস্বাদ পাইয়া হিংস্র জানোয়ারগুলা ভীষণতর হইয়া উঠিল ও অধিকতর দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। বাকি চারিজন বন্দী ও তাহাদের অশ্বগুলিকেও নেক্ড়ের হাতে বলি দেওয়া হইল। কিন্তু, তখনও সেই কুটিরে পৌঁছিতে অনেক দেরী। এই অশ্বারোহীদলের নেতা তখন নিজেদের বিপদের কথা ব্যক্ত করিয়া, একে একে প্রত্যেককেই মৃত্যু বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিল। নেক্ড়েগুলা তখন অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। সর্দ্দার সহসা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অশ্বারোহীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিল। অশ্বারোহী ভূপতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আরোহীহীন অশ্ব প্রান্তর-পথে প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিল। নেক্ড়েদল অশ্ব ও অশ্বারোহীকে নিমেষমধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাকি কয়েকজনকে বিনষ্ট করিবার জন্য ছুটিতে লাগিল। এইবার অশ্বারোহীদল গুলি ছুড়িতে সুরু করিল। দশজনের গুলিতে দশটা করিয়া নেক্ড়ে হত হয়, বাকি নেক্ড়েগুলা সেই দশটাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া উদরসাৎ করিয়া ছুটিতে থাকে। ইহা সত্ত্বেও আরো তিনজন অশ্বারোহীর প্রাণ বলি দিবার পর, সৈন্যদল সেই কুটিরে উপস্থিত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়।

নেক্ড়ে-পালিত শিশু

সে অনেক দিনের কথা, আমরা তিনজন জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ লক্ষ্ণৌ-অঞ্চলে শিকার করিতে গিয়াছিলাম। সে বার আমাদের শিকারের সাধ ব্যর্থ হয় নাই। আমাদের সম্মুখের বারান্দা হরিণের শিং, মহিষের শিং আর শূকরের দাঁতে প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। একদিন সকাল বেলা তিন বন্ধুতে আবার শিকারের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। তখন সবে ভোর হইতেছে, সমস্ত আকাশ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে আর

বাতাসটুকু ভারি মিষ্ট। সম্মুখে যতদূর পর্য্যন্ত চোখ যায়, সুবিস্তৃত মাঠ পড়িয়া আছে, একেবারে সেই দিগন্তের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ভোরের বেলা এমন খোলা মাঠে ঘোড়া ছুটাইয়া যাওয়ার যে কি আনন্দ, তাহা আর কি বলিব! আমি বন্ধুদের ছাড়াইয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, আমার সম্মুখ দিয়া তিনটা নেক্‌ড়ে দৌড়িয়া যাইতেছে; দেখিয়া আমার খুবই স্ফূর্ত্তি হইল, কেন না, এ অঞ্চলে নেক্‌ড়ে বড়ই দুর্লভ। আমি খুব উৎসাহে তাহাদের অনুসরণ করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলাম। নেক্‌ড়ের সঙ্গে দৌড়িয়া পারে এমন ঘোড়া খুব কমই দেখা যায়, তাহাতে আবার আমার ঘোড়াটি অনেক দূর দৌড়িয়া আসিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই কোন ক্রমে নেক্‌ড়েগুলার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছিল না। একে একে দুইটা নেক্‌ড়ে অদৃশ্য হইয়া পড়িল, কেবল দূরে একটাকে দেখা যাইতে লাগিল। সে খোঁড়াইয়া চলিতেছিল, আর এমনি শ্রান্ত ভাবে যাইতেছিল যে, দেখিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, আর অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহাকে বর্শা দিয়া গাঁথিয়া ফেলিতে পারিব। আমি ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিলাম; আর দেরী নাই—বর্শা বাগাইয়া ধরিয়া যেমন তাহাকে মাটির সঙ্গে গাঁথিয়া ধরিব, এমন সময় সে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! আর আমার ঘোড়াটি ভয়ে চেঁচাইয়া উঠিয়া পিছনে হটিয়া আসিল। সম্মুখে দেখিলাম, অল্প চওড়া কিন্তু অতি গভীর এক নালা; তীরে ঘন বন, তাই দূর হইতে নালার অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না। ভাগ্যে ঘোড়াটি পিছনে হটিয়া গিয়াছিল, তাহা না হইলে সে আর আমি উভয়েই সেই সকাল বেলায় প্রাণ হারাইতাম। যেই ঘোড়াটা লাফাইয়া সরিয়া আসিল, সেই মুহূর্ত্তে একটা বিকট হাসি শুনিতে পাইলাম! সে হাসি শুনিলে বুকের রক্ত জল হইয়া যায়। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম; কোথাও কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া মনে করিলাম যে, এ হায়েনার হাসি। যে নেক্‌ড়েটা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, দেখিলাম, সেটা নালার নীচ দিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র নালার ধার হইতে একটা কি জন্তু লাফাইয়া উঠিয়া লম্ফ ঝম্প করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। সেটা এক অদ্ভুত জন্তু, তেমন জন্তু আমি কখনও দেখি নাই। ভালুকের মত তাহার চলন, সর্ব্বাঙ্গ রোমে ঢাকা, চতুষ্পদ, কিন্তু তাহার লেজ নাই। কিছু দূর দৌড়িয়া গিয়া সে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া নেক্‌ড়ের মত চীৎকার করিয়া উঠিল; চতুষ্পদ জন্তু যে এমন করিয়া বসিতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে আর দেখি নাই—আর তাহার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য্য, যেন মানুষের মত। আমি কত কি ভাবিলাম; কত রকমের কল্পনা মাথায় আসিল! একবার মনে হইল, হয় ত এটা অর্দ্ধেক নেক্‌ড়ে অর্দ্ধেক বানর—এমনি কোন একটা অদ্ভুত জীব!

নয় ত, নেকড়ে-পালিত কোন মনুষ্য-সন্তান! ক্রমে আমার কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল, আর এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হইল। আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া সেই দিকে চলিলাম।

নালার ভিজা মাটির উপরে অনেক পশুর পায়ের চিহ্ন দেখিলাম; খুব প্রকাণ্ড বাঘের থাবার কতকগুলি চিহ্ন এবং নেকড়ে, হায়েনা প্রভৃতির অনেক পদচিহ্ন। কিন্তু সে সবে আমার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। আমি সেই অদ্ভুত জীবটির পায়ের চিহ্ন কাগজে আঁকিয়া লইলাম। সম্মুখের পায়ের চিহ্ন অবিকল মানুষের হাতের চিহ্নের মত, কিন্তু পিছনের পায়ের চিহ্ন দেখিয়া, আমি একেবারে বিস্মিত হইয়াছিলাম—সে চিহ্ন না মানুষের মত, না চতুষ্পদ পশুর মত! আমি সেই চিহ্নগুলি অতি যত্নে কাগজে আঁকিয়া লইয়া একাগ্রমনে দেখিতেছি, এমন সময় আবার সেই হাসি শুনিতে পাওয়া গেল। সে কি বিকট হাসি! তবুও সে হাসি মানুষের হাসির মত, এই কথা আমার আরও বেশী করিয়া মনে হইতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, জন্তুটার অনুসরণ করিয়া এই আশ্চর্য্য রহস্য ভেদ করিয়া ফেলি, কিন্তু সুবুদ্ধি আসিয়া সে ইচ্ছা থামাইয়া দিল। আমার কাছে সেই বর্শাটা ভিন্ন আর কোন অস্ত্র ছিল না, কাজেই কৌতূহল সত্ত্বেও ফিরিয়া আসিতে হইল।

যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। আমার বন্ধু দুইটি প্রায় ঘণ্টা খানেক আগে আহারাদি করিয়া দিব্য আরামে আরাম-চৌকিতে শুইয়া গল্প করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এত দেরী কেন? তোমাকে দেখে মনে হ'চ্ছে, যেন ভূত দেখে এসেছো!" আমি বলিলাম, "ভূত দেখি নি সত্যি, কিন্তু 'মানুষ-বাঘ' দেখে এসেছি!" তাঁহারা ত আমাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন! বলিলেন, "রোদে ঘুরে তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, কি যে বক্‌ছ ঠিক্ নেই। মানুষ-বাঘ!—সে আবার কি জন্তু! তুমি সোডা-বরফ খেয়ে মাথায় বরফ বেঁধে একটু ঘুমোও, তা না হ'লে জ্বরে প'ড়বে।" কিন্তু যখন আমি পায়ের দাগের ছবি দেখাইলাম, আর সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলাম, তখন তাঁহাদেরও অত্যন্ত কৌতূহল হইল, আর সেই দিন বৈকালেই শিকারী-কুকুরগুলিকে সঙ্গে করিয়া সেই জন্তুটার অনুসন্ধানে যাওয়া স্থির হইল।

বৈকালে আমরা তিন বন্ধু দুইটি কুকুর সঙ্গে লইয়া সেই নালার কাছে উপস্থিত হইলাম। নীচে ভিজা মাটিতে পায়ের দাগ চিনিয়া লইতে কোন কষ্ট হইল না। আমরা সেই চিহ্ন অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কিন্তু আধক্রোশ যাইবার পর আর পায়ের চিহ্ন দেখা গেল না। চারিদিকে কাঁটা-বনের

ঝোপ, আমাদের অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়িল। তখন একজন কুকুরগুলিকে লইয়া আসিবার হুকুম দিলেন। তাহাদের ঘ্রাণ-শক্তি তীক্ষ্ণ, তাহারা অনায়াসেই আমাদের পথ-প্রদর্শক হইতে পারিবে। কুকুরগুলি শিকারের গন্ধ পাইয়া এমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, তাহাদের আটকাইয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়িল; যাহাই হউক, কোন মতে আমরা একটা বিলের ধারে আসিয়া পৌঁছিলাম। সম্মুখেই একটা বড় রকমের গর্ত; তাহাতে একজন লোক গুঁড়িসুঁড়ি হইয়া ঢুকিতে পারে। গর্তটির পরিসর দেখিয়া আর তাহার মধ্য হইতে যে দুর্গন্ধ আসিতেছিল, তাহাতে সহজেই অনুমান করিতে পারা গেল, সেটা হিংস্র জন্তুর বাসস্থান। কুকুরগুলি গর্তে ঢুকিয়া শিকার ধরিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, কিন্তু আমাদের মতলব সে রকম ছিল না। আমরা তিন বন্ধুতে আশ-পাশের গাছ-পালা কাটিয়া আনিয়া, সেই গর্তের মুখে রাশীকৃত করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলাম; সমস্ত ধোঁয়াটা গর্তের মধ্যে ঢুকিতে লাগিল। আমাদের মতলব ছিল যে, যখন ধোঁয়ায় অস্থির হইয়া জন্তুটা বাহিরে আসিবে, তখন সেটাকে আক্রমণ করিব। প্রায় পনর মিনিট পরে একটা কালো জন্তু লাফ দিয়া গর্ত হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, আমার বন্ধুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে বেচারি তখন চোখের কয়লা বাহির করিতে ব্যস্ত ছিল, এমন আচম্‌কা আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না—জন্তুটা তাহাকে ফেলিয়া দিয়া একেবারে বুকের উপর উঠিয়া, তাহার হাত ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল; আর একটু হইলে তাহার গলাটা চিরিয়া দিত। এমন সময় আমি তাহার মাথায় খুব জোরে আঘাত করিলাম। তাহাতে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া, সে আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তখন তাহার মুখের মধ্যে আমার বাঁশের লাঠিখানা ঢুকাইয়া দিলাম। লাঠির সেই অংশ সে দাঁত দিয়া পিষিয়া ছাতু ছাতু করিয়া ফেলিয়া আবার লাফাইয়া উঠিল। এবারে আমার বন্দুকের নল তাহার মুখের ভিতর ঢুকাইয়া দিলাম। আমার বন্ধু তাঁহার প্রকাণ্ড লাঠি দিয়া তাহার ঘাড়ের উপর আঘাত করিলেন—জন্তুটা কাতর আর্তনাদ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তখন দেখিতে পাইলাম, যাহাকে আমরা শিকার করিতে আসিয়াছি, সে মানুষ বই আর কিছুই নয়! কিন্তু তাহার আকৃতি এমনই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, যে, তাহাকে মানুষ বলিয়া চেনা কঠিন। তাহার সর্ব্বশরীর লোমে ভরিয়া গিয়াছিল, বুকের লোমগুলি প্রায় এক বিঘত্‌ লম্বা; মাথার চুলগুলি সিংহের কেশরের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মুখশ্রী এক সময় বোধ হয় সুন্দর ছিল, কিন্তু এখন হিংস্র জন্তুর মত হইয়া গিয়াছে। হাত দুখানি ক্ষতবিক্ষত—কড়ায় ভরা, হাঁটু দুটি উটের পায়ের মত, চলন চতুষ্পদের মত। দেখিয়া মনে হইল,

সে একটি বালক—বয়স চৌদ্দ কি পনর হইবে। আমরা তাহাকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া, কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়া চলিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে তাহার জ্ঞান হইল, আর সেই সঙ্গে বাঁধন ছিঁড়িয়া মুক্তিলাভের জন্য সে মরিয়া হইয়া উঠিল। আমরা কোনমতে তাহাকে লইয়া তাঁবুতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

সন্ধ্যার পরে শীতল বাতাসে আরাম-চৌকিতে বসিয়া, আমাদের তিন বন্ধুতে দিনের ঘটনার বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল। ছেলেটি কে? সে কি পাগল হইয়া বনে চলিয়া আসিয়া নেকড়েদের সঙ্গে একত্রে বাস করিতেছিল, না, ছেলেবেলা নেকড়েতে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়া তাহাকে মানুষ করিতেছিল! হয় ত তাহার মা-বাপ পাশের গ্রামেই সুখে-শান্তিতে বাস করিতেছে, ছেলেটি অস্তিত্বের বিষয় তাহারা কিছুই জানে না। কত সন্ধ্যায় মা সেই হারান ছেলেটিকে মনে করিয়া এখনো চোখের জল ফেলে! আমাদের কল্পনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল কিন্তু মীমাংসা কিছুই হইল না।

আমাদের তাঁবু-বাসের সময় শেষ হইয়া আসিল, আমরা কানপুরে ফিরিয়া আসিলাম। পথে একখানি ঢাকা-দেওয়া গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া, আমাদের বন্দী-টিকে একেবারে পুলিস-অফিসে হইয়া গেলাম। সেখানকার কর্তা আমাদের বন্ধু। তিনি চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর-ঘেরা আঙিনায়, খাঁচার মধ্যে তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। আমরা স্থানীয় ডাক্তার সাহেবকে ডাকাইয়া আনিলাম। তিনি খুব বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্। মানবদেহ-তত্ত্ব আলোচনা করা তাঁহার বাতিক। তিনি যখন আমাদের বন্দীটিকে দেখিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি খুব যত্ন করিয়া বন্দীকে পরীক্ষা করিলেন, তাহাকে দাঁড় করাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বহুকালের অব্যবহারে তাহার পা সোজা করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, জীবনে সে কখনো পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়ায় নাই। তাহার গলায় ও বুকে অনেকগুলি ক্ষতচিহ্ন ছিল। বাঁ হাতের কব্জির কাছে একটা গভীর দাগ দেখিয়া কাটার দাগ বলিয়া মনে হইতেছিল; কিন্তু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, সেটি একগাছি ছোট বালা। হয় ত, খুব কচি বয়সে হাতে পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তার পর না খোলার দরুণ একেবারে কাটিয়া মাংসের মধ্যে বসিয়া গিয়াছে। বালা-গাছটি যখন পরিষ্কার করা হইল, তখন দেখা গেল, তাহার সোনা যেমন সুন্দর, তাহার কাজও তেমনি সুন্দর। ডাক্তার সাহেব বালাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "এতে কার নাম

লেখা রয়েছে; কিন্তু উর্দ্দুতে লেখা, তাই পড়্‌তে পার্‌ছিনে।" আমি পড়িয়া দেখিলাম, লেখা আছে, 'হীরালাল, কানপুর ১৮৫৭ সাল।' আমার বন্ধু বলিলেন, হীরালাল যে এখানকার প্রধান স্বর্ণকার, বাজারে তার দোকান; চল, তার কাছে গিয়ে খোঁজ করা যাক্।" পর দিন সকালে আমরা হীরালালের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, লাল খেরো-বাঁধানো অসংখ্য হিসাবের খাতায় পরিবেষ্টিত হইয়া, হীরালাল বসিয়া আছে। হীরালাল অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বালাটি পরীক্ষা করিতে লাগিল, তার পর বলিল, "সিপাহী-বিদ্রোহের সময় আমি এই গঠনের বালা অনেক-

খাঁচার মধ্যে নেকড়ে-পালিত বালক।
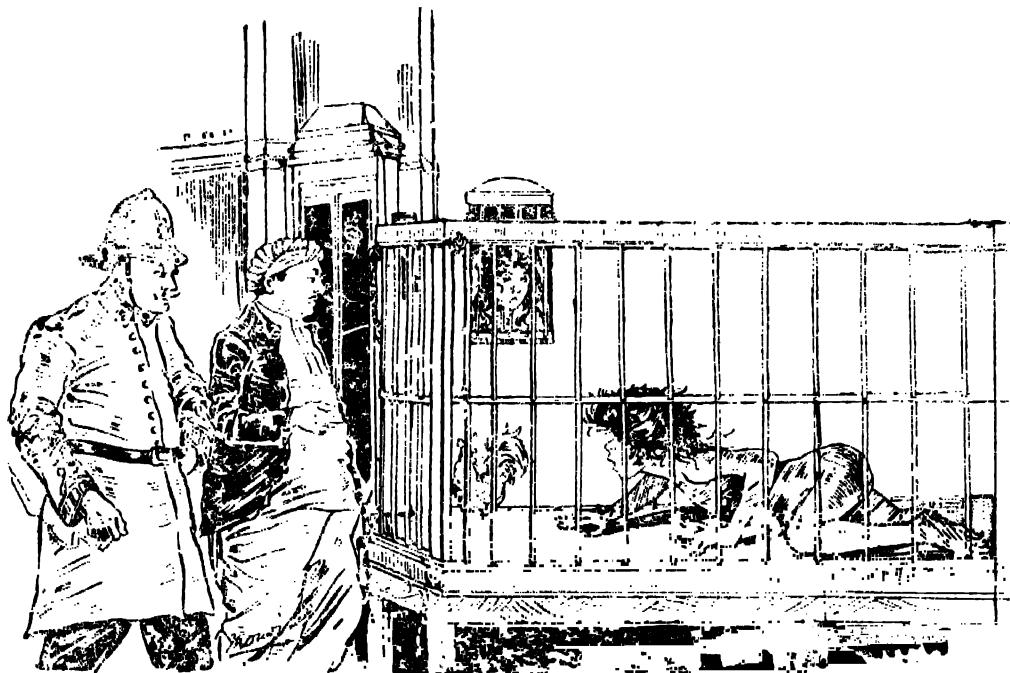
গুলি তৈয়ারি করেছিলাম বটে! সেই সময় আমি দিল্লীতে ছিলাম। দেওয়ান-খাসের দেওয়ালে যে সব ফুল-ফল, লতা-পাতা আঁকা আছে, তার থেকে এর কাজটা নকল ক'রেছিলাম।" হীরালাল তাহার সরকারকে ডাকিয়া ১৮৫৭ সালের হিসাবের খাতা আনিতে বলিল। খাতায় খোঁজ করিয়া জানা গেল, এই নমুনার একজোড়া ছোট বালা মনোহর দাস বণিকের কাছে বিক্রয় করা হইয়াছিল। হীরালাল তারপর বলিল, "সাহেব, সে ছেলে ত অনেক দিন মারা গেছে, এ বালা আপনি কোথায় পেলেন?" আমরা সে বিষয় কিছু না বলিয়া, মনোহর দাসের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম। হীরালাল, বলিল, "অক্ট্রয় অফিসের কাছে রেলিং দেওয়া যে প্রকাণ্ড বাড়ী, সেই

বাড়ী মনোহর দাসের। কিন্তু সে আপাততঃ সস্ত্রীক সীতাকুণ্ডে তীর্থ ক'র্‌তে গেছে, ফিরে আস্‌তে তিন মাস হবে।” কাজেই এই রহস্যের মীমাংসার জন্য বাধ্য হইয়া আমাদের আরও তিন মাস প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইল।

এখন আমাদের বন্দীটিকে বাঁচাইয়া রাখাই এক মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। তাহাকে সিদ্ধ আর কাঁচা মাংস দুই-ই খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে কিছুই মুখে লইত না, কেবল একটু দুধ আর জল খাইত। সুখ খাঁ নামে একজন পুলিস কনষ্টেব্‌ল্‌কে এই বন্দীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। লোকটি যেমন বলবান্ তেমনি সাহসী। প্রথম দিন সে দুধের পাত্র হাতে করিয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু বন্দী তাহাকে এমনি উন্মত্তের মত আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল যে, তাহাকে পলাইয়া আসিতে হইল। তার পর হইতে আর কখনও সে সেই ঘরে প্রবেশ করে নাই—বাহির হইতে খাবার দিত। চারিদিন চলিয়া গেল, তবুও বন্দী কিছুই খাইল না, উপবাসে তাহার শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমাদের কোন বন্ধু প্রস্তাব করিলেন, তাহাকে ছাগলের ছোট বাচ্চা কিংবা মুরগী দিয়া দেখা হউক্, সে খায় কি না। সেই প্রস্তাব মত তাহাকে পরদিন একটা বড় মুরগী দেওয়া হইল। প্রথমটা অলক্ষ্য ভাবে দূরে বসিয়া থাকিয়া, সে মুরগীটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দু-চার মিনিটের মধ্যে তাহাকে নিঃশেষ করিয়া খাইয়া ফেলিল। এদিকে ওদিকে শুধু কয়েকটা ছিন্ন পালক মৃত মুরগীটার চিহ্ন-স্বরূপ পড়িয়া রহিল। তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, এই একমাত্র উপায়ে বন্দীটিকে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে।

সুখ খাঁ তাহাকে ভাষা শিখাইবার চেষ্টা করিত। যখন সে জল দিত, তখন চীৎকার করিয়া বলিত, ‘পানি’। একদিন পর একদিন মুরগী দিবার সময় চীৎকার করিয়া বলিত, ‘মুর্‌গী’। ঘটনাবশতঃ সুখ খাঁ একদিন কাজে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল, যথা সময়ে তাহার মুর্‌গী দেওয়া হয় নাই; বেচারি ক্ষুধায় অস্থির হইয়া চারিদিকে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছিল। সেদিন সারাটা দিন গেল, তার পর দিন সকালে তাহাকে দেখিতে গেলাম। অন্যদিন সে আমাকে দেখিলে, ঘরের এক কোণে গিয়া লুকাইয়া বসিত, আর ক্রুদ্ধ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিত; আজ আমাকে দেখিয়া কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, বরং রেলিংএর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া, কি একটা অস্পষ্ট শব্দ করিতে লাগিল। এমন সময়ে সুখ খাঁ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া বন্দীর উৎসাহ ও আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সুখ খাঁ তাহার সেই অস্পষ্ট শব্দ শুনিয়া ভারি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল,

"হুজুর, শুন্‌লেন ত, আমাদের বন্দী এরই মধ্যে কথা কইতে আরম্ভ ক'রেছে! আমাকে দেখেই 'গি গি' ক'রে চীৎকার ক'র্‌ছে; আমি কি না প্রতিদিন ওকে মুরগী দি, তাই মুরগী স্পষ্ট ক'রে না বল্‌তে পেরে, 'গি গি' বল্‌ছে।" সত্যই, তাহার এ ব্যবহারে আমরা খুব আশ্চর্য্য হইলাম, আর মনে মনে একটা আশাও হইল যে, ক্রমে হয় ত সে আমাদেরই মত হইবে। এই ভাবে তিন মাস কাটিয়া গেল। একদিন সংবাদ আসিল, মনোহর দাস তীর্থস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে পুলিস-ষ্টেশনে আসিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়া পাঠাইলাম। আমাদের পত্র পাইয়া, মনোহর দাস অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার তীর্থস্নান, কাজ-কর্ম্ম, এদিক্ সেদিক্ নানা কথা হইবার পর, জিজ্ঞাসা করিলাম, "শেঠজি, আপনার সন্তানাদি কি?" তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "ঈশ্বর আমাকে সব সুখই দিয়েছেন, কেবল ঐ এক সুখে বঞ্চিত করেছেন! তবে আমার সন্তান যে একেবারে হয় নি, তা' নয়। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু দিন আগে তিনি আমাকে একটি পুত্র-সন্তান দিয়েছিলেন। আমিও আনন্দে তার গা ভ'রে গয়না দিয়াছিলাম। সেই অলঙ্কারই তার কাল হ'লো। কতকগুলি দুষ্ট লোক সেই গয়নার লোভে, তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। তার পর আর কিছু জানিনে। সে কি আর বেঁচে আছে! নিশ্চয়ই সেই চোরেরা প্রাণে মেরে গয়না কেড়ে নিয়েছে।"

এই কথার পর আমি মনোহর দাসের হাতে বালা-গাছটি দিয়া বলিলাম, "শেঠজি, এই বালা কি চিন্‌তে পারেন?" মনোহর দাস অন্যমনস্ক ভাবে বালাটি দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখিতে লাগিলেন; যত দেখেন, ততই তাঁহার মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মুখ একেবারে শাদা হইয়া গেল, থর থর করিয়া সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, হাত হইতে বালাটি মাটিতে পড়িয়া গেল! তাঁহার এই ভাবান্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "শেঠজী, কি হ'য়েছে বলুন, অমন অস্থির হ'বেন না।" তিনি ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, "হায় বিধাতা! এ বালা যে তারি, আমি হীরালালের দোকানে গড়িয়ে ছিলাম। তোমরা এ বালা কোথায় পেলে? এ কি চোরাই মালের মধ্যে পেলে, না মরা মানুষ আবার বেঁচে উঠেছে? সাহেব, শীগ্‌গির ক'রে বল; সে কি তবে বেঁচে আছে? যেমন আশা ক'রেছিলাম, সে কি তেমনি সুস্থ, সবল আর সুন্দর হ'য়েছে? তার কথা আমাকে বল; আর দেরী ক'রো না।" আমরা কি বলিব, কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। এই বৃদ্ধের

মনে অকস্মাৎ যে সুখের সুন্দর কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া নিষ্ঠুর সত্য বলিয়া সে আশা চূর্ণ করিয়া দিব? তাই আমরা চুপ করিয়া রহিলাম। আমাদের চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, তিনি আরও অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তার কথা তোমরা জান ত, বল! আমাকে আর সন্দেহে রেখো না, তা হ'লে আমি বাঁচ্‌বো না। তোমাদের সংবাদ শুভ কি অশুভ, আমাকে তাই বল।"

আমরা বলিলাম, "মনোহর দাস, তোমার ছেলে জীবিত আছে।" এই কথা শুনিয়া মনোহর দাসের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি আমাদের কত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, কত ধন্যবাদ দিলেন, আর বার বার বলিতে লাগিলেন, "সে কোথায় আছে, একবার আমাকে তার কাছে নিয়ে চল; আহা! আমার বাছাকে একবার বুকে ক'রে এতদিনের সমস্ত কষ্ট ভুলে যাব।" তিনি গিয়া কি ভয়ানক দৃশ্য দেখিবেন এই মনে করিয়া, আমরা কেহই অগ্রসর হইতেছিলাম না; এমন সময় সেখানকার দারোগা উঠিয়া দাঁড়াইল। অনেক দিন ধরিয়া পুলিসে কাজ করিয়া তাহার মনটা নিতান্তই কঠিন হইয়া গিয়াছিল। সে মনোহর দাসের হাত ধরিয়া, সেই ঘরের গরাদের কাছে লইয়া গিয়া, বন্দীকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ দেখ, তোমার ছেলে।" মনোহর দাস কিছুতেই বিশ্বাস করিতেছেন না দেখিয়া, দারোগা বলিল, "হাঁ মশাই, ও তোমারই ছেলে, ছেলেবেলায় জঙ্গলে পেয়ে, নেক্‌ড়ে বাঘ ওকে 'মানুষ' ক'রেছে। আজ তিন মাস পূর্ব্বে সাহেবেরা শিকার ক'র্‌তে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে অনেক কষ্টে ওকে ধরে নিয়ে এসেছেন। হাতের যেখান হ'তে বালা গাছটা কেটে বার ক'রে নেওয়া হয়েছে, তার ঘা এখনো সারে নি, দেখ্‌তে পাচ্ছ না?"

প্রথমটা মনোহর দাস, যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না, এমনি ভাবে অবাক্‌ হইয়া দারোগার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর তাঁহার চোখের উপর সব ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল, তিনি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন! অনেক যত্নে তাঁহার জ্ঞান হইলে পর, একখানি গাড়ী আনাইয়া অতি আস্তে আস্তে চালাইয়া তাঁহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। মনোহর দাস তার পরদিন একখানি পাল্কীতে তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে আনিয়া, আমাদের বলিলেন, "আমার স্ত্রী ত ছেলে দেখ্‌বার জন্যে অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে পড়েছেন। তাঁকে না নিয়ে এসে থাক্‌তে পার্‌লাম না। তবে সাহেব, তোমরা ত জানই, আমাদের মেয়েরা বাইরে বেরোয় না। দয়া ক'রে যদি এমন একটু যায়গা দেও, যেখান থেকে তিনি তাঁর ছেলেকে দেখ্‌তে পারেন, অথচ অন্য কেউ তাঁকে দেখ্‌তে না পায়, তা হ'লে বড় ভাল হয়।" বন্দী যেখানে থাকিত, তাহার পাশেই একটি ছোট ঘর ছিল, আমরা সেই ঘরটি মনোহর দাসের স্ত্রীর

জন্য ঠিক করিয়া দিলাম। দুই ঘণ্টা পরে মনোহর দাস বলিলেন, "ভাগ্যে আপনারা যে ঘর দিয়েছেন, তার কোন দিক্ দিয়েই বন্দীর ঘরে প্রবেশ করা যায় না, তা না হ'লে, আমার স্ত্রী যে কি ক'র্‌তেন, ব'ল্‌তে পারি নে। আমি তাঁকে অনেক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা ক'রেছি; তিনি যাকে ছেলে বলে মনে ক'র্‌ছেন, সে ত আর মানুষ নেই—একটি হিংস্র জন্তু! সে কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, একবার গেলেই সে তাঁকে চিন্‌তে পার্‌বে। এখন তিনি গরাদের কাছে দাঁড়িয়ে ছেলেবেলাকার ঘুমপাড়ানী-গান গেয়ে তাকে শোনাচ্ছেন, আর বল্‌ছেন যে, তার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, সে তাকে চিন্‌তে পেরেছে। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, তিনি ছেলের কাছে যান, আমি অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে তাঁকে থামিয়ে রেখেছি।"

এই ভাবে দু-এক দিন গেল, মনোহর দাসের স্ত্রী স্নানাহারের সময়টুকু ছাড়া প্রায় সমস্ত সময়ই সেই গরাদের ধারে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেন, ছেলেবেলাকার আদরের নাম ধরিয়া ডাকিতেন। এমনি একদিন পূর্ণিমার রাতে তিনি দাঁড়াইয়া গান গাহিয়া তাহাকে শুনাইতেছিলেন, এমন সময় ছেলেটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; চাঁদের আলোতে দেখিতে পাইলাম, তাহার চোখ দুটি ছল্‌ছল্ করিতেছে! এই দেখিয়া আমার ভারি আশ্চর্য্য মনে হইল। তবে কি ওর মনের মধ্যে কোন স্মৃতি জাগিয়াছে? বন্দী আগে মানুষ দেখিলে এককোণে গিয়া লুকাইয়া থাকিত, এখন তাহার সে অভ্যাস চলিয়া গিয়াছে। সে যখনই তাহার মাকে দেখিত কিংবা তাঁহার গান শুনিত, তখনই দুয়ারের কাছে, গরাদের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। মনোহর দাসের স্ত্রী এই সময় অনেক করিয়া তাঁহার স্বামীকে বুঝাইয়া, তাহার ঘরের ভিতর যাইবার অনুমতি লইয়াছিলেন। সে দিন পরিষ্কার জোৎস্না রাত্রি, চারিদিক্ নিস্তব্ধ নির্জ্জন, সেই সময় তিনি তাঁহার সুমধুর মৃদুস্বরে ঘুমপাড়ানী-গান গাহিতে গাহিতে তাহার ঘরের ভিতর গেলেন। চাঁদের আলোতে তাঁহাকে অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাইতেছিল! তাঁহার গানের মাধুর্য্যে বন্দী তাহার হিংস্র স্বভাব ভুলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া, আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। তিনি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, সেই ঘুমপাড়ানী-গান গাহিতে গাহিতে, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার মুখটি বুকের উপর রাখিলেন। মুখের উপর হইতে তাহার অপরিষ্কার এলো-মেলো চুল সব সরাইয়া দিয়া, কত স্নেহে দুইখানি হাত দিয়া, তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন। কত দিনের পুরাতন স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। সেই অতি শিশুকালে সে কেমন সুকুমার, সুকোমল সুন্দর ছিল! কেমন মিষ্ট করিয়া হাসিত! কেমন করিয়া তাহার কচি গলায় আধ আধ সুরে 'মা' বলিয়া ডাকিত! হায়

বিধাতা! এই তাঁহার একমাত্র সন্তান, তাহারও এমন দুর্দ্দশা! এই মনে করিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না—কাঁদিয়া উঠিলেন। গানের আওয়াজ থামিয়া গেলে, যেই সে কান্নার শব্দ শুনিল, অমনি যেন তাহার চমক্ ভাঙিয়া গেল! সে যে শান্ত শিষ্ট হইয়া বসিয়াছিল, সে সব ভুলিয়া গিয়া, আবার দারুণ হিংস্র হইয়া উঠিল, আর একটু হইলে, তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত। এমন সময় তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া বৃদ্ধ মনোহর দাস দৌড়িয়া আসিয়া, একটি জ্বলন্ত মশাল বন্দীর মুখের সম্মুখে ধরিলেন; আগুন দেখিয়া সে যখন কোণে গিয়া লুকাইয়া বসিল, তখন তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে কোনও রূপে বাহিরে পলাইয়া আসিলেন। ইহার পর মনোহর দাসের স্ত্রী আর বন্দীর ঘরের ভিতর যাইবার চেষ্টা করিতেন না। কিন্তু প্রতিদিন তাহার জন্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া, গরাদের ভিতর দিয়া রাখিয়া আসিতেন। তিনি প্রতিদিন মাংস রাঁধিয়া তাহাকে খাইবার জন্য দিতেন। রাঁধা মাংস খাইয়া যে দিন তাঁহার ছেলে কাঁচা মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিল, সেদিন স্বামী-স্ত্রীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। একদিন মনোহর দাস দৌড়িতে দৌড়িতে আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, "তিনি তাকে বশ ক'রেছেন, তিনি তাকে বশ ক'রেছেন!" আমরা কিছু না বুঝিতে পারিয়া দৌড়িয়া বন্দীর ঘরের গরাদের সম্মুখে গেলাম। সে ঘর শূন্য! অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, বন্দী তাহার মায়ের সঙ্গে আছে। মনোহর দাসের কথামত আমরা পাশের ঘরের জানালা দিয়া দেখিলাম, সে তাহার মায়ের কোলের কাছে বসিয়া আছে, আর তিনি তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিতেছেন! সে তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে না, বরং পোষা বিড়ালকে আদর করিলে, সে যেমন ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করে, গায়ের কাছে ঘেঁসিয়া বসে, আনন্দ জানায়, সে-ও তেমনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। ইহার এক সপ্তাহ পরে, সে তাহার মায়ের এমনি বশ হইয়াছিল যে, মনোহর দাস তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার অনুমতি চাহিলেন। আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। পাছে বন্দী ছাড়া পাইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে, কাহারও অনিষ্ট করে, এই যা ভয় ছিল। মনোহর দাস বলিলেন, সে বিষয়ে কোন ভয় নাই। তিনি সে বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিবেন। বন্দী আর তাহার মা একত্রে এক পাল্কীতে গেলেন।

দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল; আমি নানা জায়গা ঘুরিয়া আবার কানপুরে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া, আমি অনেককে বন্দীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিল না। সে তাহার মায়ের সঙ্গে যাইবার কিছু দিন

পরেই, আমাদের বন্ধু পুলিশ সাহেব অন্যত্র বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাহার কথা কিছু বলিতে পারিলেন না। আমি মনে করিয়াছিলাম, বন্দী বনের স্বাধীনতা হারাইয়া বেশীদিন হয় ত বাঁচে নাই। যাহাই হউক, তাহার একটা সংবাদ জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছিল। তাই আমি মনোহর দাসের বাড়ী গেলাম। সম্মুখের যে বারান্দায় মনোহর দাস কাজ করিতেন, সেইখানে গিয়া দেখিলাম, একটি তরুণ বয়স্ক সুন্দর যুবক, অনেকগুলি কেরানী সঙ্গে করিয়া কাজকর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার মুখ সৌম্য, প্রশান্ত এবং গম্ভীর। ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া, অনায়াসে তাঁহাকে সেখানকার কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া, উঠিয়া আসিয়া অভিবাদন করিয়া নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কি দরকার?"

আমি বলিলাম, "মনোহর দাস শেঠজীকে একবার দেখ্‌তে পাব কি?" এমন সময় বারান্দার অপর পাশ হইতে ক্ষীণস্বরে উত্তর আসিল, "আপনার, দাস এখানেই উপস্থিত আছে।" ফিরিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ মনোহর দাস ফরাসের উপর অনেকগুলি তাকিয়া লইয়া, আরাম করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া, আমার হাত ধরিয়া সমাদর করিয়া, কাছে বসাইয়া বলিলেন, "আপনাকে কত কথা বল্‌বার আছে। এ জীবনে এ আনন্দ যে আর হবে, কখনো আশা করি নি। ভগবানের অসীম দয়া!" এই বলিয়া বৃদ্ধ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, মাথার উপর হাত রাখিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। বসিবার পর আমি বলিলাম, "মনোহর দাস, তোমার ছেলের -- খবর কি? তাকে কি বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পেরেছ?"

মনোহর দাস হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সাহেব, তাকেই ত তুমি বারান্দায় দেখে এলে! সেই ত আমাদের বৃদ্ধ বয়সের সম্বল।" তার পর তিনি বলিলেন, "সাহেব, যে এক সময় বাঘ ছিল, আজ সে একজন গণ্যমান্য লোক। যদি তুমি এ সহরের কারো কাছে তার জীবনের সেই ঘটনা বলো, তা হ'লে পাগল বলে সকলে তোমাকে হেসে উড়িয়ে দেবে! কেহ সে বিষয় জানে না, দয়া ক'রে সে কথা কাউকেও বলো না। আমার ছেলেরও ঐ সব কথা শুন্‌লে বড় কষ্ট হয়।" আমি মনোহর দাসকে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা শেঠজী, কেমন ক'রে তাকে কথা কইতে, প'ড়্‌তে, লিখ্‌তে শেখালে?"

মনোহর দাস বলিলেন, "তার মা—তিনিই সব ক'রেছেন! তিনি যে কষ্ট-স্বীকার ক'রেছিলেন, এতদিনে তার ফললাভ হ'য়েছে। তাঁর মত সুখী মা আর একটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। ছেলে যে তাঁকে কত ভালবাসে, কত তাঁর অনুগত

ও বাধ্য তা আর কি ব'লব!" ঠিক সেই মুহূর্তে মনোহর দাসের ছেলে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। মনোহর দাস তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ লছমন, এই সেই সাহেব, যিনি তোমাকে বাঘের গর্ত থেকে নিয়ে এসেছিলেন! ইনিই তোমার সেই রক্ষাকর্ত্তা।" লছমনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—সে কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না! আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সাহেব, আমি আর কি ব'লব, তোমার ঋণ কখন পরিশোধ ক'রতে পারবো না!"

ভালুক-শিকার

উত্তর আমেরিকার গ্রিজলির মত এমন দুর্দ্দান্ত ভালুক আর নাই। একজন আমেরিকাবাসী লিখিয়াছেন যে, তাঁহাকে এই ভালুক একবার ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল। একটা প্রবল স্রোত-সঙ্কুল নদী সাঁত্‌রাইয়া পার হইয়া, তবে তিনি রক্ষা পান। বন্দুকের গুলিতে সর্ব্বাঙ্গ ঝাঁঝ্‌রার ন্যায় হইলেও ইহাদের প্রাণ-বিয়োগ হয় না। সেই অবস্থায় শিকারীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, অনেক সময় তাহাকে একেবারে শেষ করিয়া ফেলে। মস্তিষ্কে বা হৃৎপিণ্ডে গুলি লাগিলে তবেই ইহারা কাবু হয়।

পূর্ব্বে গ্রিজ্‌লির সহিত সম্মুখযুদ্ধ লোকে অসম্ভব বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু এখন এমন সকল বন্দুক প্রস্তুত হইয়াছে, যাহা মিনিটে অনেকবার ছোড়া যায়, এবং যাহাদের পাল্লাও খুব বেশী। সেইজন্য গ্রিজ্‌লি শিকার আজকাল অনেক সহজ হইয়া আসিয়াছে।

এই জন্তু-শিকারের একটা প্রচলিত কৌশল এখানে বর্ণিত হইল:—যে গুহায় গ্রিজ্‌লি থাকে, তাহা চিনিতে শিকারীদের বিলম্ব হয় না। ভালুকের সন্ধান পাইলে, শিকারী এক হাতে একটা মশাল ও অন্য হাতে বন্দুক লইয়া, ধীরে ধীরে গুহার মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকে। গুহার শেষ প্রান্তে মশালের আলোকে ভালুককে নিদ্রিত দেখিয়া, সে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহার লক্ষ্য ঠিক করিয়া লয়। তার পর মশাল মাটিতে পুঁতিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়ায়। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না। ঝাপ্‌সা আলোক চক্ষে পড়ায়, ভালুক জাগিয়া উঠে এবং একটু অবাক্ হইয়া, মাটি শুঁকিতে

শুঁকিতে অগ্রসর হয়। ক্রমে তাহার ভয়ঙ্কর চেহারাটা বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। ভালুক যখন একমনে মশাল পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত তখন শিকারীও সময় বুঝিয়া তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি মারে। বন্দুকের শব্দের সহিত ভালুকের ভীষণ চীৎকার শুনিতে পাওয়া যায়। তারপর কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া সে প্রাণ ত্যাগ করে। যদি কোন কারণে প্রথম গুলিটা সাংঘাতিক না হয়, তাহা হইলে শিকারীর প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

গ্রিজ্‌লি-ভালুক

গ্রিজ্‌লি-শিকারে বিপদের আশঙ্কা যে কত অধিক, নিম্নলিখিত গল্পটিতে তাহা বুঝা যাইবে ঃ—গারষ্টেকার নামক একজন জার্ম্মান উত্তর আমেরিকাতে ভালুক-শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আরস্কাইন নামক একটি যুবক ও পাঁচটি শিকারী-কুকুর ছিল। জঙ্গলে সমস্ত দিন ঘুরিয়াও ভালুকের সন্ধান না পাইয়া, গারষ্টেকার ও আরস্কাইন হতাশ হইয়া পড়েন, এমন সময়ে, হঠাৎ অদূরে কুকুরগুলির চীৎকারে তাঁহারা চমকিত হইয়া, সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। দেখিলেন, একটা বিপুলকায় ভালুক চারিটি কুকুরকে থাবার আঘাতে ধরাশায়ী করিয়া, পঞ্চমটির সহিত যুদ্ধ সুরু করিয়াছে। কুকুরদের কামড়ে সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আরস্কাইন তাঁহার সাধের কুকুরদের এই দুরবস্থা দেখিয়া, রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে, দুই হাতে দু'খানা শাণিত ছুরিকা লইয়া ভালুককে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু আহত হইয়াও সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ার তাঁহাকে এমন জাপ্‌টাইয়া ধরিল যে, তাঁহার আর নড়িবার শক্তি রহিল না। বন্ধুর বিপদ দেখিয়া গারষ্টেকার বন্দুকের বাঁট দিয়া ভালুকের গায়ে তিন চারিবার আঘাত করিতেই, সে আরস্কাইনকে না ছাড়িয়াই, তাঁহাকে এমন এক থাবা মারিল যে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন জ্ঞান হইল, তখন গার্‌ষ্টেকার দেখিলেন, সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। তিনি মাটিতে পড়িয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ বাহুতে অসহ্য যন্ত্রণা। তাঁহার ভক্ত কুকুর তাঁহার কানের কাছে মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ করিতেছে। পাশের দিকে চাহিয়া তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার প্রিয় বন্ধু আর্‌স্কাইন সেই ভয়ঙ্কর ভালুকের পাশে পড়িয়া আছেন। কুকুর চারিটিরও প্রাণ আছে কি না, সন্দেহ।

একে এই বিপদ্, তাহার উপর সন্ধ্যা হইলেই, নেক্‌ড়েরা আসিয়া তাঁহাদের দেহে যতটুকু প্রাণ আছে, তাহাও রাখিবে না—এই ভয়ে তিনি বহু কষ্টে উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণ বাহু প্রায় ছিন্ন হইয়াছে। তবুও কোন রকমে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া, তিনি বন্দুকের বারুদ ও তাঁহার ছেঁড়া জামার সাহায্যে আগুন ধরাইয়া, কষ্টেস্পষ্টে রাত্রি কাটাইলেন। প্রভাতে সাহায্য আসিলে, তিনি কোন রকমে তাঁবুতে গিয়া, এক মাস কাল শয্যাশায়ী থাকিয়া সুস্থ হন। আর্‌স্কাইন ও তিনটি কুকুরের সেখানেই মৃত্যু হইয়াছিল।

"প্রাচীন শিকারী' নাম দিয়া একজন ইংরেজ ভারতবর্ষের বন্য জন্তু শিকারের যে বই লিখিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নের গল্পটি উদ্ধৃত হইল :—"............আমরা এক উচ্চ পর্ব্বতের কাছে আসিয়া পড়িলাম। দেশী শিকারীদল পথ দেখাইয়া চলিতেছিল। তাহাদের নির্দ্দেশমত কাঁটা-ঝোপ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বত-শিখরে উঠিতে লাগিলাম। পাহাড়টি এমনি খাড়া যে, আমাদের পা কাঁপিতে লাগিল; বহু কষ্টে হামা দিয়া, গাছের শিকড় ধরিয়া উঠিতে লাগিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, একটি বৃহৎ গহ্বরের মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। দূর হইতে এই গহ্বরের অবস্থান বুঝিতে পারি নাই। দেশী শিকারীরা বলিল যে, সেই গুহার মধ্যেই ভালুকটা লুকাইয়া রহিয়াছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া বহু অনুসন্ধানের পর, সহসা একস্থানে ভালুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম এবং একটু পরেই কুকুরের চীৎকার শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, ঠিক স্থানেই আসিয়াছি। দুইটি কুকুর আমাদের কিছু আগে আগে চলিতেছিল। তাহারাই ভালুক দেখিয়া চীৎকার করিতেছে। ইহার অল্পক্ষণ পরেই একটি মৃদু গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। বুঝিতে পারিলাম, এইবার সাবধান হইতে হইবে। এই ভাবিয়া একখানা বড় পাথরের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় কুকুরের কামড়ে ক্ষিপ্তপ্রায় একটা বিরাট কৃষ্ণকায় ভালুক একেবারে একজন দেশী শিকারীর উপর আসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়া, তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল। পাথরের আড়াল হইতে আমি কেবল ভালুকের পিছনটা দেখিতে

পাইতেছিলাম, তাহাই লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম। কিন্তু কি কারণে জানি না, আমার গুলি ব্যর্থ হইল। দ্বিতীয়বার গুলি ছুড়িলাম। আহত ভালুক এবার তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া, তাহার শিকার ছাড়িয়া, পলায়নপর অন্যান্য শিকারীদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। আমি দ্রুতগতিতে বাহিরে আসিয়া আহত লোকটিকে তুলিয়া ধরিলাম এবং এক-হাতে তাহাকে ধরিয়া অন্য হাত দিয়া ভালুকটাকে লক্ষ্য করিয়া, আরও দুইটি গুলি ছুড়িলাম। গুলি খাইয়া সে সহসা পিছন ফিরিয়া গভীর জঙ্গলে পলাইয়া গেল।

"ভালুকের চোখ দিয়া যেন অগ্নি বর্ষিত হইতেছিল।"—২০৯ পৃষ্ঠা

আমি তাড়াতাড়ি জন কয়েক লোক ডাকিয়া, আহত যুবকটির শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া, তাহাকে তাঁবুতে পাঠাইয়া দিলাম ও কয়েকজন সাহসী শিকারী সঙ্গে লইয়া আবার ভালুকের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। দুইটি কুকুর ইতিপূর্ব্বেই ভালুকের হাতে নিহত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া অন্যান্য কুকুরেরা আর ভরসা পাইতেছিল না; তবু আমাদের

তাড়া খাইয়া মাটি শুঁকিতে শুঁকিতে অগ্রসর হইল এবং একটি ঝোপের ধারে গিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বুঝিলাম, ভালুকটা সেই ঝোপেই আশ্রয় লইয়াছে। আমরা ঝোপের কাছে গিয়া ভিতরে দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঘন পত্র-পল্লব ভেদ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, আমি একটি গাছের গুঁড়িতে বন্দুক হেলাইয়া রাখিয়া উপরে উঠিতে যাইব, এমন সময় ভালুকটা গভীর গর্জ্জন করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইল। সৌভাগ্যক্রমে ঝোপ্‌টা খুব ঘন ছিল, তাই আমার নিকট আসিতে তাহাকে একটু বেগ পাইতে হইতে-ছিল। এই অবসরে আমি গাছ হইতে নামিয়া, বন্দুক তুলিয়া প্রস্তুত হইলাম। সেই ভীষণকায় জানোয়ারটা ইতিমধ্যে আমার ঠিক দুই হাতের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাহার চোখ দিয়া যেন অগ্নি বর্ষিত হইতেছিল। আমি পর পর দুইবার গুলি করিলাম। সেই দুই গুলির আঘাতেই ভালুকটা দুইবার পাক খাইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল; কিন্তু ভালুকের প্রাণ এমনি কঠিন যে, ইহার পরেও সে করুণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একবার শেষ আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। আর দেরী করা ঠিক নয় বিবেচনা করিয়া, আমি আর একবার গুলি করিলাম। ভালুকটা এইবার যে পড়িল, আর উঠিতে পারিল না। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইল। আমি জীবিত ও মৃত যত কালো ভালুক দেখিয়াছি, এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। জানোয়ারটা প্রায় সাড়ে তিন হাত লম্বা হইবে এবং ওজনে দশ মণের কম হইবে না।"

এই প্রাচীন শিকারী আর একবার ভালুক মারিতে গিয়া এমন ভয়ানক বিপদে পড়েন যে, তিনি যে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই আশ্চর্য্য। তাঁহারা কয়েকজনে মিলিয়া দক্ষিণ ভারতের কোন স্থানে এক বন্ধুর গৃহে বেড়াইতে যান। সেখানে গিয়া শুনিলেন, নিকটেই একটা পাহাড়ে কতকগুলা ভালুক দেখা গিয়াছে। এই খবর পাইবামাত্র তাঁহারা সেইখানে গিয়া হাজির হইলেন এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকটা ভালুক মারিলেন। তার পর তিনি বন্দুকে সবেমাত্র একটা টোটা ভরিয়াছেন, এমন সময় উপর হইতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ বন্দুকের শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট চীৎকার শুনিতে পাইলেন। তাকাইয়া দেখেন, এক রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাণ্ড ভালুক তাঁহার এক অনুচরকে তাড়া করিয়াছে এবং লোকটি ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। ব্যাপার অত্যন্ত সঙীন দেখিয়া, শিকারী ভালুককে লক্ষ্য

করিয়া সেই গুলিটা ছুড়িলেন। ভালুকের খোপনা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল, তবু তাহার গতি প্রতিহত হইল না। সেই অবস্থায় সে ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল।

অনুচর সে যাত্রা রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু সেই বিশাল-দেহ ভালুকের প্রগাঢ় আলিঙ্গনে শিকারীর প্রাণ যায় যায়! ইহার উপর ভালুকের মুখের রক্ত দর্‌দর্‌ ধারে নাকে মুখে পড়িয়া, তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, কিন্তু তিনি তবুও দমিলেন না। সেই অবস্থায় ভালুকের হাত দুইটা এমন কৌশলে আট্‌কাইয়া ফেলিলেন যে, আঁচড়্‌-কামড়্‌ দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। এইভাবে কুস্তি লড়িতে লড়িতে উভয়েই গড়াইয়া পাহাড়ের তলায় পড়িলেন। তখন তাঁহার অনুচর একখানা দা লইয়া ছুটিল। কিন্তু ধস্তাধস্তিতে পাছে দা-খানার কোপ তাঁহার নিজেরই উপর পড়ে, এই ভয়ে শিকারী তাহাকে নিষেধ করিলেন।

ইহার পর ভালুককে আর বেশীক্ষণ যুঝিতে হয় নাই। অতিরিক্ত রক্তপাতে সে ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। তাহার আলিঙ্গন শিথিল হইতে না হইতে, শিকারী তাঁহার কোমরবন্ধ হইতে ছোরা বাহির করিয়া, তাহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। ভালুকের সব জারিজুরি ফুরাইল!

ভালুকের স্বভাব কত উগ্র এবং হিংসা-প্রবৃত্তি কত প্রবল, নিম্নের গল্পটি পাঠ করিলে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে:—এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "ছেলেবেলা হইতে আমার মনে শিকারী হইবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে! আমাদের বাড়ীর কাছে একজন দক্ষ শিকারী বাস করিতেন। তাঁহার সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহে একদিন তাঁহার সহিত শিকারে বাহির হইলাম। আমাদের দু'জনের হাতে দুইটি বন্দুক ও দুইখানি ধারাল ছোরা ছিল। আমরা অল্প অল্প জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, ক্রমে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিলাম। তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সেই পাহাড়ের মাঝে মাঝে ভালুক পাওয়া যায়, এইরূপ একটা জনশ্রুতি আছে, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও আমাদের ভাগ্যে কিছুই মিলিল না। তখন বন্ধু বলিলেন, "আমি আর একটা জায়গা খুঁজে আসি, তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি এখনই ফিরে আস্‌ব। যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে না আসি, তবে তুমি বাড়ীতে চলে যেও।" বন্ধু চলিয়া গেলে, আমার গা-টা কেমন যেন ছম্‌ ছম্‌ করিয়া উঠিল! যদি হঠাৎ কোন হিংস্র জন্তু আসিয়া উপস্থিত হয়, এই ভয়ে আমি একটা গাছে

চড়িয়া বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। একটা পাতা নড়িলেই চাহিয়া দেখি, তিনি আসিতেছেন কি না, কিন্তু পরক্ষণেই নিরাশ হই। এইরূপে আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তবুও তাঁহার দেখা নাই।

তখন সূর্য্য একেবারেই ডুবিয়া গিয়াছে। আর অপেক্ষা করা বৃথা মনে করিয়া, আমি নীচে নামিয়া বাড়ীর দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় হঠাৎ বিপরীত দিকে কি একটা শব্দ শুনিলাম। বন্ধু আসিতেছেন ভাবিয়া, আগ্রহের সহিত ফিরিয়াই দেখিতে পাইলাম, একটা প্রকাণ্ড ভালুক মাথা নীচু করিয়া আমার দিকে আসিতেছে; দেখিয়াই আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি সেই অবস্থাতেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলাম। গুলি ভালুকের দেহ বিদ্ধ করিল বটে, কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া, সে সরোষে আমায় তাড়া করিল। আমিও বন্দুক ফেলিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া নিকটের একটা গাছে উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু গাছে চড়িয়া ভালুকের হাত হইতে

"আমাকে ডালের শেষ পর্য্যন্ত লইয়া গেল।"

রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। দেখিতে দেখিতে সে-ও গাছের উপর উঠিল এবং তাড়াইতে তাড়াইতে আমাকে একটা ডালের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত লইয়া গেল। তখন ছোরাই আমার একমাত্র সম্বল। ছোরা বাহির করিয়া তাহার নাকে, মুখে, চোখে কয়েক ঘা বসাইতেই বেশ কাজ হইল। ভালুক রাগে গর্জ্জন করিতে করিতে, তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম, আপদের শান্তি! কিন্তু পরক্ষণেই তাহাকে সম্মুখের দুই পায়ের দ্বারা গাছের গোড়া খুঁড়িতে দেখিয়া আমার ত চক্ষুস্থির! বোধ করি, গাছটা উপ্‌ড়াইয়া আমাকে মারিবে, এই তাহার ইচ্ছা। তখন অন্ধকার হইতে অল্প বাকি। জঙ্গলের মধ্যে আমি একাকী; চীৎকার করিলেও কাহারো সাড়া পাইবার আশা নাই। রাত্রেই ভালুকের হাতে মরিতে হইবে ভাবিয়া, আমার

মন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। এইরূপ ভাবে অনেকক্ষণ চলিয়া গেল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। মাটি খোঁড়ার শব্দে বুঝিতে পারিলাম, ভালুক আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। তখন মৃত্যুই নিশ্চিত জানিয়া, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, বাকি রাত কি ভাবে কাটিল, সে সম্বন্ধে আমার কোন পরিষ্কার ধারণা নাই। সকাল হইলে দেখিলাম, ভালুকটা তখনও গাছের গোড়া খুঁড়িতেছে। ক্রমে মনে হইল, গাছটা একটু দুলিতেছে; সেই সঙ্গে আমার জীবনের সকল আশাও ফুরাইবার উপক্রম হইল। তার পর গাছটা একটু হেলিয়া পড়িল, আমি শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এমন সময় হঠাৎ কিছু দূরে লোকজনের কোলাহল শুনিতে পাওয়া গেল। এ কি! তবে কি আমার বন্ধু আসিতেছেন? এই আশ্বাসে আমার অবসন্ন প্রাণেও একটু আশার সঞ্চার হইল! ভালুকও সেই শব্দ কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। শব্দ ক্রমশঃ নিকটে বোধ হইল। অল্পক্ষণ পরে আমার নাম ধরিয়া বন্ধুকে চীৎকার করিতে শুনিলাম। আমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ভালুক সেই চীৎকার শুনিয়া আমার দিকে একবার স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। তাহার একটু পরেই বন্ধু ও তাঁহার কয়েক জন সঙ্গী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি নামিয়া আসিবামাত্র গাছটা পড়িয়া গেল। আমিও আনন্দের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বন্ধুর বুকের উপর অচেতন হইয়া পড়িলাম!"

মহিষ-শিকার

পোষা অবস্থায় মহিষ যতই নিরীহ হউক, বন্য অবস্থায় ইহার দিকে চাহিতেও ভয় হয়। ইহার চক্ষে এমন একটা বিদ্রোহের ভাব সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনে হয়, এই বুঝি সে বড় বড় শিং দিয়া গুঁতাইয়া দিল! একবার ক্ষেপিয়া উঠিলে, মানুষ ত দূরের কথা, ইহারা বাঘ, সিংহ, হাতী কাহাকেও গ্রাহ্য করে না!

কাপ্তেন ম্যাথুয়েন্ ও তাঁহার এক সঙ্গী যখন দক্ষিণ আফ্রিকাতে শিকার করিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন একদিন শুনিলেন যে, তাঁহাদের তাঁবুর পাশেই একটা জঙ্গলে একদল বন্য মহিষ আসিয়া জুটিয়াছে। সাহেব অমনি তাঁহার সঙ্গী ও 'ফ্রলিক্' নামে এক হটেণ্টট্ অনুচর লইয়া মহিষ-শিকারে রওনা হইলেন। তখন বেলা

দ্বিপ্রহর। তাঁহাদিগকে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না: দলের কয়েকটা মহিষ নিশ্চিন্ত মনে এক নদীর ধারে চরিয়া বেড়াইতেছিল; বাকিগুলি জলের মধ্যে খেলা করিতে-ছিল। চারদিকে নিবিড় অরণ্য। দিনের আলোকেও স্থানটা বেশ অন্ধকার।

"ফ্রলিক্‌কে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল!"—২১৫ পৃষ্ঠা

ম্যাথুয়েন্ সাহেব মহিষের দলকে দেখিতে পাইয়াই, একটি গাছে চড়িয়া কয়েকটা গুলি ছুড়িলেন। দুই একটার গায়ে গুলি লাগিতেই, তাহারা চকিত হইয়া আর্ত্তনাদ

করিতে করিতে, এদিক্ ওদিক্ ছুটিতে শুরু করিল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে সেখানে আর মহিষের চিহ্নই রহিল না। কিন্তু শিকারী তিনজন ইহাতে হাল না ছাড়িয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়াই একটি বৃহৎকায় পুরুষ মহিষকে দেখা গেল। সঙ্গী দুই জনকে চুপ করিয়া দাঁড়াইতে বলিয়া, সাহেব অপর একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, মহিষের কাঁধ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। গুলি খাইয়াই সে সম্মুখের দিকে খানিকটা দৌড়াইয়া আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। রাগে ও দুঃখে তাহার কান খাড়া হইয়া উঠিল। চারিদিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, সে গন্ধের সাহায্যে তাহার শত্রুদের সন্ধান লইবার চেষ্টা করিল। তার পর আস্তে আস্তে হাত ত্রিশেক দূরে, একটা ঝোপের অন্তরালে গিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ম্যাথুয়েন্ সাহেব গাছ হইতে নামিয়া, সঙ্গী দুই জনের সঙ্গে সন্তর্পণে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন।

মহিষটা কান খাড়া করিয়া, ঝোপের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শিকারীরাও ঝোপের পিছনে পিছনে আত্মগোপন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছু পরে, মহিষের মাথাটি ঝোপের উপর জাগিতে দেখিয়া, তাহা লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোড়া হইল। গুলি তাহার গায়ে লাগিল না বটে, কিন্তু মহিষ বিদ্যুৎগতিতে ঠিক উল্টামুখে খানিকটা গিয়া আবার থামিল। তারপর তাহাকে দেখা গেল না। শিকারীদের জানা ছিল যে, রাগিয়া গেলে মহিষ অত্যন্ত চালাক হইয়া উঠে। সে নিশ্চয়ই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সুতরাং তাঁহারা অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটু পরে এক ঝোপের অন্তরালে মহিষের কাঁধ দেখা গেল। কাঁধ লক্ষ্য করিয়া ম্যাথুয়েন্ গুলি ছুড়িলেন, কিন্তু সে পলাইল না। শিকারীরা ভাবিলেন, মহিষ নিশ্চয়ই অত্যন্ত সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে, আর উঠিবে না। এই ভরসা করিয়া তাঁহারা মহিষের একেবারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অবিলম্বে এক ভীষণ ব্যাপার ঘটিল। সাহেব লিখিয়াছেন ঃ—"কাছে আসিতেই আমরা দেখিলাম, এক জোড়া রক্তচক্ষু আমাদের দিকে চাহিয়া আছে! ভয়ে আমাদের শরীর কাঁপিয়া উঠিল। গুলি করিবার পূর্ব্বেই ধূর্ত্ত প্রাণীটা মাটি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল ও আমার সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া শিং বাগাইয়া তাড়া করিল। আমার তখন এমন ভয় হইয়াছিল যে, আমি একটা ঝোপের ভিতর বসিয়া পড়িলাম ও বন্ধুর দুরবস্থা কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সে তখন প্রাণভয়ে ছুটিয়াছে। তাহার ও মহিষের মধ্যে মাত্র একটি ঝোপের ব্যবধান। কিন্তু মহিষটা তখন এমন ক্ষেপিয়াছে যে, কণ্টকিত ঝোপগুলিকেও পায়ে

দলিয়া বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়াছে—চক্ষের নিমেষে বন্ধুকে সে ধরাশায়ী করিবে! বন্ধু উপায়ান্তর না দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, মহিষের কপাল লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। বন্দুকের নল মহিষের কপাল প্রায় স্পর্শ করিয়াছিল। গুলি ঠিক তাহার মাথার খুলির উপর লাগিল। শব্দ, ধোঁয়া ও আঘাতে হতভম্ব হইয়া মহিষ ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং এইবার ফ্রলিকের পিছনে তাড়া করিল। কৌশলী হটেণ্টট্ সেই ভীষণ জন্তুর তাড়া খাইয়া বিদ্যুৎগতিতে ছুটিল ও আঁকিয়া বাঁকিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু আহত অবস্থাতেও সেই বিপুলকায় জানোয়ারের গতি দেখিয়া অবাক্ হইলাম। বুঝিতে পারিলাম ফ্রলিকের আজ নিস্তার নাই, প্রতি মুহূর্ত্তেই মহিষটা তাহার নিকটতর হইতেছে। আমরা নির্ব্বাক্‌ভাবে ফ্রলিকের এই বিপদ্ দেখিতে লাগিলাম! গুলি করিবার উপায় ছিল না, কারণ গুলিতে ফ্রলিকেরই আহত হইবার সম্ভাবনা বেশী। উত্তেজনার বশে আমরা দুই জনেই গোপন স্থান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, এই ভীষণ জন্তুর ভীষণ প্রতিহিংসার ছবি দেখিতে লাগিলাম। আমাদের দুই জনের মুখ হইতেই এক সঙ্গে 'হায়' 'হায়' ধ্বনি উত্থিত হইল! ক্ষিপ্ত মহিষটা ফ্রলিক্‌কে শিংএর আঘাতে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল! আমরা উভয়েই একসঙ্গে অনুভব করিলাম যে, তাহাকে বাঁচাইতে হইলে, এই শুভ মুহূর্ত্তের সুযোগ লইতে হইবে। দুই এক পা পিছু হটিয়া আসিয়া, মহিষ যেমন আবার ফ্রলিক্‌কে শিংএর আঘাত করিতে যাইবে, আমরা দুইজনে এক সঙ্গে গুলি ছুড়িলাম। একসঙ্গে দুই গুলি খাইয়াই জন্তুটা ফ্রলিকের গায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল, আর উঠিল না। ইহার পর আমরা বহু কষ্টে রক্তাক্ত মূর্চ্ছিত ফ্রলিক্‌কে লইয়া তাঁবুতে ফিরিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম।"

উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মহিষ-শিকার-পদ্ধতি বিশেষ আশ্চর্য্যজনক। ইণ্ডিয়ানরা সাধারণতঃ খুব তেজী ঘোড়ায় চড়িয়া মহিষ-শিকারে বাহির হয়। বিপদে পড়িলে, যাহাতে ঘোড়া ছাড়িয়া অনায়াসে দৌড়িয়া পলাইতে পারে, এই জন্য তখন ইহারা প্রায় উলঙ্গ হইয়াই থাকে। ঘোড়ার গায়েও কোন সাজ থাকে না, কেবলমাত্র লাগাম ধরিয়া ইণ্ডিয়ানরা ঘোড়া চালনা করে। ঘোড়াগুলিকে দেখিলে মনে হয়, আরোহী-শিকারীদের মত এই শিকারে তাহারাও বেশ আনন্দ পায়। শিকারীদের হাতে অস্ত্র থাকে—মাত্র একটি চাবুক ও তীর-ধনুক। চাবুকের চামড়া এমন শক্ত ও ধারাল যে মহিষের গায় তাহা ঠিক ছুরির মত বসিয়া যায়। শিকারীরা দল বাঁধিয়া অগ্রসর হয়। মহিষের পাল দেখিলে, প্রথমটা সকলে মিলিয়া তাড়া দিয়া, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা একটা করিয়া মহিষ বাছিয়া

লয়। তার পর ঘোড়া ছুটাইয়া তাহাকে তাড়া করে। পাহাড়, পর্ব্বত, উপত্যকা, প্রান্তর ভেদ করিয়া শিকার ও শিকারী ছুটিতে থাকে এবং শিক্ষিত ঘোড়ার গতি অধিক হওয়াতে, এক সময়ে ঘোড়া ও মহিষ প্রায় পাশাপাশি আসিয়া পড়ে। শিকারী তখন লাগাম ছাড়িয়া দিয়া, ধনুকে বিষাক্ত তীর যোজনা করিয়া, মহিষের গায়ে বিঁধিতে থাকে। তীরে বিদ্ধ হইবার পর সে যদিও অধিকক্ষণ বাঁচে না, তবুও সেই অল্প সময়ই শিকারীর পক্ষে মারাত্মক। সেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মহিষ চরম প্রতিহিংসা লইবার ভীষণ চেষ্টা করে। এই সময় শিকারীর প্রাণ অনেকটা শিক্ষিত ঘোড়ার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। তীর ছুড়িবার সময় ধনুকের ছিলাতে যে টঙ্কার উঠে, তাহা কানে প্রবেশ করিবামাত্র, ঘোড়া মহিষের পাশ কাটাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে এবং অবিলম্বে তাহার অদৃশ্য হইয়া যায়। যদি কোন কারণে ঘোড়ার গতি রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই মুমূর্ষু মহিষের হাতে আর তাহার পরিত্রাণ নাই। শিকারী এই সময়ে সেই গতিশীল ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে ক্রুদ্ধ মহিষ ঘোড়ার উপর পড়িয়া মনের ঝাল মিটায়! অনতিবিলম্বে বিষদিগ্ধ মহিষ ও আহত ঘোড়া একসঙ্গে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়।

শিকারীরা বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত এমন ভাবে চিনিয়া রাখে যে, অনেক সময় কৌশলে কাজ হাসিল করে। মহিষের দলকে তাড়া দিয়া তাহারা এমন এক পাহাড়ের ধারে লইয়া যায়, যাহার উপরে উঠিলে, অপর পার্শ্বে—গভীর খাতের মধ্যে মহিষকে পড়িতেই হইবে। তাড়া খাইয়া মহিষের দল পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে উঠিতে চেষ্টা করে এবং নীচের মহিষদের গুঁতায় উপরের মহিষগুলা একে একে খাতে পড়িয়া প্রাণ হারায়।

উত্তর আমেরিকার শাদা নেক্‌ড়ে মহিষের বিষম শত্রু। ইহারা দল বাঁধিয়া মহিষের দলে পড়ে ও তাহাদিগের একটাকে বাছিয়া লইয়া, সকলে মিলিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে। এই নেক্‌ড়েকে মহিষেরা এমন ভয় করে যে, ইহাদের একটাকে দেখিলেও ভ্যাবাচাকা খাইয়া যায়; আর নড়িতে পারে না। মহিষের এই দুর্ব্বলতা অবগত হইয়া আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণ নেক্‌ড়ের চামড়া গায়ে দিয়া, তীর-ধনুক লইয়া ইহাদিগকে শিকার করিতে যায়। চামড়া পরা মানুষকে নেক্‌ড়ে মনে করিয়া মহিষ এমনই ভয় পায় যে, সে মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বিষাক্ত তীর খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মহিষ সম্বন্ধে যত গল্প আমার জানা আছে, তন্মধ্যে যেটি সব চাইতে ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ, সেটি আমাদের দেশেরই ঘটনা।

আসাম-প্রদেশের ডিব্রুগড়-অঞ্চলে হরিণ-শিকার করিতে এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। যেরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দখিয়াছিলাম, তাহা আমরণ আমার মনে গাঁথা থাকিবে।

সুর্ম্মা-উপত্যকা-প্রদেশ চারিদিকে পর্ব্বত-সমাচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে স্বভাবজাত জলাভূমি। বনের পরে বনের আর শেষ নাই। ইহারই মধ্যে মধ্যে চায়ের বাগান-সমূহ মাইলের পর মাইল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। বাঘ, চিতা ও হরিণ আসামের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। আমরা একবার দল বাঁধিয়া ডিব্রুগড়ের উত্তরে এরূপ ব্যাঘ্র-হরিণ-পূর্ণ একটা জঙ্গলে শিকার করিতে যাইব, স্থির করিয়াছিলাম। ডিব্রুগড়ে গিয়া শুনিলাম, অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে সেখানে একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছে। সহর হইতে একটু দূরে গোচারণের মাঠ। সেখান হইতে ফিরিবার পথে, সহরের কাছাকাছি আসিয়া কোন কারণে একটা মহিষ ক্ষেপিয়া যায়। রক্ষী কিছুতেই তাহাকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া ছাড়িয়া দেয়। ছাড়া পাইয়া সে রাস্তার দুই ধারে যাহাকে পায়, তাহাকে শিংএর গুঁতায় ভূমিসাৎ করিয়া ছুটিতে থাকে। এই সময় দূরবর্ত্তী গ্রামের একদল স্ত্রীলোক সহরে কেনা-বেচা শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে-ছিল। তাহাদের মধ্যে একজনকে মহিষটা শিং দিয়া এমন আঘাত করে যে, তাহার দেহ বিদীর্ণ হইয়া যায় ও সে জন্তুটার শিংএ আট্‌কা পড়ে। এই অবস্থায় করুণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়। মহিষ মাথায় সেই বোঝা লইয়া, ছুটিতে ছুটিতে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, সহরের লোকে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আর তাহার সন্ধান করিতে পারে নাই। সেই মৃত স্ত্রীলোকটির আত্মীয়-স্বজনেরা তাহার মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টায় হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

হতভাগ্য রমণীর এই ভীষণ পরিণাম শুনিয়া, আমাদের মন দমিয়া গেল। সহরের সর্ব্বত্রই শুনিলাম, এই ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইতেছে, অথচ অত বড় একটা বিপুলকায় জানোয়ার যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, কেহ তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিতেছে না।

যাহা হউক, দুই তিন দিন পরে আমরা সদলবলে বন্দুক ও আহার্য্য সঙ্গে লইয়া উত্তরের জঙ্গলে শিকার করিতে গেলাম। এক এক স্থানে জঙ্গলের গভীরতা এত অধিক যে, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যরশ্মিও অতিকষ্টে সেখানে প্রবেশ করে। সর্ব্বত্রই অসংখ্য পক্ষী দেখিয়া পুলকিত হইলাম। কিছু পাখী শিকার করিলাম বটে, কিন্তু প্রথম দিন হরিণ কিংবা কোন হিংস্র পশু নজরে পড়িল না।

সহরের প্রান্তদেশে একটি ডাক-বাঙালা আছে। সেখানে রাত্রি কাটাইয়া,

পরদিন আবার শিকার-সন্ধানে বাহির হইলাম। এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতে ঘুরিতে, এক হ্রদের তীরে পৌঁছিয়া আমরা হরিণের সন্ধান পাইলাম। নিকটেই একদল হরিণ চরিতেছিল ; গুলি ছুড়িতেই দুই একটা আহত হইল বটে কিন্তু তাহারা চক্ষের নিমেষে গভীর অরণ্যে কোথায় যে লুকাইয়া পড়িল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা তিন জন করিয়া একসঙ্গে থাকিয়া, দলে দলে হরিণের সন্ধানে ছুটিতে লাগিলাম।

কাঁটা ঝোপ্ ও বড় বড় গাছের গুঁড়ির ভিতর দিয়া চলিয়া, আমরা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় একটা তীব্র গন্ধ আমাদের নাকে আসিল। কাছা-
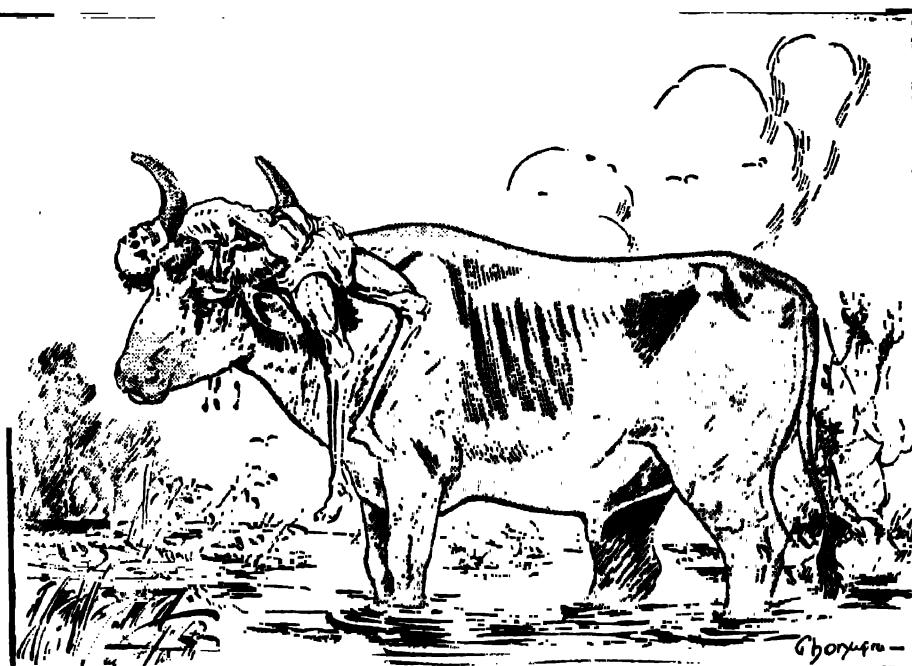
"কঙ্কাল তখনও পর্য্যন্ত তাহার শিংএ আট্‌কাইয়া ঝুলিতেছিল !"—২১৮ পৃষ্ঠা

কাছি নিশ্চয়ই কিছু পচিয়াছে। আমরা তিন জনেই বন্দুক লইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম ; কারণ মনে হইল, বাঘের আড্ডায় পৌঁছিয়াছি এবং বাঘের ভুক্তাবশিষ্ট হইতে এই গন্ধ বাহির হইতেছে। অতি সন্তর্পণে আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, হঠাৎ একটা জলাশয় দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার অগভীর জলের ঠিক মধ্যস্থলে একটা মহিষ দাঁড়াইয়া ধুঁকিতেছে। হঠাৎ এই দৃশ্য দেখিয়া এমন আশ্চর্য্য হইলাম যে, ঠিক কিছু বুঝিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই নজর দিয়া দেখিলাম, মহিষটার শিংএ একটি মানুষের কঙ্কাল আট্‌কাইয়া আছে। মাথার দিক্ তখনও একেবারে

কঙ্কালে পর্য্যবসিত হয় নাই। দুর্গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে, বুঝিতে বিলম্ব হইল না এবং মহিষটাকেও চিনিতে পারিলাম। এইটাই সেই ক্ষিপ্ত মহিষ এবং এই কঙ্কালটি সেই হতভাগ্য রমণীর।

আমাদের পদশব্দে মহিষটা চঞ্চল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু জলাশয় ছাড়িয়া নড়িল না; সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া করুণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কোন রকমে নাসিকা আচ্ছাদন করিয়া, আমরা মহিষের অনেকখানি কাছে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমাদের চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

দেখিলাম, মহিষটা শিংএর কঙ্কালটি ছাড়াইয়া ফেলিবার বহু চেষ্টা করিয়াও ছাড়াইতে পারে নাই। সেই বোঝা মাথায় করিয়া সে বনে বনে ফিরিয়াছে, গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুকিয়াছে, শিং ঘসিয়াছে, কিন্তু মৃতদেহ এমনভাবে আট্‌কাইয়াছিল যে তাহা খুলে নাই। ধীরে ধীরে মৃতদেহ পচিতে আরম্ভ করিয়াছে, দুর্গন্ধে অস্থির হইয়া মহিষটা পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইয়াছে! মৃতদেহ হইতে পচা পুঁজ ও স্রাব প্রতিনিয়ত তাহার মুখে চোখে গড়াইয়া পড়িয়াছে। এই বিষাক্ত গলিত-স্রাব লাগিয়া তাহার চক্ষু দুইটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে এখন কিছুই দেখিতে পাইতে ছিল না। তাহার মাথাতেও ঘা হইয়া পচিতে সুরু করিয়াছিল।

হতভাগ্য মহিষের দুর্দ্দশা দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইল। আমরা তাহায় যন্ত্রণার লাঘব করিবার জন্য, দুইজনে একসঙ্গে গুলি করিয়া সেই শোচনীয় অবস্থা হইতে তাহাকে মুক্তি দিলাম।

একবার ত্রিহুতের জঙ্গলে ঠিক এইরূপ হৃদয়-বিদারক আর একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল। শতাধিক বন-তাড়ুয়া লইয়া কয়েকজন সাহেব ব্যাঘ্র-শিকারে যান। দুপুরবেলা তাঁহারা তাঁবুতে ফিরিয়া আহারাদি করিতেছেন, লোকজন আশপাশের গাছের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় একদল বন্যমহিষ পরস্পর লড়াই করিতে করিতে আগুনের গোলার ন্যায় সেইদিকে ছুটিয়া আসে এবং কয়েকজন বন-তাড়ুয়ার উপর পড়িয়া বিপর্য্যয় কাণ্ড উপস্থিত করে। সাহেবরা বন্দুক লইয়া ছুটিয়া আসিবার পূর্ব্বে, একটা মহিষ এক হতভাগ্যকে শিংএ বিদ্ধ করিয়া তাহাকে লইয়া কোথায় যে উধাও হইল—অনেক চেষ্টাতেও তাহার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং পরদিন সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, কয়েক দিন ক্রমাগত অনুসন্ধান চলিল। অবশেষে অষ্টম দিনে খবর আসিল দশ মাইল দূরে, মহিষটা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় একটা জলার মধ্যে দাঁড়াইয়া ধুঁকিতেছে আর সেই হতভাগ্যের কঙ্কাল তখনও পর্য্যন্ত তাহার শিংএ আট্‌কাইয়া ঝুলিতেছে!

এই খবর পাইয়া সাহেবেরা সেখানে গিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে চোখের জল সংবরণ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইল! তাঁহারা মহিষকে গুলি করিয়া তাহাকে সেই অসহ্য যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিয়া, লোকটির যথাযোগ্য সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন এবং তাহার স্ত্রী-পুত্রকে যথেষ্ট টাকা-কড়ি দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

আফ্রিকার হাতী-শিকার

প্রসিদ্ধ শিকারী থিওডর্ রুজ্‌ভেল্ট্ আফ্রিকা মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছেন। কত বিপদের মুখে যে তিনি পড়িয়াছেন, কত অদ্ভুত জিনিস ও জানোয়ার যে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার লিখিত ভ্রমণ ও শিকার-কাহিনীগুলি পড়িলেই বুঝা যায়। বস্তুতঃ তিনি আফ্রিকা মহাদেশের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর জানেন। মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার জন্য, তিনি বহু বার মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন; প্রাণিতত্ত্ববিদ্যা তাঁহার জন্য অনেকখানি উন্নত হইয়াছে। রুজ্‌ভেল্ট্ সাহেব আফ্রিকার কেনিয়া-প্রদেশে হাতী-শিকারের একটি চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন; তাহারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা-শোভিত কেনিয়া-প্রদেশ প্রকৃতির এক রমণীয় রঙ্গভূমি। পূর্ব্ব-দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন চমৎকার দেশ আর নাই; স্থানে স্থানে গভীর জঙ্গল, চির-প্রবহমান নির্ঝরিণীধারা ও ক্বচিৎ বিপুলায়তন নদী। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, এই প্রদেশকে বেষ্টন করিয়া শ্বেততুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গরাজি রৌদ্রকিরণে সমুজ্জ্বল। বিষুব-রেখার সমীপবর্ত্তী দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র কেনিয়াই তুষারের আবাসভূমি; এখানেই নিরন্তর তুষারপ্রবাহ বর্ত্তমান। আমরা কেনিয়ায় প্রবেশ করিয়া, দুইদিন লোকালয়ের মধ্য দিয়া চলিলাম। চারিদিকেই সবুজ শস্যক্ষেত্র। কিকুয়ু মেয়েরা সেখানে গুণ-গুণ-স্বরে গান করিয়া কাজ করিতেছে। লোকালয় ছাড়িয়া আমরা ক্রমশঃ গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। চারিদিকে সুদীর্ঘ তালগাছ, এখানে সেখানে নিবিড় বেতবন।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে খাড়া পাহাড়ের নীচে এক ঝরণার ধারে তাঁবু গাড়িলাম। সেখানটা সমতল ও বৃক্ষহীন হইলেও, আমাদের আশেপাশে গভীর জঙ্গল ও উচ্চ পর্ব্বতভূমি। জঙ্গলে অদ্ভুত বিপুলায়তন গাছসমূহ লতাপাতায় একেবারে আচ্ছন্ন।

তাহাদেরই শাখার অন্তরালে বানরেরা বসিয়া আমাদের দিকে বিচিত্র মুখভঙ্গী করিতে লাগিল। শুনিলাম, এইস্থানে হাতীরা দলে দলে বাস করে। পথে আমরা ইহাদের চিহ্ন পাইয়াছিলাম; মাঝে মাঝে ইহারা লোকালয়ে পড়িয়া শস্যক্ষেত্র উজাড় করিয়া দিয়াছে। এই পার্ব্বত্যভূমিখণ্ডে বাঁশঝাড়ের মধ্যে বহুকাল যাবৎ ইহারা বাস করিতেছে। শীতের সময় ইহারা পর্ব্বতের উপর আশ্রয় লয়; কিন্তু একটু গরম পড়িলেই নীচের জঙ্গলে আসিতে বাধ্য হয়।

আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন বেশ গরম পড়িয়াছে; হাতীর দলও নীচে নামিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে লোকালয়ে পদার্পণ করিতে ছাড়িতেছে না। দেখিয়া শুনিয়া হাতী-শিকার করিবার ইচ্ছা হইল ও অনুচরবর্গকে আমার ইচ্ছার কথা জানাইলাম।

দেখিলাম, এখানে লোকে হাতীকে লইয়া যত আলোচনা করে, সিংহকে লইয়া তত আলোচনা করে না। হাতীকে লইয়া আলোচনা করিবার কথা বটে! ইহারা যে ভাবে দল বাঁধিয়া আসিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়া যায়, এক আধটা সিংহ তাহার তুলনায় মানুষের কিছুই ক্ষতি করে না।

পরদিন ভোর না হইতেই বৃষ্টি সুরু হইল। আমার দুইজন শ্বেতকায় অনুচর ছিল। একজনের নাম কানিংহাম, অন্য জনের নাম হেলার। আমি তাহাদিগকে বিশেষভাবে হাতীর খোঁজ লইতে অনুরোধ করিলাম। কানিংহাম হাতী-শিকারে একজন দক্ষ লোক; এমন কি, আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের চাইতেও তাহার যোগ্যতা বেশী ছিল। পরদিন বৈকালেই তাহারা হাতীর গতিবিধির খবর আনিয়া দিল।

রাত্রিটা কোন রকমে কাটিয়া গেল। সকাল হইতেই বেশ বৃষ্টি সুরু হইল; আমি, কানিংহাম ও হেলার সেই বৃষ্টির মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলাম। পদব্রজে একে অন্যের পিছনে—এই ভাবে যাইতে হইল। বন এমন ঘন যে, ঘোড়া চালাইয়া তাহার ভিতর পথ করা অসম্ভব। কিছু কাপড়-চোপড়, একখানা কম্বল ও তিন দিনের উপযুক্ত খাবার সঙ্গে লইয়া চলিলাম। সকলের প্রথমে ঐ দেশীয় একদল হাতী-শিকারী বর্শা কাঁধে ও খাবারের পোঁট্‌লা পিঠে করিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের পিছনে কানিংহাম বন্দুক কাঁধে। তাহার পিছনে আমি খাকিসাজে। দুইজন অনুচর আমার বন্দুক লইয়া চলিল। হেলার সকলের পিছনে, তার সঙ্গে জন দশ-বার দেশী কুলী।

তিন ঘণ্টা ধরিয়া আমরা বনের ধারে ধারে চলিলাম। মধ্যে মধ্যে গভীর খাত, প্রবল স্রোতস্বিনী ও ক্ষুদ্র বৃহৎ জলপ্রপাত পার হইয়া যাইতে হইল। তার পর আমরা অরণ্যের নিবিড়তম প্রদেশে প্রবেশ করিলাম; সঙ্গে সঙ্গে যেন দিনের আলোক নিবিয়া গেল! চারিদিকে অন্ধকার। ঘন পত্রাবরণে সূর্য্যরশ্মি বাধা পাইয়া

ফিরিতেছে; বনের ভিতরে আলো ক্বচিৎ প্রবেশপথ পাইতেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট বেতবন, বুনো আঙ্গুরগাছ ও নানা রকমের ঝোপ্‌ঝাড়ে পথ চলিবার উপায় নাই। কেবল বৎসরের পর বৎসর হস্তী মহাপ্রভুরা এদিক সেদিক বিচরণ করাতে, স্থানে স্থানে পথের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই মানুষ সেই সব পথে গমন করিতে পারে। হাতী-শিকার করার এইটাই সব চাইতে মস্ত অসুবিধা যে, বনের অন্ধকারে নিঃশব্দে পথ চলিতে পারা যায় না, অথচ একটু শব্দ হইলেই হাতীরা সাবধান হইয়া পড়ে। তাহাদের দৃষ্টিশক্তি অতি সামান্য হইলেও, শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত

এবার আমার গুলি ঠিক কপালের মাঝখানে লাগিল।

প্রবল। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে অন্যান্য আওয়াজ অনেকটা চাপা পড়ে বটে, কিন্তু সাম্‌নের লোক পিছনের লোককে পথ বলিয়া না দিলে, দল ছাড়াছাড়ি হয়, সুতরাং হাঁক ডাক করিতেই হয়।

আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা যথাসম্ভব সাবধানতার সহিত এই দুর্গমপথে চলিতে

লাগিলাম। সমস্ত বন নিস্তব্ধ, পশুপক্ষীর চিহ্নমাত্র নাই। কচিৎ-কদাচিৎ দুই একদল বানরের কিচির-মিচির শুনা যাইতেছিল; বনফুলের তীব্র গন্ধ পাইতেছিলাম; কিন্তু কিছুই দেখিবার উপায় নাই। কাঁটায় দেহ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল; প্রতি পদে বড় বড় গাছের গুঁড়িতে বাধা পাইতেছিলাম।

হঠাৎ হাতীর খোঁজ পাওয়া গেল; হাতীর গায়ের বিশেষ গন্ধটি নাকে আসিল। একটু দূরে অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড তিনটি জানোয়ারের আবছা-মূর্ত্তি নজরে পড়িল। তাহারা দ্রুতবেগে সম্মুখে চলিতেছিল। আমরা মাঝে মাঝে থামিয়া আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই ভাবে অনুসরণ করিয়া হস্তিযূথের নাগাল পাইলাম না। তাহারা নির্ব্বিবাদে পাহাড়ের উপর উঠিতে সুরু করিল; জলাভূমির উপর দিয়া যাইবার সময় তিন চারি ফুট গর্ত্ত করিয়া গেল। ইহাতে আমাদের পথ অধিকতর দুর্গম হইল।

বনের অন্ধকারের উপর রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হইল। আমরা একস্থানে ছোট্ট তাঁবু খাটাইয়া রাক্ষসের মত ভোজন করিলাম। দিবসের অতিরিক্ত পরিশ্রম-বশতঃ সমস্ত রাত্রি অকাতরে নিদ্রা দিলাম। খুব ভোরে উঠিয়া সুস্থচিত্তে আবার বনের অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলাম।

দুই ঘণ্টা চলিয়া আমরা আবার হাতীর সন্ধান পাইলাম। এ বারের দলটি একটু ভারি বলিয়া মনে হইল। গোটা পনর হস্তিনী ও দুটি পুরুষ হাতী এই দলে ছিল। কানিংহাম দেশী শিকারীদের সঙ্গে বার বার নানা পরামর্শ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ বিশেষ সতর্ক হইয়া হাতীর পদচিহ্ন ধরিয়া চলিলাম, কিন্তু বনের নিবিড়তার জন্য আমরা অতি ধীরে ধীরে যাইতেছিলাম; গোলমালও কম হয় নাই। দেশী শিকারীরা সহসা দ্রুতগতিতে সম্মুখে চলিয়া গেল—এক জনের গায়ে শাদা কম্বল ও আর একজনের গায়ে একটা লাল কম্বল দেওয়া হইল, যাহাতে অন্ধকারের ভিতরও তাহাদিগকে লক্ষ্য করা যায়। তাহারা অতি সন্তর্পণে, বৃক্ষশাখায় উঠিয়া কিংবা ঝোপের অন্তরালে থাকিয়া, হাতীদের অবস্থান সম্বন্ধে সাঙ্কেতিক শব্দ করিতে লাগিল। আমরা তাহাদের নির্দ্দেশানুযায়ী চলিলাম। প্রায় মধ্যাহ্নকালে আমরা হস্তিযূথের কাছাকাছি আসিয়া পড়িলাম এবং কানিংহামের নেতৃত্বে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিলাম। হাতীগুলি ধীরে ধীরে চলাফেরা করিতেছিল। তাহাদের পায়ের চাপে অথবা শুঁড়ের আঘাতে গাছের পাতার মর্‌মর্‌ শব্দ স্পষ্ট শুনিতেছিলাম, তাহাদের আনন্দব্যঞ্জক ধ্বনিও কানে আসিতেছিল। আমার দু'নালা বন্দুকটা সজোরে ধরিয়া, হাতীর পায়ের দাগের উপর পা ফেলিয়া চলিলাম। কারণ সেখানে ডালপালা যাহা

ছিল, তাহাদের পায়ের চাপেই তাহা মাটিতে বসিয়া গিয়াছে। আমার পদক্ষেপে শব্দ হইবার মত কিছু ছিল না। এই ভাবে আধঘণ্টা চলিয়া হাঁপাইয়া পড়িলাম। শরীর ও মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের প্রত্যেকেই প্রস্তুত হইয়াছিল।

সহসা সেই বিশালকায় জানোয়ারদল চক্ষে পড়িল। তাহারা অন্ততঃ ত্রিশ-গজ দূরে ছিল। একটু অগ্রসর হইতেই, একটা হাতীর বিস্তৃত কপাল চোখে পড়িল; একটা গাছের গুঁড়িতে শুঁড় জড়াইয়া সে বিশ্রাম করিতেছিল। বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিলাম, পুরুষ হাতীই বটে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটা দাঁত সেই অল্প আলোকেই চক্ চক্ করিয়া উঠিল। অনেকখানি দাঁত পাওয়ার লোভে লোভে আমি আর একটু অগ্রসর হইলাম। শুঁড় দুলাইয়া খেলা করিতে করিতে, সে আমাদের দিকে চোখ ফিরাইল। আমি চোখের কাছাকাছি লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম। মনে হইল, গুলি কপাল ভেদ করিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। গুলি খাইয়া প্রথমটা সেই বিপুলকায় জন্তু কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিল এবং তার পর ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইল। আমি আবার গুলি ছুড়িলাম; এবার ঠিক কপালের মাঝখানে। বন্দুক নামাইবার পূর্ব্বেই দেখি, বনের রাজা গোঁ গোঁ করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম, ভিন্ন দিক্ হইতে বিপদ্ আসিয়াছে—মৃত্যু অনিবার্য্য মনে হইল। আমার বাঁ-দিকের একটি ঝোপ্ ভেদ করিয়া অন্য একটা বিপুলকায় হস্তী আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। বন্দুকে গুলি ভরিবার সময় পর্য্যন্তও ছিল না। রাগে হাতীটা ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছিল। তাহার সম্মুখের মোটা মোটা লতাগুলি পট্ পট্ করিয়া সূতার মত ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল; মড়্ মড়্ করিয়া দুই একটা গাছ উপ্‌ড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। সে এত কাছে আসিয়া পড়িল যে, শুঁড় দিয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিত! আমি ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া একটি লাফ দিয়া সরিয়া গেলাম এবং বড় বড় গাছের গুঁড়ির পিছনে লুকাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিলাম। এই ছুটাছুটির মধ্যেও আমি বন্দুকের ব্যবহৃত টোটা ফেলিয়া দিয়া, নূতন দুইটি টোটা পুরিলাম। সহসা বন্দুকের শব্দে চমকিয়া দেখি, কানিংহাম আমার সাহায্যার্থ আসিয়াছে। সে বাঁ-দিক্ হইতে হাতীর কানের কাছে দুইটি গুলি করিল। তার পর সে কি ভয়ানক গর্জ্জন! সমস্ত বনভূমি তোল্‌পাড়্ করিয়া গজরাজ দাপাদাপি করিতে লাগিলেন; আমিও গুলি ছুড়িলাম। এবারে আহত হইয়া হাতীটা মুখ ফিরাইয়া, রক্তাক্ত কলেবরে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। আমরা পাছু লইলাম। কিছুদূর পর্য্যন্ত রক্তের দাগ দেখিতে পাইলাম বটে, কিন্তু তার পর সেই ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষলতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

আমাদের চরেরা কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, আহত অবস্থাতেই হাতীটা বিদ্যুৎবেগে পাহাড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে—সম্ভবতঃ সেখানে গিয়া দেহত্যাগ করিবে। তাহার দাঁত দুইটি সংগ্রহ করিবার আশা ত্যাগ করিয়া, আমি সেই ভূপতিত হাতীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার দাঁত দুইটি করাত দিয়া কাটা হইল। সেই দুইটির ওজন প্রায় ১মণ ৩০সের। মৃত হাতীটাকে ঘিরিয়া ঐ দেশী লোকেরা বেজায় হৈ চৈ সুরু করিয়া দিল। ছাল ছাড়ান হইলে, প্রত্যেকে যতটা পারিল, মাংস কাটিয়া লইয়া গেল।

গুণ্ডা হাতী

স্যাণ্ডারসন্ সাহেব এক সময়ে ঢাকার পিলখানার সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট্ ছিলেন। এই পিলখানায় সরকারী হাতী থাকে; বুনো হাতী ধরিয়া এখানে আনিয়া তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। সাহেব অনেক লোকজন লইয়া একবার হাতী ধরার ব্যবস্থা করিতে গারো পাহাড়ে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'দরকারী সব সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতেছি, এমন সময় হঠাৎ সমস্ত বন তোলপাড় করিয়া ভীষণ এক চীৎকার শোনা গেল, আর আমাদের প্রায় দু'শ গজ বাঁয়ে, মড়্ মড়্ করিয়া বাঁশবন ভাঙার শব্দ হইতে লাগিল! শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম, দুই গুণ্ডা দাঁতালে লড়াই বাধিয়াছে। সেইদিকে তিন জনেই ছুটিলাম। খানিক গিয়াই দেখি একটা নালা, তাহার ওপারেই যুদ্ধক্ষেত্র। নালার পাড় ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিলাম—কোনখান দিয়া পার হওয়া যায় কি না দেখিতে। এমন সময় একটা হাতী যাতনায় ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল, আর প্রায় গজ চল্লিশেক দূরে নালাটা পার হইয়া আমাদের পারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে ছিল একটা বাঁশের

ঝোপ্। হাতীটা এপারে আসিয়াই, রাগে আর যন্ত্রণায় সেই ঝোপ্‌টাকে মড়্‌মড়্ করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। খানিক পরে চাহিয়া দেখি, তাহার বাঁ-পাশে একটু উঁচুতে ভীষণ একটা দাঁতের ফুটো, তাহা হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে।

এত বড় জোয়ান হাতীটাকে যেটায় গুঁতাইয়া কাবু করিয়াছে, সে না জানি আরও কত বড় আর কত বেশী জোয়ান ছিল! দুইটা হাতী প্রায় সমান বলবান্ হইলে তাহাদের লড়াই প্রায়ই দুই তিন দিন ধরিয়া চলে। তার মধ্যে খানিকক্ষণ লড়াই, তার পর একটু দম লওয়া, আবার লড়াই আবার দম লওয়া—এই ভাবে লড়াই চলিতে থাকে; দুইটার মধ্যে যদি একটা কম বলবান্ হয়, তবে সেটা একবার হারিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে! দাঁতাল গুণ্ডা হাতীর লড়াইয়ে দেখা যায়, অনেক সময় একটায় অন্যটার লেজের ডগা কাম্‌ড়াইয়া কাটিয়া দেয়।

বুঝিতে পারিলাম, এই আহত দাঁতালটা যদিও পলাইয়া আসিয়াছে, তবু একটু দম লইয়াই আবার লড়াই করিতে যাইবে। এমন ভয়ানক রাগ আমি কখনও দেখি নাই। দেখিতে দেখিতে বাঁশ-ঝোপ্‌টাকে ভাঙ্গিয়া মুচ্‌ড়াইয়া পাট করিয়া ফেলিল! তার পর হঠাৎ দেখি, তাহার মেজাজ যেন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে—ঝোপ্‌টা ছাড়িয়া আসিয়া ঠিক পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। চারিদিক্ একেবারে নিস্তব্ধ; তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী যেখানেই থাকুক, তাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই। ক্রমে দেখি, হাতীটা তাহার শুঁড়ের ডগাটি ঘুরাইয়া আমাদের দিকে বাড়াইয়া দিয়াছে। তখন বুঝিতে পারিলাম, বাতাসের উল্টা দিকে আমরা থাকিলেও, আমাদের গন্ধ যে তাহার নাকে গিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম একটা পাত্‌লা বাঁশ-ঝোপের পিছনে। যখন বুঝিতে পারিলাম, হাতীটা আমাদের গন্ধ পাইয়াছে, তখন মনে করিলাম যে, হয় ত বা এখন ভয়ে পলাইবে। কিন্তু সেটা তখন রাগে পাগল, ডর ভয় তাহার আর নাই। চাহিয়া দেখি, তাহার লেজ আর দুই কান খাড়া হইয়া উঠিল আর চক্ষের নিমেষে বিদ্যুৎদ্বেগে সে আমাদের দিকে তাড়া করিয়া আসিতে লাগিল! যে বাঁশ-ঝোপের পিছনে আমরা ছিলাম, সেটা আশ্রয় হিসাবে কিছুই নয় আর তাহার ভিতর দিয়া গুলি করিলেও, হয় ত হাতীর গায়ে লাগিবে না। তাই হাতীটা তাড়া করিতেই আমি ঝোপের পিছন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিলাম—যদি বা তাহা শুনিয়া সে থম্‌কাইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আমার চীৎকারে কোন কাজ হইল না।

তখন হাতীটার কুণ্ডলী-পাকান শুঁড়ের একটু উপরে—কপালের খানিক নীচে, দড়াম্ করিয়া এক গুলি বসাইয়া দিলাম; গুলি লাগিল ঠিকই, তাহাতে কোন

ভুল নাই, কিন্তু আমার উচিত ছিল, দুইটা নলই সকসঙ্গে ছাড়িয়া দেওয়া। তখন ভুলের দরুণ ফল হইল গুরুতর! ধোঁয়ায় হাতীটা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল; তখন নীচু হইয়া দেখিতে গেলাম গুলি খাইয়া সে কি করিতেছে। সর্ব্বনাশ! হাতী থমকিয়া দাঁড়ান দূরে থাকুক, একেবারে প্রায় আমার উপরেই আসিয়া পড়িয়াছে! তখন ডাইনে কিংবা বাঁয়ে কোন পাশে সরিয়া যাইবারও সময় ছিল না; ধোঁয়ার ভিতর দিয়া বড় বড় দুই দাঁত আসিয়া একেবারে আমার প্রায় উপরে! দাঁড়াইয়া থাকিলে ছিট্‌কাইয়া হাতীর ঠিক সম্মুখেই পড়িব। এই ভয়ে চক্ষের নিমেষে উপুড় হইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িলাম। পড়িলাম, হাতীর শুঁড়ের একটু ডাইনে। পর মুহূর্ত্তেই প্রকাণ্ড একটা পা আমার বাঁ উরুর কয়েক ইঞ্চি দূরে দুম্ করিয়া আসিয়া পড়িল। পা-টা পড়িবার সময় সৌভাগ্যক্রমে আমার উরুটা চট্ করিয়া একটু সরাইয়া লইতে পারিয়াছিলাম। হাতী চীৎকার করিতে করিতে বেগে চলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার শুঁড় আর কুণ্ডলী-পাকানো নয়, মাথাটাও একটু নীচ করা। বুঝিতে পারিলাম, হাতীটার আক্রমণের চাইতে পলায়নের ইচ্ছাই তখন বেশী। সে যদি তখন থামিত, তবে আমার আর উপায় ছিল না। কিন্তু আমার সেই সাংঘাতিক গুলি খাইয়া আক্রমণের প্রবৃত্তিটা তখন তাহার চলিয়া গিয়াছিল। একটা বাঁশের ধাক্কা খাইয়া, জাফর বেচারিও চিৎপাত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তাহারও ভাগ্য ভাল যে, হাতী তখন পলাইতেই ব্যস্ত—তাই সে-ও রক্ষা পাইল। এই ব্যাপারের সুরুতেই মাহুত সেই নালার মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া, তাহারও কোন মুস্কিল হইল না। বিপদ্ কাটিয়া গেলে চাহিয়া দেখি, আমার সমস্ত শরীর রক্তে মাখামাখি! হাতীটার সেই ক্ষত হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল; আমার উপর দিয়া যাইবার সময়, সেই রক্তে আমার মাথার চুলগুলি পর্য্যন্ত চট্‌চটে হইয়া গিয়াছিল।

হাতীটা চলিয়া গেলে, জাফর ও আমি উঠিয়া আবার তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। তখন আর সে তাড়াতাড়ি যাইতে পারিতেছিল না; আন্দাজ দুই-শত গজ গিয়া তাহাকে আবার দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তখন সে এমন ঘন বনের ভিতর ছিল যে, তাহার আরো কাছে যাওয়া নিতান্ত বোকামির কাজ হইত। সিকি মাইল আন্দাজ গিয়াই হাতীটা দলের সঙ্গে মিশিয়া পড়িল। আর অগ্রসর হইলে হয় ত দলের অন্য হাতীর পাল্লায় পড়িয়া যাইব, এই ভয়ে আমরা সেখানেই ক্ষান্ত দিয়া ফিরিয়া চলিয়া আসিলাম।'

———

গণ্ডার-শিকার

গণ্ডার মাত্রেই যে খুব ভয়ঙ্কর জন্তু, তাহা মনে করা ভুল। জাতি হিসাবে ইহাদিগকে বরং 'নিরীহ' বলা যাইতে পারে। তবে কোন কোনটার মেজাজ সহজেই বিগ্‌ড়াইতে দেখা যায়। ক্ষেপিয়া উঠিলে, ইহারা পৃথিবীর কোনও জানোয়ারকেই বিন্দুমাত্র ভয় করে না। যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই আক্রমণ করে।

কাপ্তেন্ উইলিয়াম্‌সন্ ভারতবর্ষের মর্ম্মর নামক স্থানে এরূপ একটি গণ্ডার দেখিয়াছিলেন। সে সাধারণ রাজপথের ধারে এক জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল ও রাস্তায় পাথিক দেখিলেই তাহাকে আক্রমণ করিত। একদিন দুইজন পাঠান ঘোড়ায় চড়িয়া সেই জঙ্গলে শিকার করিতে যায়। তাহারা ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া, জঙ্গলের ভিতর কিছুদূর প্রবেশ করিয়াছে, এমন সময়, এক ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়াই দেখিল, গণ্ডারটা ঘোড়া দুইটিকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে। যে দুইজন রক্ষক ঘোড়ার সঙ্গে ছিল, তাহারা পাশের একটি গাছে উঠিয়া, কোনও রকমে আত্মরক্ষা করিতেছে। পল্টন দুইজন একটু নিরাপদ স্থানে গিয়া গুলি ছুড়িবার পূর্ব্বেই, সে সবলে সেই গাছের গোড়ায় ঢুঁ মারিতে মারিতে গাছটিকে উপ্‌ড়াইয়া ফেলিল। শিকারী দুইজনের গুলিতে প্রাণ হারাইবার পূর্ব্বে, অশ্বরক্ষকদের একজনকে সে হত্যা করিয়াছিল।

গণ্ডারের এই রাগের অবস্থায় সিংহ, ব্যাঘ্র, এমন কি বৃহদ্দন্ত হস্তীরাও সভয়ে পলায়ন করে। কিন্তু মাঝে মাঝে অকারণ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া, গজরাজও ফিরিয়া আক্রমণ করে। তখন দুইটাতে বিপুল সংগ্রাম বাধিয়া যায়। এই সব যুদ্ধে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দ্রুতগামী বলিয়া গণ্ডারেরই জিত হয়। একজন শিকারী একবার এইরূপ একটা যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গণ্ডারটা হাতীর পেট চিরিয়া ফেলে। হাতী ভূতলশায়ী হয়। কিন্তু গণ্ডারের মূর্খতা হেতু সে হাতীর নীচে পড়িয়া তাহার চাপেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গণ্ডার সাধারণতঃ মানুষ দেখিলেই ভয় পায় ও পলাইয়া যায়, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও দেখা গিয়াছে। মিঃ অস্ওয়েল্ নামে একজন প্রসিদ্ধ শিকারী একবার গণ্ডারের হাতে পড়িয়া, কি ভাবে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। তাঁবু হইতে বাহির হইয়া, পদব্রজে চলিতে চলিতে একদিন তিনি অদূরে দুইটা বিপুলকায় গণ্ডার দেখিলেন। তিনি ভাবিলেন, হয় ত তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা

গণ্ডার শিকারীকে জখম করিয়া সোজা দৌড়াইয়া যাইতেছে।

পলাইয়া যাইবে; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলেন, তাঁহার ধারণা ভুল। তাহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই আসিতেছে। তিনি লিখিয়াছেন :—"গণ্ডার দুইটাকে আমার দিকে আসিতে দেখিয়াই, আমি সাবধান হইয়া তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম কিন্তু তাহারা খুব নিকটে আসিলেও, মাথা ঠিক সম্মুখে থাকাতে তাহাদিগকে

গুলি করিবার সুবিধা হইল না। মাথায় গুলি লাগিলে এই জন্তুর বিশেষ কিছুই হয় না। তাহারা খুব কাছে আসিয়া পড়িল। আশে পাশে কোথাও লুকাইবার যায়গা ছিল না, পলাইবারও উপায় ছিল না; আমি মহা ফাঁপরে পড়িলাম ও জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম। একটু পাশে ঘুরিয়া হয় ত আমি একটাকে শেষ করিতে পারিতাম, কিন্তু অন্যটার হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় ছিল না। এই শঙ্কটা-পন্ন অবস্থায় আমার মনে পড়িয়া গেল যে, গণ্ডারের দৃষ্টিশক্তি খুব কম। সম্ভবতঃ পাশ দিয়া দৌড়াইয়া গেলেও, উহারা আমাকে দেখিতে পাইবে না। তখন আর ভাবিবার সময় ছিল না। সম্মুখের জন্তুটা প্রায় আমাকে স্পর্শ করিল; আমি বিদ্যুৎগতিতে দৌড়াইয়া তাহাদের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেলাম। কিন্তু গণ্ডারের দৌড়ের ক্ষমতা অসাধারণ; কিছুদূর যাইতে না যাইতেই দেখিলাম, তাহারা আমার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে; আমি উন্মত্তের মত গুলি ছুড়িতে লাগিলাম এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যে গণ্ডারের খড়্গাঘাতে ভূপতিত হইলাম।

প্রথম আঘাতেই আমি প্রায় সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম; সংজ্ঞা পাইবামাত্র দেখিলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। বুঝিতে পারিলাম- আমাকে এক ঢুঁ দিয়া গণ্ডারেরা আর থামে নাই; সোজা দৌড়াইয়া পলাইয়াছে।"

মিঃ এণ্ডার্সন্ পৃথিবীর একজন খুব নামজাদা গণ্ডার-শিকারী ছিলেন। তিনি গণ্ডারের কাঁধ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতেন; কিন্তু একবার এক গণ্ডারী শিকারে তিনি প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। গণ্ডারীর খুব কাছে গিয়া গুলি ছুড়িতেই, সে মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবলবেগে ছুটিয়া আসিল। তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া চিৎপাৎ হইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িলেন ও জড়ের মত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। গণ্ডারী তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল না; নতুবা তিনি সেই খানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। জন্তুটা তাঁহার এত কাছে ছিল যে, তাহার নিশ্বাস গায়ে লাগিতেছিল, তাহার লালা তাঁহার মুখে পড়িতেছিল! এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিবার পর, গণ্ডারীটা দৌড়াইয়া জঙ্গলে চলিয়া যায়; এণ্ডার্সন্ সাহেবও প্রাণে বাঁচেন।

জলহস্তী-শিকার

আফ্রিকার ক্ষুদ্রকায় বেয়াঙ্গীজাতি যে ভাবে বৃহৎকায় জলহস্তী শিকার করে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই অসভ্যজাতি শিকারে অদ্বিতীয়। জলহস্তী ইহাদের খাদ্য, সুতরাং এই জন্তু শিকারে ইহারা শিকারের আনন্দ ও আহার উভয়ই প্রাপ্ত হয়।

জলহস্তী কিন্তু সহজে দমিবার পাত্র নয়। যখন ডাঙ্গায় থাকে, তখন অস্ত্র লইয়া তাড়া করিলে ইহাকে একটু বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় বটে কিন্তু একবার জলে পড়িতে পারিলে আর ইহাকে পায় কে? ছোট ছোট ডিঙ্গী লইয়া তাড়া করিলে, ইহারা অনেক সময় মানুষশুদ্ধ ডিঙ্গী উল্টাইয়া দেয় এবং তীক্ষ্ণদন্ত দিয়া শিকারীকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলে।

ইহার জন্য বেয়াঙ্গীদিগকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়। সাধারণ অস্ত্র দিয়া সুবিধা করিতে না পারিয়া, তাহারা জলহস্তী-শিকারের জন্য বিশেষ এক প্রকার অস্ত্র তৈয়ার করে। এই অস্ত্র এক সঙ্গে বর্শা ও বঁড়শীর কাজ করে। ফলাগুলি জলহস্তীর পিঠে একবার ঢ়ুকলে, তাহা বাহির করিবার আর উপায় নাই; একেবারে চামড়া কাটিয়া বাহির করিতে হয়। এই বর্শার হাতলের শেষে খুব শক্ত ও লম্বা দড়ি বাঁধা থাকে। এই ভাবে অস্ত্র তৈয়ারী হয়। সাধারণ ডিঙ্গী সহজেই জলমগ্ন হয় বলিয়া, বেয়াঙ্গীরা তাল গাছের কতকগুলি গুঁড়ি লম্বা লম্বা সাজাইয়া, ভেলার মত তৈয়ার করে। তাহার ঠিক মাঝখানে একটি খুঁটি পোতা হয়; খুঁটিতে আর একটি দড়ি বাঁধা থাকে। প্রয়োজন হইলে, যে কোন একজন সাঁত্‌রাইয়া দড়ি টানিয়া ভেলাটি ডাঙায় আনিয়া ফেলে। স্রোতের মুখে এই ভেলা নিঃশব্দে ছুটিতে থাকে এবং শিকারী অতর্কিতে জলহস্তীকে আক্রমণ করিয়া কাবু করে।

শিকারীরা সর্ব্বাগ্রে চর পাঠাইয়া জলহস্তীর অবস্থান জানিয়া লয়। তার পর স্রোতের জল যেখানে কতকটা স্থির, এমন কোন জায়গায় ভেলাটি লইয়া গিয়া, ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। প্রথমদিক্‌টা তারা খুব হৈ চৈ হল্লা করে কিন্তু ক্রমশঃ জলহস্তীর যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, তাহাদের আনন্দ-কোলাহলও ততই থামিয়া যায়; তাহারা ফিস্ ফিস্ করিয়া কিংবা ইসারায় কথাবার্ত্তা চালায়। একদল বর্শা হাতে প্রস্তুত হইতে থাকে, আর একদল ভেলা যাহাতে ঠিক চলে, তাহার ব্যবস্থা করে।

ধীরে ধীরে দূরে কোনও বিপুলকায় জন্তুর সশব্দ জলক্রীড়ার আভাস পাওয়া

যায়। শিকারীরা সকলে ভেলার উপরে চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া, শিকারের অপেক্ষা করে। ক্রমে একসঙ্গে কতকগুলা কৃষ্ণকায় জলহস্তী নজরে পড়িয়া যায়। তাহারা সানন্দে জলে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করিতেছে, নাক দিয়া জল ছিটাইতেছে: কেহ কদাকার নাসিকা সমেত মুখটি জলের উপর রাখিয়া চুপ করিয়া ঝিমাইতেছে। ভেলা যথেষ্ট নিকটে আসিলে, হাতলের দড়ি ধরিয়া শিকারী একটা জানোয়ারকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করে। ব্যস্, আর লুকোচুরির প্রয়োজন নাই। তখন গগনভেদী চীৎকার করিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু তখনই জলহস্তী-শিকার শেষ হইয়া যায় না; আরও অনেক হাঙ্গামা কাটাইয়া উঠিতে হয়। বর্শার আঘাত পাওয়ামাত্র ভীষণকায় জানোয়ারটা গভীর আর্তনাদ করিয়া উঠে। সেই চীৎকার শুনিয়া তাহার সঙ্গীরা যে যেদিকে পারে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। নিঃসঙ্গ অবস্থায় আহতজন্তুটা ডুব মারিয়া একেবারে তলাইয়া যায় কিছুক্ষণ তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র রক্তে জল লাল হইয়া ওঠে। শিকারীরা বর্শা-বাঁধা দড়ি শক্ত করিয়া ধরিয়া আবার অন্য বর্শা লইয়া প্রস্তুত থাকে। জলের ভিতর জলহস্তী বঁড়্শী-বেঁধা অবস্থায় ছট্-ফট্ করিতে থাকে। সে যতই ছট্-ফট্ করে বঁড়শী ততই দৃঢ়ভাবে তাহার গায়ে গিঁথিয়া যায়। ইতিমধ্যে একজন কি দুইজন শিকারী সাঁতার কাটিয়া ডাঙায় ওঠে ও দড়ির সাহায্যে ভেলাখানি টানিতে থাকে। টানিতে টানিতে দড়ি কোন একটা গাছের গুঁড়িতে বাঁধিয়া ফেলে। যতক্ষণ দম না ফুরায়, জলহস্তী ততক্ষণ জলে ডুব মারিয়া থাকে। তার পর, হুস্ করিয়া ভাসিয়া উঠে। অমনি আরও দুই তিনটা বর্শা তাহার পিঠে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার পর এই বিশাল জন্তুটার পরিত্রাণের আর উপায় থাকে না। মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে ক্ষণে ক্ষণে ডুব দিতে আর ভাসিতে থাকে। শেষে জলের তলায় প্রাণত্যাগ করে। শিকারীরা তখন দড়ি টানিয়া তাহাকে তীরে উঠায়। কখন কখন বর্শার দড়িতে একটা হাল্কা কাঠ বাঁধিয়া দেওয়া হয়; ছিপের ফাত্‌নার মত সেই কাঠ আহত জলহস্তীর সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়। যন্ত্রণায় ও রক্তস্রাবে জন্তুটা কাবু হইয়া পড়িলে, শিকারীরা কাঠখানা ধরিয়া তাহাকে ডাঙ্গায় তুলিয়া আনে।

বেয়াঙ্গীরা অনেক সময় স্থলেও জলহস্তী শিকার করিয়া থাকে। তাহারা জানে, জলহস্তী সন্ধ্যার সময় হাওয়া খাইতে বাহির হয়। সাধারণতঃ, জলা ও কর্দ্দমাক্ত পথে যাইতে সে ভালবাসে। এরূপ কোন পথের ধারে, একটা গাছের ডালে শিকারীরা বেশ ভারি একটা বর্শা লইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। জলহস্তী হেলিতে দুলিতে যেই ঠিক গাছের নীচে আসে, অমনি উপর হইতে সশব্দে বর্শা নিক্ষিপ্ত হয়। বর্শার

ফলা একেবারে আমূল জলহস্তীর পিঠে বিঁধিয়া যায়। এই অবস্থায় সে বর্শা পিঠে লইয়াই প্রাণ ভয়ে মাইল দুই তিন দৌড়াইয়া যায়। সে রাত্রে শিকারীরা আর তাহার সন্ধান করে না; পরদিন সকালে মৃতদেহের সন্ধানে বাহির হয়। সাধারণতঃ তাহাকে জলে ভাসমান অবস্থায় পওয়া যায়।

ডাঙায় জলহস্তী-শিকারের আর একটা কৌশল এইঃ—শিকারীরা বর্শার ফলকের কাছে ভারী পাথর বাঁধিয়া, হাতলের দড়ি গাছের ডালের উপর দিয়া লইয়া গিয়া, পথের মাঝখানে কোন খোঁটায় বাঁধিয়া রখে। বর্শাটা সোজা ঝুলিতে থাকে। জলহস্তী চলিবার সময় তাহার গায়ের ঘর্ষণে দড়িটা ছিঁড়িবামাত্র বর্শা তাহার মাথায়
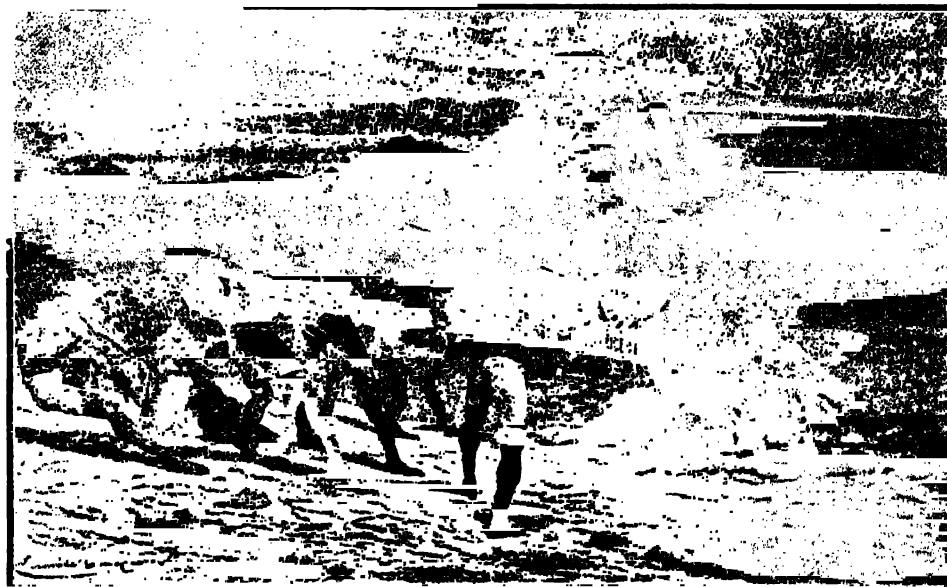
শিকারীরা দড়ি টানিয়া জলহস্তীকে তীরে উঠাইতেছে

বা পিঠে সজোরে পড়িয়া বিঁধিয়া যায়। ফলকে বিষ মাখান থাকে বলিয়া জলহস্তীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

বন্দুক আবিষ্কার হওয়ার পর, জলহস্তী-শিকার অনেক সহজ হইয়া অসিয়াছে। কোন শিকারী লিখিয়াছেনঃ—"ঠিক সন্ধ্যার প্রাকালে আমি নদীর ধারে একটা নলখাগড়ার বনে প্রবেশ করিলাম। কিছুদূর যাইতেই দেখি, চারটা জলহস্তী তাহাদের বাসার দরজার গোড়ায় ঠিক জলের ধারে সুখে ঘুমাইতেছে। তাহাদের কান এমন প্রখর যে, আমার প্রায় নিঃশব্দপদসঞ্চারও তাহাদিগকে জাগাইয়া দিল। তাহারা অবিলম্বে ঝাঁপাইয়া জলে পড়িয়া ডুব দিল। কিছুক্ষণ তাহাদের কোন সন্ধান পাইলাম

না ; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কয়েক মিনিট পরেই, খানিকটা দূরে জল ছিটাইবার শব্দ পাইলাম। আমি বহু কষ্টে শর-বন ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলাম। একটু গিয়াই তাহাদের দর্শন মিলিল—একটা পুরুষ ও তিনটা স্ত্রী জলহস্তী। তাহারা ভয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের বিপদের পরিমাণ বুঝিতে পারে নাই।

প্রথমে একটা স্ত্রী জলহস্তীর খুলি লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম ; গুলি খাইয়াই ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেটা নিশ্চল হইয়া পড়িল। ভয়ে অন্য তিনটা ডুব দিয়া স্রোতের বিপরীতে—নদীর উপর দিকে চলিয়া গেল। অন্যদের দিকে লক্ষ্য করিতে গিয়া পাছে আহত শিকারটা হাতছাড়া হয়, এই ভয়ে আমি তাহাদের অনুসরণ করিলাম না। একটু পরেই আহত জলহস্তী সংজ্ঞা পাইয়া ছট্‌ফট্ করিয়া জল তোল্‌পাড়্ করিতে লাগিল, জল ঘোলা হইয়া গেল। আমার ভয় হইল, ইহার পর ডুব দিয়া পলাইয়া গেলেও আমি তাহাকে ধরিতে পারিব না। মধ্যে একবার সে যেই মাথা তুলিয়াছে, অমনি উহা লক্ষ্য করিয়া আর একটা গুলি ছুড়িলাম। এবার গুলি খাইয়াই সে কেমন বিমূঢ়ের মত হইয়া চুপ করিয়া এক জায়গায় ভাসিয়া রহিল। ভাবিলাম জন্তুটা মরিয়া গিয়াছে। কুমীরের ভয় ছিল ; হঠাৎ কোন দিক্ হইতে আসিয়া তাহারা হয় ত আমার মুখের গ্রাস টানিয়া লইয়া যাইবে। নানা দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া জলে নামিয়া পড়িলাম। জলহস্তীটার পা ধরিয়া টানিলাম। লেজে হাত দিয়াই বুঝিলাম, প্রাণ যাওয়া দূরের কথা, এখনও তাহার বেশ তেজ আছে লেজে হাত দেওয়ামাত্র, সে আমাকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। দেখিলাম, বেশীক্ষণ এভাবে গেলে চলিবে না। পকেটে ছুরি ছিল ; আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়াই ছুরি দিয়া তাহার গায়ের খানিকটা চামড়া ছুলিয়া ফেলিলাম এবং সেই চামড়া ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে একেবারে তীরে আনিয়া ফেলিলাম। তখন তাহার প্রাণ প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গীরা আসিয়া আমাকে সাহায্য করিতে লাগিল।"

———

গরিলা-শিকার

গরিলা মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার গভীরতম জঙ্গলে বাস করে। এই ভয়ঙ্কর জন্তুটিকে তোমরা কেহই দেখ নাই। এমন কি ইউরোপ-আমেরিকারও খুব কম লোকেরই সে সৌভাগ্য হইয়াছে। বড় চেষ্টায়—বড় অর্থব্যয়ে আজ পর্য্যন্ত অল্প-সংখ্যক গরিলাকে ঐ দুই মহাদেশে লইয়া যাইতে পারা গিয়াছে।

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা গরিলাকে এক জাতীয় দৈত্য বলিয়া মনে করে। যে সকল লোক নির্ভয়ে সিংহ, গণ্ডার, হাতী প্রভৃতির সম্মুখীন হয়, তাহারাও গরিলার নাম শুনিলে ভয়ে শিহরিয়া উঠে। গরিলা এমনই ভয়ঙ্কর জীব। সিংহ গণ্ডারের মত দুর্দ্দান্ত জানোয়ারেরাও ইহাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া পলায়ন করে।

কিন্তু নানা বিপদ্ সত্ত্বেও, আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা গরিলা-শিকার করিতে পিছ্-পা হয় না। গরিলার মাংস ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়। তা ছাড়া, যে লোক একটি গরিলার খুলি হস্তগত করিতে পারে,

তাহাকে ইহারা বীর বলিয়া পূজা করে; যে লোক গরিলা শিকার করে নাই, তাহার জীবনের মস্ত বড় কাজই বাকি রহিয়া গিয়াছে। এই সকল বীর-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়, অনেকেই অঙ্গহীন। কোন না কোন ভাবে প্রত্যেকেই এই ভয়ঙ্কর প্রাণী কর্ত্তৃক আহত হইয়াছে। কত লোক যে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

গরিলা-শিকারের সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা এই যে, ইহারা যে স্থানে বাস করে তাহা দুর্ভেদ্য জঙ্গল—অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। গরিলা আট দশ হাতের মধ্যে আসিলেও লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া গুলি করা দুষ্কর। আর গরিলার সহিত একবার মুখোমুখি হইলে হয় শিকারীর, না হয়, গরিলার মৃত্যু অনিবার্য্য। প্রথম গুলি যদি ফস্‌কাইয়া যায়, তাহা হইলে আর দ্বিতীয়বার গুলি করিবার অবসর কাহারও ভাগ্যে জোটে না। গরিলা-শিকারে প্রথমবার গুলি ছুড়িয়া, পুনরায় বন্দুকে টোটা পুরিবার কথা কেহ কল্পনাও করে না। গুলি ছুড়িয়া লক্ষ্য ফস্‌কাইলেই মৃত্যু নিশ্চিত! অবশ্য, যাহারা সাহসী, তাহারা তখন বন্দুকের বাঁটের সাহায্য লইতে ছাড়ে না। কিন্তু বাঁটের আঘাত এই অসীম শক্তিশালী জন্তুর দেহে সম্ভবতঃ তৃণের আঘাতের মতই লাগে; সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশাল রোমশ হস্তের প্রহারে শিকারীর খুলি ও বন্দুক একসঙ্গে চূর্ণ হইয়া যায়। হাতের এত শক্তি পৃথিবীর আর কোন প্রাণীর নাই; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার হাতের শক্তিও ইহার তুলনায় নগণ্য।

সাহেবদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত দুইটি লোক গরিলা-শিকারে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। দুই জনেই আমেরিকার অধিবাসী। এক জনের নাম পল্ ডুশেলু। ইনি ১৮৬১ সালে প্রথম গরিলা শিকার করেন। ইহার পর, মিঃ বেন্ বার্‌ব্রিজ্‌ও এই কার্য্যে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেন। ডুশেলু ও বার্‌ব্রিজ্ সাহেবের লেখা হইতে, তাঁহারা কি ভাবে গরিলা শিকার করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি। ইহা এমনি আশ্চর্য্য যে, ভূতের গল্পও ইহার নিকট হার মানিয়া যায়। ডুশেলু সাহেব তাঁহার প্রথম গরিলা-শিকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"আমরা ধীরে ধীরে অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। দ্বিপ্রহর বেলাতেও অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। অদূরে ডালপালা ভাঙার শব্দে গরিলার অবস্থান বুঝিতে পারিতেছিলাম। আমরা অতি সাবধানে নিঃশব্দপদসঞ্চারে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ঐ দেশবাসী লোকদের মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখিয়া বুঝিতেছিলাম, তাহারা এক ভয়ানক বিপদ্‌জনক কাজে অগ্রসর হইতেছে। তবু আমি পিছ্-পা হইলাম না। অল্পক্ষণ পরেই আমার মনে হইল, যেন সম্মুখের একটা গাছের পাতা ও ডাল প্রবলভাবে আন্দোলিত হইতেছে। নিশ্চয়ই কোন ফল পাড়িবার জন্য

এক বা অধিক গরিলা সেই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আমার ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া গেল। ডাল-পালা নড়ার শব্দ ব্যতীত কোন দিকে আর কোন শব্দই নাই; আমরা স্তব্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সহসা বনের সেই গভীর নিস্তব্ধতা আলোড়িত করিয়া, এক হুঙ্কারধ্বনি শ্রুত হইল; সমস্ত বন যেন সেই শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। সম্মুখের গাছের নীচের শাখাটি সবেগে দুলিতে লাগিল এবং পর-মুহূর্ত্তেই এক বিপুলকায় পুরুষ গরিলা আমাদের সম্মুখে

গরিলা নয়—যেন উপকথার দৈত্য!

দৃষ্ট হইল। সামনেই একটা ঝোপ্ ছিল। সে হামাগুড়ি দিয়া সেটা পার হইয়াই, দুই পায়ে ভর দিয়া আমার সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের পরস্পরের ব্যবধান তখন বিশ হাতের বেশী হইবে না। সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীকে দেখিয়া আমার মনে যে ভাবের উদয় হইল, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। চার হাত দীর্ঘ সেই বিশাল দেহ! প্রশস্ত বক্ষ, সুপরিপুষ্ট বাহু, কোটরপ্রবিষ্ট ছাই-রং চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি ও মুখের ভয়ঙ্কর হিংস্রভাব দেখিয়া মনে হইল যেন, কোন উপকথার দৈত্যের স্বপ্ন দেখিতেছি! যেন আফ্রিকার অরণ্যের সম্রাট্ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! সে আমাদিগকে দেখিয়া বিন্দুমাত্র ভীত হইল না। সেখানে দাঁড়াইয়া তাহার প্রকাণ্ড

মুষ্টিদ্বারা বক্ষে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল; তাহার বুকের উপর সেই আঘাত আমার কানে ঠিক ঢাক-পেটানোর শব্দের মত মনে হইতে লাগিল। তাহার ঘন ঘন গর্জ্জনে সমস্ত বনভূমি প্রকম্পিত হইতে লাগিল। আমরা তাহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছি দেখিয়া, তাহার ক্রোধ বাড়িয়া গেল। তাহার চোখ ভীষণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার কপালের চুলগুলি খাড়া হইয়া উঠিতে নামিতে লাগিল। আমাদের চোখের সম্মুখে থাবা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, সেই অর্দ্ধ মানুষ অর্দ্ধ-জন্তু দৈত্যাকৃতি গরিলা কয়েক পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তার পর আবার কিছুক্ষণ থামিয়া, সে অগ্রসর হইয়া আমার হাত দশেক দূরে থামিল। থামিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ণবিদারক গর্জ্জন আরম্ভ হইবামাত্র, আমি তাহার বুক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম।

"আবার করুণ আর্ত্তনাদের সঙ্গে ভীষণ গর্জ্জন শুনা গেল। আমার মনে হইল, যেন আমি নরহত্যা করিলাম—এমনই মানুষের মতন সে করুণ আর্ত্তনাদ! সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট আর্ত্তনাদের কথা আমি আজিও ভুলিতে পারিলাম না। গর্জ্জন ও আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, সেই বিপুলকায় প্রাণী একেবারে হুমড়ি খাইয়া পড়িল; তার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া আর্ত্তনাদ ও ছট্‌ফটানি। তার পর সব শেষ!"

বেন্ বার্‌ব্রিজের বর্ণনা হইতে একটা গরিলা-শিকারের বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন:—"মানুষের বীরত্বের সব চাইতে বড় পরীক্ষা কি? অনেকে অনেক কথা বলিবেন; কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষের ধৈর্য্য ও বীরত্বের চরম পরীক্ষা হইতেছে—গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে, সুনিবিড় শাখা-পত্রাচ্ছাদনের নিম্নে, অস্পষ্ট রৌদ্রালোকে, গর্জ্জনকারী হিংস্র গরিলার সম্মুখীন হওয়া। আমাকে বহুবার এই অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। এই অবস্থায় পড়িয়া এক হতভাগ্য বীর কি ভাবে মৃত্যু বরণ করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি।

"আমাদের ক্ষুদ্র দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া, জঙ্গলের কোথায় কি আছে তাহার অনুসন্ধানে চলিয়া গেল। আমি আর গাম্বো একসঙ্গে রহিলাম। একজন ঐ দেশীয় সাহসী পুরুষ গরিলার অবস্থান জানিবার জন্য একাই একদিকে গেল। আরও দুই একটি দল অন্য দিকে চলিয়া গেল। আমরা ঘণ্টখানেক জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর, হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ শুনিলাম। মনে হইল, আমাদের অতি নিকটে কেহ বন্দুক ছুড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আর একটা আওয়াজ। আমরা দ্রুতবেগে শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। আশা করিয়াছিলাম, সেখানে গিয়া একটা নিহত গরিলা দেখিতে পাইব, কিন্তু সহসা গরিলার ভীষণ গর্জ্জনে আমাদের আশা

দূর হইল, গাম্বো সভয়ে আমার হাত ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমারও ভয়ের অন্ত ছিল না, তবু কোন প্রকারে আমরা সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই, যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। যে লোকটি একা গরিলার সন্ধানে গিয়াছিল, আপনার রক্তধারার মধ্যে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে। প্রথমে মনে হইল, তাহার দেহে প্রাণ নাই। তাহার নাড়িভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পাশেই বন্দুকটা পড়িয়া : গরিলা তাহার বাঁটটি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াছে এবং লোহার নলটিকে বাঁকাইয়া চেপ্‌টা করিয়া দিয়াছে। গরিলার দাঁতের চিহ্ন সেই লোহার উপর অঙ্কিত হইয়াছে! দেখিলাম, লোকটির দেহে তখনও প্রাণ আছে।
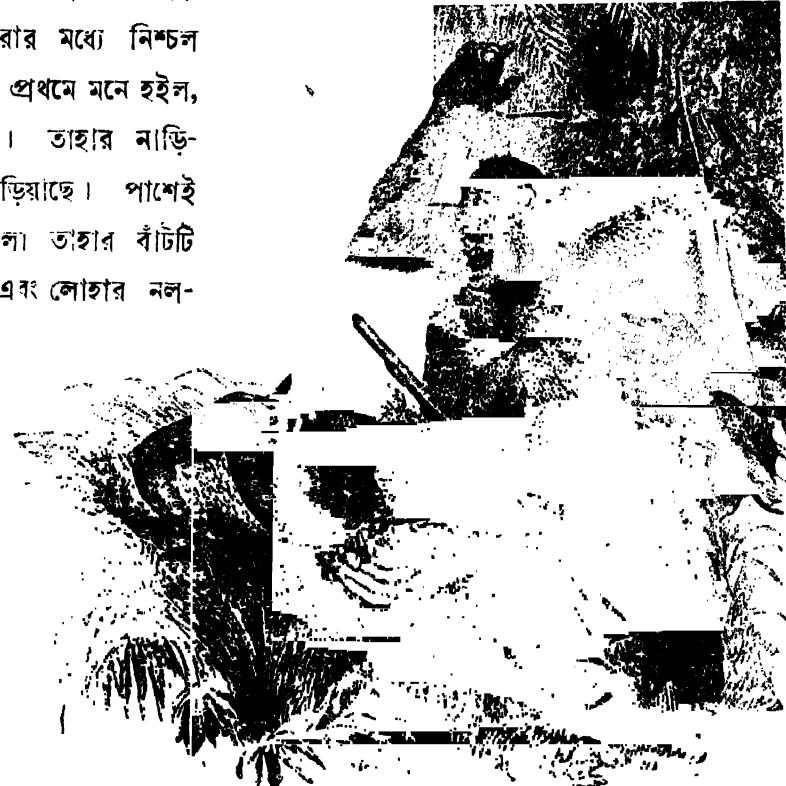
"আমরা তাহাকে তুলিয়া লইয়া তাঁবুতে ফিরিলাম ও যথাসাধ্য তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। বাঁধাছাঁধা শেষ করিয়া, তাহার মুখে কোন রকমে কয়েক চামচ ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া দিলাম। অনেকক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান হইল; সে বহুকষ্টে তাহার দুর্ভাগ্যের বর্ণনা করিল। সে অতি সাবধানে ঘুরিতে ঘুরিতে, এক ঘনসন্নিবিষ্ট ঝোপের পাশে সহসা গরিলার সম্মুখীন হয়। আলোকের অস্পষ্টতা হেতু সে লক্ষ্য স্থির করিয়া গুলি ছুড়িতে পারে নাই। গরিলা অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। গুলি তাহার একপাশে লাগিতেই, সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বুকে মুষ্টিপ্রহার ও গর্জ্জন করিতে থাকে। তখন পলায়ন অসম্ভব; কারণ দশ বার পা যাইতে না যাইতেই গরিলা তাহাকে ধরিয়া ফেলিত। সেইখানে দাঁড়াইয়াই অসীম সাহসের সহিত সে পুনরায় বন্দুকে টোটা পুরিয়া লয়। সেটি ছুড়িবার

গরিলার নিদারুণ প্রতিহিংসা

পূর্ব্বেই, গরিলা ভীষণভাবে তাহার উপর পতিত হয়। বন্দুকটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, গরিলা তাহা মাটিতে আছ্‌ড়াইয়া ফেলে ; সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় গুলিটিও সশব্দে বাহির হইয়া যায়। তার পর গরিলা ভীষণ জোরে তাহার পেটে থাবা মারে, তাহাতেই তাহার পেট ছিন্ন হইয়া নাড়িভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়ে। সে রক্তাক্ত-কলেবরে মাটিতে পড়িতেই, গরিলা তাহাকে ছাড়িয়া বন্দুকটির দিকে ধাবিত হয় এবং সেইটারই উপর প্রতিহিংসা লইয়া চলিয়া যায়।

লোকটির বর্ণনা শুনিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। কি প্রচণ্ড শক্তিশালী ঐ গরিলা! লোকটির বীরত্বেরও তারিফ্‌ করিতে হয়! সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ারের সম্মুখে সে যে কি করিয়া দ্বিতীয়বার গুলি ছুড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহার দুই দিন পরে সেই বীর প্রাণত্যাগ করে।